মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ

অরবিন্দ পোদ্দার

এম. এ. ডি. ফিল

ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড

২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

আমার পিতৃদেব শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ ও মাতৃদেবী
শ্রীযুক্তা দামিনী পোদ্দারের চরণকমলে

বিষয় সূচী :—

চর্যাগীতি

চর্যাগীতির মানবতা

এক
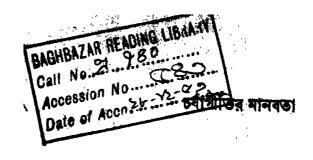
চর্যাগীতির রচনাকাল অর্থাৎ দশম থেকে দ্বাদশ শতক বাংলায় পালরাষ্ট্রের পতন, বর্মণসেন রাষ্ট্রের অবির্ভাব এবং সেনরাষ্ট্রের ক্রম-তিরোভাবের কাল। আর সাধারণভাবে এই যুগের মধ্যেই হিন্দু আধিপত্যের বিলুপ্তির চিহ্ন আঁকা রয়েছে। যুগ-সংক্রান্তির সময়টা স্বভাবতই চঞ্চল, আর নানাবিধ তরঙ্গবিক্ষুব্ধ। এই ধ্বংস-সৃষ্টি-ধ্বংসের আসা-যাওয়াটা চর্যাগীতির পটভূমি রূপে বর্তমান রয়েছে বলে চর্যাগীতির আলোচনা ও ভাবের অভিব্যক্তির অনুসন্ধানের পূর্বে এই যুগের পরিবেশ ও ভাব-মণ্ডল কি, তার বিচার করা প্রয়োজন।

গুপ্ত আধিপত্যের চরম বিকাশের দিন থেকে বাংলায় আর্যীকরণের কাজ শুরু হয়; অর্থাৎ বাংলাকে উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও সমাজবিন্যাসের অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। খৃষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম শতক থেকে আরম্ভ করে চর্যাগীতির রচনাকাল পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও সামাজিক আদর্শ ও ভাবধারার প্রসার এবং পরিণামে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষমতায় পূর্ণ গৌরবে অধিষ্ঠিত হওয়ার ইতিহাস।

এই ইতিহাসের একদিকে রয়েছে বাংলার আর্যপূর্ব সংস্কৃতি ও সমাজবোধের সহিত আর্য সংস্কৃতি ও সমাজচিন্তার বিরোধ ও সংঘাত। বাংলার আদি অধিবাসীদের সম্পর্কে উত্তর ভারতীয় আর্যদের ঘৃণা ও অবজ্ঞার অবধি ছিল না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তাদের বলেছেন 'দস্যু', ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে মহাভারত বাংলার সমুদ্রতীরবর্তী লোকদের বলেছেন 'ম্লেচ্ছ'; ভাগবত পুরাণ বলেছেন 'পাপ'। বাংলা তখন সম্পূর্ণই আর্যসংস্কৃতির সীমানার বাইরে; তাই স্বল্পকালের জন্য এখানে প্রবাসে এলেও ফিরে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো। কিন্তু, সামরিক কার্যে অথবা পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে ক্ষণিক আসাযাওয়ার মাধ্যমে আর্য ও বাংলার আদি অধিবাসীদের মধ্যে মেলামেশা ও দেওয়া-নেওয়া

চলছিল। তাই, আর্যদেরও মনোভাব পরিবর্তন করতে হয়েছে; এবং ক'রে আর্যসংস্কৃতির বাইরের লোকদের আর্যসংস্কৃতির অভ্যন্তরে সংগ্রথিত করার দিকে মনোযোগ দিতে হয়েছে। পূর্বে যারা ছিল ম্লেচ্ছ অথবা দস্যু, তাদের অনেককে ব্রাহ্মণ, অনেককে ক্ষত্রিয় পর্যায়ে উন্নীত করা হয়, আবার অনেককে (যেমন পৌণ্ড্রক ও কিরাতদের) উন্নীত করেও ব্রাহ্মণ্য আচার অনুষ্ঠানের প্রতি যথার্থ আনুগত্য না-দেখানোর অপরাধে অবনমিত করা হয়। বলা বাহুল্য, এই ম্লেচ্ছদের অধিকাংশকেই শূদ্র পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়। বহু শতাব্দী ধরে এই সংযোগ-বিয়োগ ও আদান প্রদান চলে, তা সহজেই অনুমান করা চলে, এবং এই মিলনের মধ্য দিয়েই এক নতুন সম্মিলিত সমন্বিত সংস্কৃতি জন্মলাভ করে। আর্য ভাবধারায় অনেক আর্য-পূর্ব ভাবধারা স্বীকৃতি লাভ করে, এবং সেই ধারা বাংলার শিল্প-সাহিত্য-আচার-মননে আজও বহমান। কিন্তু ধীরে ধীরে বাংলার নিজস্ব লৌকিক সমাজ চিন্তা আর্যসংস্কৃতির নিকট পরাভব স্বীকার করে।

এই ইতিহাসেরই অপর দিক বাংলার দেশজ বৌদ্ধ মতাবলম্বী পাল-চন্দ্র নৃপতিগণের আধিপত্যের অবসানে বাংলায় ভিন্‌দেশী বর্মণ-সেন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন অবশ্য, কিন্তু তাতে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিস্তারে কোন বিঘ্ন হয়নি। বৌদ্ধ বিপ্লব ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সমাজ-বিন্যাসের এক ক্ষয়-পেয়ে-যাওয়া অবস্থায় বণিকের স্বার্থ আশ্রয় করে লোক-মানসের সাম্য, মৈত্র, শান্তি ও মানবতার দাবী নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল; তার আকৃতির মধ্যে বিশৃঙ্খল, দুষ্ট, স্বৈরাচারী সমাজব্যবস্থার চাপ থেকে মানুষের মুক্তিলাভের প্রেরণা মূর্ত হয়ে উঠলেও, বৌদ্ধ বিপ্লব ব্রাহ্মণ্য সমাজবিন্যাস অর্থাৎ বর্ণাশ্রমের মূলে আঘাত করেনি, অথবা বর্ণাশ্রমকে সে কার্যত অস্বীকারও করেনি। তাই বৈদিক ব্রাহ্মণদের বাংলায় আগমনের পর ব্রাহ্মণ্য সমাজ-আদর্শ সম্প্রসারণের পথে কোন বাধা পায়নি। বিশেষ করে, পাল যুগের ভাবাকাশ বিশেষ এক ঔদার্যের রসে সিঞ্চিত ছিল। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যাপারে ব্রাহ্মণের সম্মাননা সর্বাগ্রে। পরমসুগত পাল রাজাগণ গঙ্গাস্নান করে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেছেন, পাল-পর্বের লিপিমালায় তার বহু সাক্ষ্য বর্তমান। তাছাড়া, রাজপরিবারের মধ্যেও কেহ কেহ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম গ্রহণ করেছেন, তার প্রমাণ রয়েছে। এ থেকে একদিকে যেমন ধর্মগত ঔদার্যের স্বাক্ষর ও ধর্মগত বিরোধের অনুপস্থিতির

পরিচয় মেলে, অন্যদিকে সমাজপ্রবাহের গতি কোন্‌দিকে তার ইঙ্গিতও এখানে খুঁজে পাওয়া যায় ; অর্থাৎ পাল-পর্বে বা তার পূর্বকাল থেকেই বৌদ্ধ তরঙ্গে ভাঁটার টান ধরেছিল।

এই ভাঁটার টানে বৌদ্ধ ধর্মের মূল প্রবাহ নিঃসন্দেহে শুকিয়ে মরে বর্মণ-সেন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর। বৌদ্ধ ধর্মের দু একটি শীর্ণ ধারা এখানে ওখানে ঝির ঝির বয়ে বয়ে ক্ষীণ স্বরে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে মাত্র।

বর্মণ ও সেন রাজবংশ ভিন্ন প্রদেশজাত। উভয় রাজবংশ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে আস্থাবান, এবং তার পরম নিষ্ঠাবান ধারক ও বাহক। সুতরাং ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি ও সমাজবিন্যাসের বিস্তৃতি আর বৌদ্ধপাল রাজাদের উদার মনোভাবের উপর নির্ভরশীল রইলো না. রাষ্ট্রের সক্রিয় সচেতন হস্ত এবার ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিস্তৃতির সহায়করূপে দেখা দিল।

তত্ত্বের দিক থেকে ব্রাহ্মণ্য সাধনার রূপ এই : সর্বভূতে বিরাজমান এক সত্য-স্বরূপ আছেন, তিনি আমাদের বাইরে-প্রসারিত দৃষ্টিতে কখনও প্রকাশিত হন না ; আমাদের মায়াচ্ছন্ন দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে তিনি 'গূঢ়" হয়ে আছেন ; এই সত্য-স্বরূপকে জানতে পারলেই এই মরণশীল জীবন থেকে অব্যাহতি লাভ করা যায় এবং অমৃত হওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্য সাধনা এই অমৃত হওয়ার সাধনা। এই সাধনার পথ হলো, পরিচিত পৃথিবী হতে নিজেকে সরিয়ে আনা, এবং দেহ থেকে আত্মা, রূপ থেকে স্বরূপে, মৃত্যু থেকে অমৃতের পথে অগ্রসর হওয়া। কিন্তু পৌরাণিক যুগের আবহাওয়ায় স্নান করে এই আদর্শ যাগযজ্ঞহোম, দেবদেবীর পূজাপার্বণ এবং ব্রতানুষ্ঠানে পরিণত হয়, প্রথম কালের সজীবতা আচার সর্বস্বতায় পরিণতি লাভ করে। সেন-বর্মণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাংলার আকাশ বাতাস যাগযজ্ঞ ও পূজানুষ্ঠানের কলরবে মুখরিত হয়ে উঠল। হলায়ুধ মিশ্রের "ব্রাহ্মণ সর্বস্বের" একটি শ্লোক থেকে এই যুগের ভাবপরিমণ্ডলের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে, হলায়ুধ নিজের সম্পর্কে লিখছেন :

পাত্রং দারুময়ং কচিদ্ বিজয়তে হৈমং কচিৎ ভাজনং
কুত্রাপ্যস্তি দুকূলমিন্দুধবলং কুত্রাপি কৃষ্ণাজিনম্।
ধূপঃ কাপি বষট্‌কৃতাহুতিকৃতো ধূমঃ পরঃ কাপ্যভূদ্
অগ্নে কর্মফলং চ তস্য যুগপজ্জাগর্তি যন্মন্দিরে॥ (১)

১ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের 'প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী' গ্রন্থে উদ্ধৃত।

(কোথায়ও কাঠের [যজ্ঞ] পাত্র [ছড়িয়ে আছে] ; কোথায়ও বা স্বর্ণপাত্র। কোথায়ও ইন্দুধবল ; দুকূলবস্ত্র কোথায়ও কৃষ্ণমৃগচর্ম। কোথায়ও ধূপ [গন্ধময় ধূম] ; কোথায়ও বষট্‌কার ধ্বনিময় আহুতির ধূম। [এইভাবে হলায়ুধের নিজের গৃহে] অগ্নির ও [তাঁহার নিজের] কর্মফল যুগপৎ জাগ্রত।) এই ভাবকল্পনাই সমকালীন যুগের ব্রাহ্মণ্য আদর্শ। অবশ্য এই আদর্শ বিরোধী, বেদ বিরোধী, আচার-বিরোধী নাস্তিকবাদী "লোকায়ত" ভাবধারা দীর্ঘকাল ধরে এদেশের জনসমষ্টির মধ্যে প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণ্য আদর্শের আক্রমণ সহ্য করে এ যুগেও যে সেই "লোকায়ত" ভাবধারা বর্তমান ছিল, তা অনায়াসে অনুমান করা চলে।

এই পর্বেই বাংলাদেশে স্মৃতিগ্রন্থ রচিত হতে আরম্ভ করে, এবং তার সাহায্যে জন্ম থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের আচার ব্যবহার ও সামগ্রিকভাবে তার জীবনাচারকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হয়েছে এবং অপর দিকে ব্রাহ্মণ্য সমাজ-সংস্থায় বিভিন্ন সামাজিক বর্ণ, উপবর্ণ, প্রভৃতির স্থান নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ভগবান চারিটি বর্ণ সৃষ্টি করেছেন, কিম্বা চারিটি গুণ সৃষ্টি করেছেন, তার ব্যাখ্যা নিয়ে পণ্ডিত সমাজে মতানৈক্য হতে পারে, কিন্তু ব্যবহারিক বাস্তব সমাজে তার প্রয়োগ ফল যা হয়েছে তা হলো এই, বর্ণভেদে বৃত্তিভেদ। অবশ্য বর্ণের নির্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম করে স্বতন্ত্র বৃত্তি অনুসরণ করেছেন, এমন নিদর্শন দু একটি পাওয়া যায়, কিন্তু তা শুধুমাত্রই ব্যতিক্রম, তা মূল বক্তব্যকে কোনভাবেই খণ্ডিত করে না।

আর্যীকরণের ব্যাপক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলার সমুদয় জনসমষ্টি ব্রাহ্মণ্য সমাজ-বিন্যাসের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। বর্ণাশ্রমের বাইরে অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য পর্যায়ে যারা রয়ে গেল, তারা হলো, কোল, ডোম, জোলা, হাড়ি, চণ্ডাল প্রভৃতি। আর বর্ণাশ্রমের অন্তরে যারা আশ্রয় পেল, তাদের মধ্যেও বৃহদ্ধর্মপুরাণের মতে, ব্রাহ্মণ ছাড়া বাংলার সকলেই সংকর শ্রেণীর এবং শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত। বিভিন্ন বর্ণের নরনারীর যথেচ্ছ যৌনমিলনে তাদের উৎপত্তি। এই শূদ্র বর্ণের মধ্যে আবার সৎ শূদ্র, অসৎ শূদ্র বিভাগ সৃষ্টি করে বহু উপবর্ণে শূদ্র সম্প্রদায়কে বিভক্ত করা হয়েছে, এবং এইসব বর্ণ উপবর্ণ সম্পর্কে ব্রাহ্মণদের আচার ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত, তা সুকঠোরভাবে স্থিরীকৃত হয়েছে। বিভিন্ন বর্ণ উপবর্ণও তাদের প্রতি ব্রাহ্মণদের মনোভাব ও আচরণের সংগে সঙ্গতি রেখে পরস্পরের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য

প্রাচীর রচনা করে। বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণের বেড়াজালে প্রত্যেকটি বর্ণই সীমিত। আর শুধু শূদ্র পর্যায়ের মধ্যেই এই স্তর উপস্তর সৃষ্টি করা হয়নি, ব্রাহ্মণদের মধ্যেও বিভিন্ন গাঞী ও ভৌগোলিক বিভাগ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কোন অঞ্চলের ব্রাহ্মণদের বিশেষ কোন সামাজিক আচরণের ফলে, নানা স্তর উপস্তর সৃষ্টি হয়ে যায়। সেখানেও উচ্চ নীচ ও পতিত ব্রাহ্মণেরা একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন, সেখানেও প্রত্যেকের আচরণ ও সামাজিক ব্যবহার সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত। সর্বত্রই সামাজিক কৌলিন্য ও আভিজাত্য, এবং সমাজবিধাতার রক্তচক্ষু সম্ভাব্য অপরাধীর প্রতি নির্নিমেষ তাকিয়ে রয়েছে; তাকে ফাঁকি দেওয়ার আশা কল্পনাতীত। সর্ববিধ আচরণ, এমনকি সামাজিক কু-আচরণও তার অনুমোদনের অপেক্ষা রাখে। এই দৃঢ়বদ্ধ ও দুরতিক্রম্য প্রাচীর ঘেরা ব্রাহ্মণ্য সমাজকে যদি একটা পিরামিডরূপে চিন্তা করি তাহলে তার রূপটা দাঁড়ায় এইরূপ : সুউচ্চ মার্গে অর্থাৎ চূড়ায় বসে আছেন ব্রাহ্মণ, মধ্যে শূদ্র সম্প্রদায়, আর পদতলে অন্ত্যজ অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ সম্প্রদায়। ব্রাহ্মণের অগ্নিচক্ষু এই সমাজ সংস্থার সর্বত্র অকৃপণভাবে দৃষ্টি বর্ষণ করছে।

ব্রাহ্মণ্য ভাবাদর্শে সংগঠিত এই সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা স্বভাবতই একটা এক-নায়কত্বের রূপ পরিগ্রহ করে। এই একনায়কত্ব একদিকে একটি মাত্র বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বর্ণের; একদিকে একটিমাত্র ধর্মের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের, এবং অন্যদিকে একটিমাত্র সামাজিক আদর্শের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার। বৈদিক যুগে বৈদিক ব্রাহ্মণরা অবৈদিক জন-সমষ্টিকে তাদের আনুগত্যে আনার জন্য ধর্মীয় বিধিব্যবস্থার প্রয়োগ করেছেন ঠিক একই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। সম্ভবত বর্মণ-সেন আমলের ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির বিধায়কগণ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আধিপত্য অর্জনের পর সর্বদিক থেকে বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণের প্রাচীর তুলে ব্রাহ্মণ্য সমাজকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করেন। এখানে উদার মনোভাব আশা করা বৃথা, এবং পালযুগের ভাবধারার সংগেও এখানে ছেদ ঘটে। পালযুগে একটা উদার সমন্বয় প্রচেষ্টা বর্তমান ছিল; রাজা কান্তিদেবের কাহিনী থেকে তার প্রমাণ মেলে। তিনি তাঁর রাজকীয় শীলমোহরে বৌদ্ধ পিতা ও শৈব মাতা উভয়ের ধর্মের সমন্বিত রূপ উদ্ভাবন করেছিলেন। (২) কিন্তু বর্মণ-সেন আমলে এর বিন্দুমাত্র পরিচয় নেই। বরং দেখা যায়, বর্মণ আমলে রাজা

২ ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়ের "বাঙালীর ইতিহাস" গ্রন্থে উল্লেখিত।

ভাতবর্মণের সৈন্যেরা সোমপুরের বৌদ্ধ মহাবিহার পুড়িয়ে দিয়েছে; বর্মণ রাষ্ট্রের মন্ত্রী ভট্টভবদেব বৌদ্ধতরঙ্গকে গ্রাস করেছেন বলে গর্ব করেছেন। বর্মণরাষ্ট্রের এই প্রস্তুতি সেন-পর্বে পরিণতি লাভ করে। পালযুগে বৌদ্ধ পাল রাজারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি যে উদার মনোভাব দেখিয়েছেন, ব্রাহ্মণ্যধর্মাশ্রয়ী সেন রাজাদের নিকট তা অভাবনীয়।

সমকালীন সমাজসংগঠনের দিকে যদি তাকাই, তা'হলে দেখা যায়, যারা অতি প্রয়োজনীয় শ্রমাজশ্রমিক, তারা ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থা অর্থাৎ বর্ণাশ্রমের বাইরে, অন্ত্যজ অথবা ম্লেচ্ছ পর্যায়ের অধিবাসী। তাদের কথা ছেড়ে দিলেও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামাজিক স্তর যারা সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের সংগে বিশেষভাবেই জড়িত; যেমন, স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, চিত্রকর, চর্মকার, ধীবর, রজক প্রভৃতিরও সামাজিক মর্যাদা নেই, তারা অসৎশূদ্র পর্যায়ের। বল্লাল সেন সুবর্ণবণিকদের সমাজে পতিত করেছিলেন, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ সুবর্ণ ও অন্যান্য বণিকদের অসৎশূদ্র পর্যায়ে ফেলেছেন; তাতে স্বভাবতই মনে হয়, সমাজে বণিকশ্রেণীর প্রাধান্য লোপ পেয়েছিল। আনুমানিক অষ্টম শতক থেকেই বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর ও কুটীরশিল্প-নির্ভর হয়ে পড়তে থাকে। সমাজব্যবস্থায় তার ছাপ থাকা অসম্ভব নয়, এবং সমাজও যে অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্রমে দুর্বল হতে থাকে তাও অনুমান করা অসঙ্গত নয়। এই সমাজে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য ধারণাকল্পনা ও আদর্শের অনুশাসনের বিধানে, যেখানে যাগযজ্ঞ হোমাদি চরম প্রাধান্য অর্জন করেছে, সেখানে শ্রম ও শ্রমসাধ্য পেশা যে নিন্দনীয় হবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। অবশ্য অতীতে ব্রাহ্মণরা শ্রমে কুণ্ঠিত ছিলেন না, কৃষিকর্মও করতেন, তার উল্লেখ থাকলেও সেন-বর্মণ আমলে তা ছিল না, বললে অসঙ্গত হবে না।

আরও একটি বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্মণ যে শুধু এই সমাজসংগঠনের চূড়ায় বসে আছেন তা নয়, তার সামাজিক আচার ব্যবহার এবং পালনীয় বিধিব্যবস্থাকেও অন্যান্য বর্ণ-পালনীয় বিধিব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র ও সহজসাধ্য করা হয়েছে। আর কঠোর বিধিনিষেধ নিয়ন্ত্রণের জালে প্রত্যেক বর্ণের ব্যবহারকে বেঁধে দেওয়া হলেও, সেই মানদণ্ডের বিচারে ব্রাহ্মণের অসঙ্গত আচরণকে সঙ্গত করে নেওয়ার মত উপযুক্ত ফাঁক সৃষ্টিও করা হয়েছে। যেমন, শূদ্রের অন্ন ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ; কিন্তু

আপৎকালে খেতে বাধা নেই, মনস্তাপস্বরূপ প্রায়শ্চিত্ত করলেই দোষ কেটে যায়। জীমূতবাহন বলেছেন: ব্রাহ্মণ (নিজের সংগে বিবাহিত নয়, এমন) শূদ্রাণীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করলে তাতে নৈতিক কোন অপরাধ হয় না, সংসর্গ দোষ হয় মাত্র। সামান্য প্রায়শ্চিত্ত করলেই অপরাধ স্খালন হয়। সমাজ সংগঠনের স্বরূপ এবং আচার বৈষম্য থেকে এটাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ব্রাহ্মণ্য সমাজ-ব্যবস্থায় সমতার আদর্শকে শুধুমাত্র অস্বীকার করা হয়নি, অসাম্যকে বিধিবদ্ধ ও সংগঠিত করা হয়েছে।

ফলে, সংস্কৃতি ও সমাজধর্মের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। সেন-পর্ব রাজাদের ব্যক্তিগত বিজয়াভিযানের আড়ম্বরে, রাজপ্রাসাদের বিলাস-ব্যসন ও জাঁক-জমকের চাকচিক্যে বাইরের দিক থেকে চোখ ঝলসিয়ে দিলেও, সমাজ-দেহের গভীরে আছে ক্ষয়ের চিহ্ন, এবং সমাজবোধের অবনতির নিশ্চিত স্বাক্ষর। সম্ভবত বর্মণ-সেন পর্বের আরম্ভের পূর্ব থেকেই এই ক্ষয়কার্য আরম্ভ হয়েছিল। সে যুগের ব্রাহ্মণরা সমাজ-ধর্মের বিধায়ক হলেও, তাদের আচরণেও ছিল নানা কলুষ ও কলঙ্কের কালিমা। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শূদ্রাণীর সংগে ব্রাহ্মণের যৌনমিলনে বিশেষ কোন দোষ হয় না বলে গণ্য করা হত; অথচ, সমাজবিধিতে তখন শূদ্রাণীর সংগে ব্রাহ্মণের বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। তাতে মনে হয়, ব্যভিচারকে ঐ ভাবে বিধিসম্মত করার চেষ্টা হয়। টীকাকার শ্রীকৃষ্ণ এই আইনসম্মত নৈতিক অধঃপতনকে আরও একধাপ এগিয়ে দেন। তিনি "নিজের সংগে বিবাহিত নয়" কথাটিকে "অপরের সংগে বিবাহিত" বলে ব্যাখ্যা করেন। সরল কথায় তার অর্থ হলো, শূদ্রাণীর সংগে বিবাহ অপেক্ষা বিবাহিত শূদ্রাণীর সংগে ব্যভিচার কম দোষণীয় (৩)। ব্রাহ্মণের আচরণের একটা ব্যঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় কৃষ্ণ মিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে। বাঙালী ব্রাহ্মণ অহঙ্কার তার আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলছেন:

> নাস্মাকং জননী তথোজ্জ্বলকুলা সচ্ছ্রোত্রিয়ানাং পুন—
> র্ব্যূঢ়া কাচন কন্যকা খলু ময়া তেনাস্মি তত্তোধিকঃ।
> অস্মচ্ছ্যালকভাগিনেয়দুহিতা মিথ্যাভিশপ্তা যত—
> স্তৎ সম্পর্কবশান্ময়া স্বগৃহিণী প্রেয়স্যপি প্রোজ্ঝিতা ॥

৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত "বাংলার ইতিহাস", প্রথম খণ্ড; পৃঃ ৫৭৬

[আমার জননী তেমন সৎকুল থেকে আসেন নি। আমি কিন্তু সৎ শ্রোত্রিয় বংশের এক কন্যাকে বিবাহ করেছি। তাতে আমি বাবাকে টেক্কা দিয়েছি। আমার শালার ভাগিনেয়ের কন্যার নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা হওয়ায় সেই সম্পর্কের জন্য প্রেয়সী হলেও গৃহিণীকে আমি ত্যাগ করেছি। ৪]

এই অনাচার সমাজের সর্বাংশেই ব্যাপ্ত ছিল। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন সেকশুভোদয়া থেকে লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদের একটি কাহিনী পরিবেশন করেছেন। সমকালীন সমাজসংস্কৃতির চিত্র হিসেবে এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। কাহিনীটি এই: "লক্ষণ সেনদেবের সুয়ো রাণী বল্লভার এক ভাই ছিল কুমার দত্ত, ভারি অত্যাচারী। সে একদা এক বণিকবধূ মাধবীর উপর অত্যাচার করতে যায়। মাধবীর চীৎকারে লোকজন এসে পড়ে কুমার দত্তকে ধরে মন্ত্রীদের কাছে নিয়ে যায়। রাজার প্রিয় পত্নীর ভাই বলে মন্ত্রীরা স্বয়ং শাস্তি দিতে অসমর্থ হয়ে মাধবীকে রাজসভায় যেতে বলেন। প্রজারা সব মাধবীকে নিয়ে রাজসভায় গেলে মন্ত্রীরাও সেখানে হাজির হলেন। রাজার কাছে প্রজারা সাহস করে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছে না দেখে জগদ্‌গুরু গোবর্ধনাচার্য বললেন, "ভো জনাঃ কার্যং বদত।" তখন সাহস পেয়ে মাধবী আত্মীয়-কুটুম্বদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে সব কথা বললে। ইতিমধ্যে চেড়ীর মুখে খবর পেয়ে রাজমহিষী বল্লভা এসে সভার পিছনের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। মাধবীর অভিযোগ শুনে বল্লভা ভ্রাতার বিরোধী মন্ত্রী উমাপতি ধরকে লক্ষ্য করে বললেন, "হে সভাসদাঃ, পাপিষ্ঠো অসাবুমাপতিধরঃ তস্যৈব এষা কৃত্যা ইতি বিজ্ঞায় যৎকর্তব্যং তাদ্বিধীয়তাম্।" শুনে রাজা, মন্ত্রী, সভাসদ সকলে চুপ করে রইলেন। তখন মাধবী রাণীর পায়ে প্রণাম করে বললে, আপনি ধর্মপরা মাতা, সমর-বিজয়ী মহারাজাধিরাজ লক্ষণ সেনের পত্নী, আমাকে ক্ষমা করুন। এই রাজ্যে এতদিন ধর্ম ছিল শাশ্বত,……এখন বুঝলুম শূরভোগ্যা বসুন্ধরা। আপনার পিতৃকুলে কি এই ব্যবহার চলিত আছে যে যার-তার স্ত্রীকে যে কেউ হরণ করতে পারে? তা যদি থাকে বলুন, আপনারই ভাইকে ভজনা করি। এই কথা শুনে বল্লভা ক্রোধে মাধবীর চুল ধরে

৪ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের অনুবাদ; প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালী।

টেনে পদাঘাত করলে। ভয়ে কেউ বাধা দিতে পারলে না। তখন গোবর্ধনাচার্য ক্রোধে আগুন হয়ে রাজাকে ভৎর্সনা করলেন, "ভবান্ যাদৃশো ধার্মিকস্তাবদবগতম্, শ্রীমতাং রাষ্ট্রমচিরান্নষ্টং ভবিষ্যতি।"...... ইত্যাদি।

কুমার দত্ত ও বল্লভার আচরণ বহু প্রচলিত সমকালীন সামাজিক আচরণেরই প্রতিফলন বলে মনে হয়। এই পর্বের আবহাওয়া কাম-লালসা ও আনুষঙ্গিক ব্যভিচারে কলুষিত, অসঙ্গত যৌন-বিহার ও মিলনে সম্ভবত বিশেষ কোন অপরাধ ছিল না, এবং সমাজও সম্ভবত একে যৌন সম্মতির দৃষ্টিতেই দেখত। ধোয়ী তাঁর পবনদূতে যুবক-যুবতীর কামলীলার সোৎসাহ চিত্র এঁকেছেন। বাৎসায়ন তাঁর কামসূত্রে বঙ্গ ও গৌড়ের রাজ-অন্তঃপুরের মহিলাদের ব্রাহ্মণ, রাজ-কর্মচারী, দাস ও ভৃত্যদের সহিত কাম-চক্রান্তের উল্লেখ করেছেন। ক্রীতদাসী রাখার প্রথাও বিশেষ প্রচলিত ছিল; জীমূতবাহন তার উল্লেখ করেছেন, এবং টীকাকার মহেশ্বরের মতে, এই সব ক্রীতদাসীদের গৃহস্বামীর কাম-তৃষা নিবারণের জন্মেই রাখা হতো। (৫)

ধর্ম-কর্ম ও দেবালয়কেও এই অশোভন যৌন-বিহার স্পর্শ করে, এবং একে আশ্রয় করে সামাজিক ক্রিয়াকর্মে প্রসার লাভ করে। তখনকার দিনে মন্দিরে দেবদাসী প্রথা খুব চালু ছিল; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দেবদাসীরা দেব সেবার অন্তরালে সামাজিক উচ্চ বর্ণসমূহের ভোগলিপ্সার ইন্ধন যোগাত। এদিক থেকে সাধারণ বারবণিতাদের চেয়ে খুব উঁচু ছিল না। ধোয়ী উৎসাহভরে লিখেছেন:

> অস্মিন্ সোনান্বয়নৃপতিনা দেবরাজ্যাভিষিক্তো
> দেবঃস্কন্ধে বসতি কমলাকেলিকারো মুরারিঃ।
> পার্শ্বে লীলাকমলমসকৃৎ যৎসমীপে বহন্ত্যো
> লক্ষ্মীশঙ্কাং প্রকৃতিসুভগাঃ কুর্বতে বাররামাঃ॥

[সেই সুহ্মদেশে সেন বংশীয় ভূপতি কর্তৃক দেবরাজ্যে অভিষিক্ত কমলাপতি দেব মুরারি বাস করছেন, যাঁর কাছে সর্বদা লীলাকমলধারিণী স্বভাবসুন্দর বারনারীরা অবস্থান করে লোকের মনে লক্ষ্মী ভ্রম উৎপাদন

৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত "বাংলার ইতিহাস" প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬১৮

করে।] (৬) "তখন মুক্ত রাজপথে সায়ংকালেই বারবিলাসিনী দলের 'মঞ্জু মঞ্জীর ধ্বনি'—'বল্যং ত্রিসন্ধ্যং নভঃ।'...তিনি (কেশব সেন) কৌমারে বীরব্রত হইলেও তখন কেবল 'কুরঙ্গী-দৃশা' লজ্জাবনতা সুন্দরী-কুলের 'নীবিবন্ধ বিসরণে'ই ব্যাপৃত থাকিয়া উদ্ভট শ্লোকের 'নীবি মোক্ষো হি মোক্ষঃ' এই পরিহাস বাক্য সার্থক করিয়াছিলেন।" (৭)

ব্যবহারিক ধর্মকর্মের ক্ষেত্রে দেখি, দুর্গোৎসবের সময়ে বিজয়া দশমী তিথিতে শারদোৎসব পালন করা হতো। এ উপলক্ষে উৎসবে যোগদান-কারীরা শবরদের অনুকরণে লতাপাতা ও কাদামাটিতে সর্বাঙ্গ লেপে যদৃচ্ছা লম্ফ-ঝম্ফ, নৃত্য এবং অশ্লীল কুরুচি সম্পন্ন কাহিনী ও গান করত। এ প্রসঙ্গে বৃহদ্ধর্মপুরাণ বলছেন, আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসবের সময় ছাড়া পুরুষ ও স্ত্রীযোনি-সংক্রান্ত কোন কথা উচ্চারণ করা উচিত নয়; এমন কি, তখনও মা-মেয়ে-শিষ্যার সম্মুখে এসব কথা বলা উচিত নয়,......তবে যারা সত্য সত্যই দেবীপূজার উপযুক্ত, দেবীর আনন্দ বর্ধনের জন্যই তাদের এসব কথা বলা উচিত। কালবিবেকের মতে দুর্গোৎসবের কালে এসব এবং আনুষঙ্গিক অঙ্গভঙ্গী না করলে দেবী অসন্তুষ্ট এবং রুষ্ট হবেন। (৮) শুধু দুর্গোৎসব নয়, কামমহোৎসবের সঙ্গেও এই কুৎসিত বিধিব্যবস্থা ও স্মৃতি জড়িত।

একদিকে যাগযজ্ঞহোম ধর্মানুষ্ঠানের ঘটা, বিভিন্ন সামাজিক বর্ণ-উপবর্ণের আচার-ব্যবহারের উপর সুকঠোর নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক বিধি ব্যবস্থার দুরতিক্রম্য প্রাচীর, আর অন্যদিকে শিথিল ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, রুচি-গর্হিত ক্রিয়াকর্ম ও ধর্মাচার। এই দুই ধারাকে একসঙ্গে কল্পনা করা যায় না, কিন্তু কল্পনা করা অসম্ভব হলেও তা সত্য। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শ বাংলায় বিদ্যুৎ-তরঙ্গে প্রসারলাভ করেছিল, কিন্তু তার নিষ্কলুষ সমৃদ্ধি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি; সমৃদ্ধির ছায়ারূপী ক্ষয়টাও অতি দ্রুত অনুসরণ করেছে। সেন-পর্বের সাংস্কৃতিক ভারাকাশ তাই সর্বাধিক সজীব প্রাণ-তরঙ্গে হারিয়ে বাহ্য নিষ্ঠার বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়। ক্রমে যে তা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে তা

যুক্ত সুকুমার সেনের অনুবাদ

৭ মধ্যযুগে বাংলা—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত "বাংলার ইতিহাস" প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬০৬-৭

সহজেই অনুমেয়। রাজপ্রাসাদের অমার্জিত বিলাস, নাগর জীবনের বাহ্য মোহ ও চাকচিক্য, সামাজিক অনুষ্ঠানের আড়ম্বর, যেন শিল্প-ভাস্কর্যের একান্ত পার্থিব ও স্থূল ঐশ্বর্য, চোখ ধাঁধায় অবশ্য, কিন্তু তা অন্তরকে স্পর্শ করে না। আসল কথা, ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও সংস্কার ক্ষয় ও ধ্বংসের প্রান্ত সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে, এই সমাজের বিধায়করা বৌদ্ধ-তান্ত্রিক প্রভাব থেকে ব্রাহ্মণ্য সমাজকে রক্ষা করার জন্য নানাভাবে পথঘাট বেঁধে সংরক্ষণী প্রাচীর তৈরী করেছিলেন; কিন্তু সম্ভবত বন্ধনের দৃঢ়তাই ক্ষয়ের শিথিলতার পথ খুলিয়ে দিয়েছে। এই ধ্বংসোন্মুখ সমাজের প্রভাব সে যুগের সংস্কৃতিতে সুস্পষ্ট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত "বাংলার ইতিহাস" (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থের একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য : Certain it is that the literature of the Sena period and the religious texts and practices of the later phases of both Hinduism and Buddhism occasionally betray a degradation in ideas of decency and sexual morality which could not but seriously affect the healthy development of moral and social life. It is obviously a dangerous ground to tread upon, ...but it is difficult to avoid the conclusion that religious influences were responsible to a large extent for the two great evils which were sapping the strength and vitality of society : the disintegrating and pernicious system of rigid caste-divisions with its elaborate code of purity and untouchability ; and the low standard of morality that governed the relations between men and women. (P. 619—20) অর্থাৎ, সেন পর্বের সাহিত্যে এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মের শেষ পর্যায়ের ধর্মগ্রন্থাদি ও ধর্মাচারে অনেক সময় শালীনতাবোধের এবং যৌন আচরণ সংক্রান্ত নীতিবোধের অভাব দেখা যায়, যা সমাজজীবনের সুস্থ বিকাশধারাকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছে। যে দু'টি প্রধান ব্যাধি সমাজের শক্তি ও সজীবতা ক্ষয় করছিল, যথা, সুকঠোর বর্ণবিভাগ ও নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্কের শিথিল নীতিবোধ, তার জন্যে ধর্মীয় প্রভাবই যে বহুলাংশে দায়ী, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

রাজপ্রাসাদ ও নাগরিক জীবনের বিলাস ব্যসনের অন্তরালে আরও একটি চিত্র লুকানো, যার পরিচয় ছাড়া এ যুগের পরিবেশকে জানা সার্থক হবে না। বর্ণপ্রথা শাসিত এই সমাজ ব্যবস্থা একান্তই কৃষি-নির্ভর সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল। ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যই এই যে, সমবায় ভিত্তিতে গঠিত গ্রামের রাজস্বের দাবী ক'রে এখানে রাজায় রাজায় যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে, কিন্তু এই যুদ্ধ-কলহের স্পর্শ এড়িয়ে গ্রামগুলো যুগ থেকে যুগান্তরে পা দিয়েছে, সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত, অচঞ্চল, অচিন্তিতভাবে। এই গ্রামনির্ভর আত্মসর্বস্ব জীবন যে নানাদিক থেকেই নিঃসহায় নিরুপায় ছিল, ছিল নানা কুসংস্কার ও কু-আচার এবং নিসর্গ পূজার অন্ধতায় আচ্ছন্ন, তা সহজেই অনুমান করা চলে। বর্ণাশ্রমের বাইরে অস্পৃশ্য পর্যায়ে যাদের অধিষ্ঠান ছিল, তাদের জীবনের মূল্য কারও কাছে কখনও কিছু ছিল কিনা, তা বলা কঠিন। আর শুধু তারাই বা কেন, বর্ণাশ্রমের সর্বনিম্নে যাদের স্থান ছিল, তাদের জীবনও যে নানাভাবে বঞ্চিত, উপেক্ষিত, উৎপীড়িত তাও নিঃসন্দেহে কল্পনা করা চলে। সামাজিক ধনসম্পদের অধিকাংশ সমাজ-বিন্যাসের পিরামিডের চূড়ায় সঞ্চিত হতো। শাসকবর্গের সন্তুষ্টি বিধান করতে পারলেই তবে অধস্তন বর্ণগুলি যৎকিঞ্চিৎ সুখসুবিধা ও সামাজিক মর্যাদা অর্জন করতে পারত। আর তা না পেরে, তারা শত শত বৎসর ধরে নানাবিধ গ্লানি আর দুঃখের বোঝা বহন করে এসেছে। তাদের জীবনের মূল ছবিটি ধরা পড়বে কবি বারের ভাষায়:

> বৈরাগ্যৈকসমুন্নতা তনুতনুঃ শীর্ণাম্বরং বিভ্রতী
> ক্ষুৎক্ষামেক্ষণকুক্ষিভিশ্চ শিশুভির্ভোক্তুং সমভ্যর্থিতা।
> দীনা দুঃস্থকুটুম্বিণী পরিগলদ্‌বাষ্পাম্বুধৌতাননা—
> প্যেকং তণ্ডুলমানকং দিনশতং নেতুং সমাকাঙ্ক্ষতি॥

[নিরানন্দে তার দেহ সমুন্নত ও শীর্ণ, পরিধানে জীর্ণ বস্ত্র। ক্ষুধায় চোখ ও পেট বসে গিয়েছে শিশুদের, তারা ব্যাকুল হয়ে খাবার চাইছে। দীন দরিদ্র গৃহিণী চোখের জলে গাল ভাসিয়ে প্রার্থনা করছে যেন এক মান তণ্ডুলে এক শ' দিন চলে যায়।]

একজন অজ্ঞাতনামা কবির ভাষায়:

> ক্ষুৎক্ষামাঃ শিশব শবা ইব তনুর্মন্দাদরো বান্ধবো।
> লিপ্তা জর্জর কর্করী জললবৈর্নো মাং তথা বাধতে।

গেহিন্যাঃ স্ফুটিতাংশুকং ঘটয়িতুং কৃত্বা সকাকুস্মিতং
কুপ্যন্তী প্রতিবেশিনী প্রতিমুহুঃ সূচীং যথা যাচিতা ॥

[শিশুরা ক্ষুধায় আকুল, দেহ শরের মত শীর্ণ, আত্মীয়স্বজন বিমুখ, পুরানো গাড়ুতে এক ফোঁটা মাত্র জল ধরে,—এ সকল আমাকে তত কষ্ট দেয়নি যেমন কষ্ট দিয়েছিল গৃহিণী যখন কাতর হাসি হেসে ছেঁড়া কাপড়টুকু সেলাই করবার জন্য বারবার রুষ্ট প্রতিবেশীর কাছ থেকে সূচ চাইছিল তা দেখে।] ইহাই হ'লো এক বর্ণ ও এক ধর্ম শাসিত সামন্ত সমাজ ব্যবস্থায় নিম্নবর্ণের নিগৃহীত ও বঞ্চিত মানুষের জীবনচিত্র। (৯)

এই পরিস্থিতিতে কি সুগভীর বেদনা ও জ্বালা বুকে নিয়ে এই স্তরের অধিবাসীরা দিন যাপন করেছে, তা বুঝতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না। বলা বাহুল্য, রাজদৃষ্টি ও সমাজ বিধায়কদের দৃষ্টি এই দিকটায় কখনও পড়েনি; রাজসভার জাঁক ও আড়ম্বর, আর সমাজশাসকবর্গের নিষ্ঠা ও বিধিনিষেধের প্রাচীর তাদের নিজ নিজ সীমানার মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে, আর সমাজ-ব্যবস্থা অত্যন্ত সুরক্ষিত মনে করে তারা আত্মশ্লাঘা অনুভব করেছেন হয়তো। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে তা আত্মক্ষয় করে চলেছিল। এই ব্যবহারিক জীবনের দুঃসহ অবস্থার পীড়ন থেকে মানুষ যে মুক্তিকামনা করেছে, তাও সমভাবে সত্য। তাদের এই কামনা লোকায়ত ধর্মমত ও পথকে আশ্রয় করে অভিব্যক্তও হয়েছে। হয়তো বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের রূপ গ্রহণ করেনি।

এই বিচিত্র সমাজ, যেখানে একদিকে নিয়ম-নিষ্ঠা-আচার এবং অন্যদিকে সমাজঅনুমোদিত অনাচার-ব্যভিচার; একদিকে শিল্প-সাহিত্যানুশীলন এবং অপরদিকে সাংস্কৃতিক অধঃপতন; একদিকে সামাজিক উচ্চবর্ণের বিলাস-কলুষিত আড়ম্বর এবং অন্যদিকে দারিদ্র্যের মলিনতা; একদিকে ধর্মাচার এবং অন্যদিকে ধর্মগত উৎপীড়ন ও ভেদ-বিচার, এবং ঐ ভেদবিচার থেকে সাধারণ মানুষের মুক্তির আকুতি, সমতা, মৈত্রী ও করুণার জয়গান—এই সামগ্রিক চিত্রই চর্যাগীতির সামাজিক পটভূমি।

---

৯ এই দু'টি শ্লোক এবং অনুবাদ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের "প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালী" গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

দুই

চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে যে সব সিদ্ধাচার্যের পদ সংগৃহীত হয়েছে তাঁরা বৌদ্ধ শ্রমণ; বিভিন্ন বিহারে তাঁরা বসবাস করতেন, এবং সম্ভবত সংঘবদ্ধভাবে সংকীর্তন করতেন। এই সিদ্ধাচার্যগণ বৌদ্ধবিহারে আশ্রয় গ্রহণ করার পূর্বে বর্ণাশ্রমের কোন্ স্তরের অন্তর্গত ছিলেন অথবা আদৌ তাঁরা বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত ছিলেন কিনা, তাঁদের বৃত্তি কি ছিল, এক কথায় তাঁদের সামাজিক অধিষ্ঠান সম্পর্কে একটু অনুসন্ধান ন্যায়তই করা যেতে পারে। এবং এই অনুসন্ধানের সাহায্যে কথঞ্চিৎ ফললাভ করলেই তাঁদের ভিক্ষু-জীবনকে ও তাঁদের মনোগত ভাবনা-কল্পনার জগৎকে, এবং বৌদ্ধতান্ত্রিকতা বা বৌদ্ধসহজিয়া মতবাদের মধ্যে তাঁরা কোন্ তত্ত্ব ও সত্য উপলব্ধি করতে চেয়েছেন তার স্বরূপ বোঝা যাবে। অতীত থেকে তাঁদের বর্তমানকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তা কোনক্রমেই অনুধাবন করা যাবে না।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁদের সম্পর্কে তথ্যের একান্ত অভাব। দু'চার জন সিদ্ধাচার্য সম্পর্কে কিছু কিছু সংবাদ সংগৃহীত হয়েছে, কিন্তু তা-ও যথেষ্ট নয়। তবে যে সংবাদ পাওয়া গেছে, তার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। যেমন, লুইপাদ; অনেকের ধারণা, লুইপাদ এবং মাৎস্যেন্দ্রনাথ একই ব্যক্তি। লুই-পা'র তিব্বতী অর্থ মৎস্যোদর, এবং তিব্বতী টীকাকারগণ তাঁকে ধীবরবর্ণের সিদ্ধাচার্য বলে আখ্যাত করেছেন। এই সূত্র থেকে কুক্কুরীপাদ সম্পর্কে জানা যায় যে, যোগের ভেতর দিয়ে তিনি একটি স্ত্রীলোকের সহিত মিলিত হন, যিনি পূর্বে কুক্কুরী ছিলেন, এবং সেজন্যই তাঁকে কুক্কুরীপাদ বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি নাকি ছিলেন ব্রাহ্মণ। (১০)

---

১০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত "বাংলার ইতিহাস" ১ম খণ্ড; পৃঃ ৩৪০ পাদটিকা।

এই কাহিনীর সংগে তাঁর ব্রাহ্মণত্ব নিতান্তই বেমানান, এবং অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। তাঁর নামের ওপর নির্ভর করলে তাঁকে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার বাইরে অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য পর্যায়ে ফেলতে হয়। তবে তাঁর ব্রাহ্মণত্ব সম্পর্কে এইটুকু বলা যেতে পারে যে, আর্যীকরণের প্রাক্কালে বাংলার অনার্য আদি অধিবাসীদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায়কে ব্রাহ্মণ পর্যায়ে উন্নীত করা হয়, এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির প্রতি যথার্থ আনুগত্যের অভাবে তাদের অনেককে পুনরায় অবনমিতও করা হয়; ইতিপূর্বে তার ইংগিত দেওয়া হয়েছে। কুক্কুরীপাদ এই অবনমিত ব্রাহ্মণদের একজন হতে পারেন। অথবা তাঁকে লোকের চোখে পদমর্যাদায় বড় বলে প্রতিপন্ন করার জন্য তৎকালীন ব্রাহ্মণদের সামাজিক মর্যাদাকে এক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়ে থাকতে পারে। শবরপাদ সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি বাংলা দেশের কোন এক পর্বতে তাঁর দুই স্ত্রীর সহিত শিকারাদি করে জীবন ধারণ করতেন; নাগার্জুন তাঁকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। এছাড়া কম্বলাম্বরপাদ, গুণ্ডরীপাদ অথবা গুড্ডরীপাদ, চাটিলপাদ, ঢেণ্ঢনপাদ, দারিকপাদ, বিরূপাপাদ, ভুসুকুপাদ, ডোম্বীপাদ (যদিও তাঁকে ক্ষত্রিয় বলে অভিহিত করা হয়েছে) প্রভৃতিরাও কুক্কুরীপাদ ও শবরপাদের সামাজিক স্তরের স্মৃতি বহন করছেন বলে মনে হয়। আর তা না হলেও তাঁরা যে সামাজিক নিম্ন-বর্ণের অন্তর্গত, তা তাঁদের নামেই প্রকাশ।

কঙ্কণপাদ, জয়নন্দী, তন্ত্রীপাদ (তন্তুবায় সম্প্রদায়ভুক্ত ?) তাড়কপাদ, ভদ্রপাদ, মহীধরপাদ, ধাম্পাদ বা গুঞ্জরীপাদ প্রভৃতিকে তাঁদের নাম বিচারে বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত অব্রাহ্মণ্যবর্ণের লোক বলে গণ্য করা যেতে পারে। কোন কোন মতে সরহপাদের অপর নাম রাহুলভদ্র। তা' সত্য হয়ে থাকলে তাঁকেও অব্রাহ্মণ্য বর্ণের অন্তর্গত বলে ধরা যেতে পারে। শুধু-মাত্র আর্যদেব, কৃষ্ণাচার্য বা কাহ্নুপাদ, শান্তিপাদ বা বীণাপাদই দৃশ্যত ব্রাহ্মণ্যবর্ণের দাবী করতে পারেন; তবে তাঁরা অন্যান্য বর্ণের অন্তর্ভুক্তও হতে পারেন। অথবা, এও হতে পারে যে, এই আর্য-গন্ধী নামগুলো তাঁদের ভিক্ষুজীবনের পরিবর্তিত নাম।

তা'হলে দেখা যাচ্ছে যে, চর্যাগীতিকারগণ অধিকাংশই হয় বর্ণাশ্রমের বাইরে অন্ত্যজ-ম্লেচ্ছ পর্যায়ের লোক, নয়তো বা বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত নীচ

সামাজিক বর্ণের প্রতিনিধি। কেবলমাত্র তাঁদের নামের আলোচনা বা বিচার থেকেই যে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে, তা' নয়। তাঁদের জীবনধারণের ইংগিত গ্রহণ করলেও একই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। সেকশুভোদয়া গ্রন্থে একটি কাহিনী আছে এ সম্পর্কে, তা এইরূপ: "গৃহস্থাশ্রমে ইনি ছিলেন গোয়ালা, নাম সুধাকর। যোগী হয়ে নাম হলো চন্দ্রনাথ। ইনি লক্ষণসেনের সভায় এলে রাজা এঁকে কিছু আহার করতে অনুরোধ করলেন। রাজার কথায় রাজি হয়ে যোগী চাইলেন অমৃতান্ন। রাজা উত্তম মিষ্টান্ন আনিয়ে দিলে যোগী মুখে থু থু করে ফেলে দিয়ে বললেন, এ বিষান্ন। রাজা তো অবাক হয়ে রইলেন। তখন চন্দ্রনাথ বললেন, তোমার সভায় কেউ পণ্ডিত থাকে তো তাকে ডাকাও। রাজা গোবর্ধন-আচার্যকে ডাকিয়ে আনলেন। আচার্য শুনে বললেন, এঁকে খুব খারাপ চালের ভাত আর কাল-কচু শাক রেঁধে এনে দেওয়া হোক। তাই দেওয়া হলে যোগী খুব পরিতৃপ্তি করে তা খেলেন। তখন রাজা বললেন, এ কি রকম ব্যাপার। যোগী উত্তর করলেন, মিষ্টান্ন ভক্ষণ করলে আমাদের বিষ খাওয়া হয়, আর কদর্য অন্ন খেলে পরিণামে অমৃতভক্ষণের ফল হয়।" (১১) মনে হয়, এক্ষেত্রে নাথ যোগী এবং বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই; ইনি নাথ যোগী না হয়ে অনায়াসে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য হতে পারতেন। বিশেষত, যেখানে নাথ সিদ্ধাচার্যদের নাম তালিকায় বহু বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যের নাম দেখা যায়।

এই সিদ্ধাচার্যদের কেহ কেহ সম্ভবত তাঁদের প্রাক-ভিক্ষু-জীবনে ব্রাহ্মণ্য সমাজসংস্থায় কোন স্থানলাভ করেন নি; অন্ত্যজ-ম্লেচ্ছ সম্প্রদায়ভুক্ত থেকে ব্রাহ্মণ্য সমাজের অবজ্ঞা, ঘৃণা এবং সীমাহীন অনাদর ভোগ করেছেন। বৈশ্য ও শূদ্রদের সম্পর্কে হপকিন্স বলেছেন, "Their lives depended on their owner's pleasure. They were born to servitude... They were in fact the remnant of a displaced native population....stigmatised by their conqueror's pride as a people apart, worthy only of contempt and slavery." বৈশ্য ও শূদ্রদের যদি এ অবস্থা হয়ে থাকে তো অন্ত্যজ পর্যায়ের জনসমষ্টির

১১ প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী; পৃঃ ৩৫-৬

প্রতি মনোভাব কিরূপ ছিল তা সহজেই অনুমেয়। আর কেহ কেহ সম্ভবত ব্রাহ্মণ্য সমাজসংস্থায় স্থানলাভ করেও সেখান থেকে চ্যুত হয়েছেন। কেহ কেহ হয়তো বর্ণাশ্রমের বিধি-নিষেধের প্রাচীর ও শৃঙ্খলবাধা জীবনে প্রাণের কোন স্পন্দন অনুভব করেননি; মুক্তির সজীব আনন্দ-পিপাসু তাঁদের মন এখানে নির্ভয়ে নিঃশ্বাস ফেলতে পারেনি। তাই হয়তো প্রত্যক্ষভাবে অত্যাচারিত ও অবাঞ্ছিত না হয়েও বুদ্ধি দিয়ে এর অসঙ্গতি ও অসম বিধিব্যবস্থার স্বরূপ বুঝতে পেরেছিলেন, এবং বৌদ্ধ-বিহারের মৈত্রী, শান্তি ও সমতার আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

ভিক্ষুজীবনেও তাঁরা তাঁদের প্রথম জীবনকে বিস্মৃত হতে পারেন নি। গভীর অধ্যাত্ম উপলব্ধিকে প্রকাশ করার জন্য তাঁরা সাধারণ জীবনের অতি পরিচিত অভিজ্ঞতারই আশ্রয় গ্রহণ করেন। শিকার করা, জুয়া খেলা, মদ চোয়ানো, ডাল চাঙ্গারি বোনা, কাঠ কাটা, খেয়া বাওয়া, নৌকা গড়া, তুলো ধোনা, নট সেজে নৃত্যগীত করা—ইত্যাদি প্রাত্যহিক কর্মের মাধ্যমে, এবং এখান থেকে উপমা-রূপক সংগ্রহ করে এর ভিতর দিয়ে তাঁরা তাঁদের মনোভাব প্রকাশ করেছেন। এর সংগে সাধারণ জীবনের খণ্ড খণ্ড এবং পরিপূর্ণ চিত্রও এইসব গীতে রয়েছে। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও সত্য প্রকাশের বাহন হিসেবে এইসব উপমা ও চিত্রের মূল্য প্রধান নয়, কেন না, সিদ্ধাচার্যগণ এদের অন্তর্নিহিত ভাব ও অর্থকেই জ্ঞাপন করতে চেয়েছেন, চিত্রগুলিকে নয়। কিন্তু, অপর দিক থেকে, এইসব চিত্রের মূল্য তুচ্ছ এবং উপেক্ষারও নয়; কেন না, এগুলো বাস্তব সামাজিক সত্য। জীবনের রূপ কি ছিল, সামাজিক আদর্শ কিরূপ ছিল, সমাজ সংগঠনের গতি কোন দিকে ছিল,—তার প্রত্যক্ষ পরিচয় এইসব চিত্রের সংগে জড়িত রয়েছে; সেই দৃষ্টিতে এদের গুরুত্ব অনেক।

চর্যাগীতির ইতস্তত যেসব খণ্ড ও পরিপূর্ণ চিত্র ছড়ানো রয়েছে, তার আলোচনা করলে একটা সুগভীর শূন্যতাবোধ এবং দারিদ্র্যের চিত্রই ফুটে ওঠে। ইতিপূর্বে সমাজ-পরিবেশের আলোচনায় নিম্নস্তরের অধিবাসীর প্রাত্যহিক জীবনের যে চিত্র আমরা পেয়েছি, এ চিত্রগুলিও তাদের সমপর্যায়ের। ভুসুকুর একটি চর্যা এইরূপ:

কাহেরে ঘিনি মেলি অচ্ছহু কীস।
বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস॥
অপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ ভুসুকু অহেরি
তিন ন চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পানী।
হরিণা হরিণীর নিলঅ ন জানী॥
হরিণী বোলঅ সুণ হরিণা তো।
এ বন চ্ছাড়ী হোহু ভান্তো॥
তরংগতে হরিণার খুর ন দীসঅ।
ভুসুকু ভণই মূঢ়—হিঅহি ন পইসই॥

অর্থাৎ—কাহাকে গ্রহণ করে কিসে মুক্ত আছি। (হরিণকে মারবার জন্তে) চারদিক বেষ্টন করে হাঁকডাক পড়ছে। আপনার মাংসে হরিণ সকলের শত্রু (তার মাংসের জন্তই সকলে তাকে মারতে চায়); ভুসুকু ক্ষণকাল (হরিণকে) ছাড়ে না, হরিণ তৃণ স্পর্শ করে না, জল পান করে না। হরিণ হরিণীর আবাস কোথায় তা জানে না। হরিণী বলে, "শোন তুই হরিণ, এ বন ছেড়ে ভ্রান্ত হও (দূর দেশে চলে যাও)।" ত্রস্ত হরিণের খুর দেখা যায় না। ভুসুকু বলে, মূর্খের হৃদয়ে (এ-তত্ত্ব) প্রবেশ করে না।

হরিণ এখানে মন। ব্যবহারিক পৃথিবীর দিকে সে সর্বদাই প্রসারিত হ'তে চায়, তাই বস্তু-সংস্পর্শে তাকে আহত হ'তে হয়। কেননা, মনের তৃষা সেখানে তৃপ্ত হয় না, এই অতৃপ্তি থেকেই আসে দুঃখ। এইসব দুঃখই মনকে ব্যাধের মত চেপে ধরে। হরিণের স্থানে মনকে না বসিয়ে যদি ভুসুকুকে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বাস্তব সমাজে বিচরণশীল মানুষটিকে বসাই, তাহলে চিত্রটা এইরূপ দাঁড়ায়: ভুসুকুকে মারবার জন্ত চারিদিকে ষড়যন্ত্রের কলরব শোনা যাচ্ছে; তার নিজের গুণের জন্তই তাঁর এই বিপদ। তাই মনের দুঃখে সে পানাহার ত্যাগ করেছে, কিন্তু মুক্তির পথ কি তা সে জানে না। মুক্তির প্রেরণা তাকে বলছে, এই এলাকা ছেড়ে আর কোথায়ও চলে যাও। সেই আহ্বানেই সে দ্রুতগতিতে চলে এসেছে, এবং এসে নিজেকে বাঁচিয়েছে। সমকালীন সমাজের যে চিত্র আমরা পেয়েছি, এবং সামাজিক নিম্নবর্গের প্রতি উচ্চবর্গের অহুদার ব্যবহারের যে পরিচয়

আমরা পেয়েছি, তাতে এই চিত্রটিকে এবং কুক্কুরীর অচেতন অব্যক্ত মুক্তি-প্রেরণাকে বিন্দুমাত্রও অসংগত মনে হয় না।

এইরূপ আরও কয়েকটি চিত্র চর্যাগীতিতে পাওয়া যায় ঢেণ্ঢণপাদের চর্যাটি এইরূপ :

টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেষী।
হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥
বেঙ্গ সংসার বড়হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামাঅ॥
বলদ বিআঅল গবিআ বাঁঝে।
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে॥
জো সো বুধী শোধ নিবুধী।
জো যো চোর সোই সাধী॥
নিতি নিতি ষিআলা ষিহে ষম জুঝঅ।
ঢেণ্ঢণপা এর গীত বিরলে বুঝঅ॥

অর্থাৎ—টালেতে আমার ঘর, প্রতিবেশী নেই; হাঁড়ীতে ভাত নেই, (তথাপি) নিত্য অতিথি। বেঙের সংসার বেড়েই চলেছে। দোহা দুধ কি পুনরায় বাঁটে প্রবেশ করে? বলদ বিয়ায়, গাই বন্ধ্যা। (সেই দুধ) এ তিন সন্ধ্যা পেটায় দোহা হয়। সেই যে বুদ্ধি, তা নির্বুদ্ধি, সেই যে চোর, সেই সাধু। প্রতিদিন সিংহের সংগে শেয়াল লড়াই করে। ঢেণ্ঢণপাদের এই গীত কেহ কেহ বোঝে।

এই চিত্রটিকে বর্ণাশ্রমের বাইরে অধিষ্ঠিত অন্ত্যজ-জীবনের প্রতিচ্ছবি বলে ধরা যেতে পারে। সকলেই তাকে পরিত্যাগ করেছে; ঘরে তার ভাত নেই, অথচ তার উপরই আবার চাপ বেশি। এদিকে তা'র নিজের সংসারও বেড়ে যাচ্ছে। কি করবে সে? এই সংসার কেবল অসংগতিতে ভর্তি। যার বুদ্ধি নেই, সেই বুদ্ধিমান; যে চোর সেই সাধু। যার কোন শক্তি নেই, সেই শক্তিমানের সংগে লড়াই করছে। (এই অসংগতির মধ্যে তার আশা করবার কী-ই বা আছে?)

এই সামাজিক অসংগতি এবং নৈতিক অধঃপাতের চিত্র কুক্কুরীপাদের চর্যাতেও (২নং) রয়েছে। যথা :

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ॥
আঙ্গণ ঘরপণ সুন ভো বিআতী।
কানেট চোরে নিল অধরাতী॥
সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কী গই মাগঅ॥
দিবসই বহুড়ী কাড়ই ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামরু জাঅ॥
অইসন চর্যা কুক্কুরী—পাএঁ গাইড়।
কোড়ি মাঝে একু হিঅহি সমাইড়॥

অর্থাৎ, কচ্ছপ দুহিয়ে পাত্রে দুধ ধরছে না; গাছের তেঁতুল কুমীরে খাচ্ছে। অঙ্গন ঘরের পানে; শোন হে নারী। অর্ধরাত্রে চোরে কানেট (কর্ণভূষণ বা অন্তর্বাস) চুরি করেছে। শাশুড়ী ঘুমিয়েছে, বধূ জেগে আছে; কানেট চুরি গিয়েছে, কোথায় গিয়ে তা খুঁজবে? দিনের বেলায় বধূ কাকের ডরে ভয় পায়, আর রাতে কাম-চর্চায় বেরিয়ে যায়। কুক্কুরীপাদের এই চর্যা কোটির মধ্যে একজনের হৃদয়ে প্রবেশ করে।

ভুসুকুর একটি চর্যায় (৪৯ নং) একটা দীন অসহায় পরিস্থিতির ইংগিত দেওয়া হয়েছে। যেমন:

সোন রুঅ মোর কিম্পি ন থাকিউ।
নিঅ পরিবারে মহাসুহে থাকিউ॥
চউকোড়ি ভাণ্ডার মোর লইআ সেস।
জীবন্তে মইলে নাহি বিশেস॥

[সোনা রুপা আমার কিছু অবশিষ্ট রইল না; নিজ পরিবারে মহাসুখে থাকলাম। আমার চতুঃকোটি ভাণ্ডার নিঃশেষ করে নিয়ে গিয়েছে; এখন জীবন মরণে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।]

কয়েকটি চর্যায় বর্ণাশ্রম বহির্ভূত উদ্দাম জীবনের মনোরম চিত্র আঁকা হয়েছে। পদকর্তার হৃদয়াবেগ এবং আনন্দানুভূতি এই চিত্রের সংগে মিশে একে আকর্ষণীয় করেছে; তিনি যেন সেই উদ্দাম মুক্ত জীবনের রসাস্বাদনের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন, এবং তা সম্ভব নয় বলেই যেন তিনি বিস্ময়াবিষ্ট

দৃষ্টিতে সেই জীবনযাত্রা অবলোকন করছেন এবং মুগ্ধ হচ্ছেন। যেমন কাহ্নুপাদের চর্যাতে (১০ নং) :

নগর বাহিরি রে ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্মণ নাড়িআ॥
আলো ডোম্বি তোএ সম করিব ম সাঙ্গ।
নিঘিন কাহ্ন কাপালি জোই লাংগ॥
এক সো পদুমা চৌষঠ্ঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বি বাপুড়ী॥
হালো ডোম্বি তো পুছমি সদভাবে।
আইসসি জাসি ডোম্বি কাহরি নাবেঁ॥
তান্তি বিকণঅ ডোম্বি অবরনা চাংগেড়া।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়—পেড়া॥
তু লো ডোম্বী হাঁউ কপালী।
তোহোর অন্তরে মোএ ঘেণিলি হাড়ের মালী॥
সরবর ভাঞ্জিঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ।
মারমি ডোম্বি লেমি পরাণ॥

[ডোমনী, নগরের বাইরে তোর কুঁড়ে, তুই নেড়া ব্রাহ্মণকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাস। ওলো ডোমনী, আমি তোর সংগে সাঙ্গা করবো, আমি নির্ঘৃণ উলঙ্গ কাপালিক যোগী কাহ্ন। একটি পদ্ম, তার চৌষট্টি পাপড়ি। তাতে চড়ে ডোমনী আর কাপালিক নাচে। ওলো ডোমনী, আমি তোকে সদ্ভাবে জিজ্ঞেস করছি, কার নায়ে তুই যাতায়াত করিস? ডোমনী তাঁত বিক্রি করে আর চাঙ্গারি; তোর জন্যে আমি নটের পেটিকা ত্যাগ করলাম। তুই ডোমনী আর আমি কাপালিক; তোর জন্যে আমি হাতের মালা বর্জন করলাম। সরোবর ভেঙ্গে ডোমনী মৃণাল খায়। ডোমনী তোকে মারি, প্রহার করি।]

এছাড়া ডোম্বীপাদের "গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাই" (১৪ নং চর্যা) কাহ্নুপাদের "তিনি ভুঅণ মই বাহিঅ হেলেঁ" (১৮ নং চর্যা), শবরপাদের "উচা উচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালা" (২৮নং চর্যা) প্রভৃতি চর্যাতেও কল্পনার ঐশ্বর্য ও হৃদয়রসেঢালা অনুরূপ চিত্র আঁকা হয়েছে। এমনকি,

শবরপার শূন্যতায় নির্বাণ লাভ করে সেই সত্য দিয়ে গৃহ নির্মাণের যে চিত্র এঁকেছেন, তা-ও সুন্দর, এবং বাস্তব জীবনাস্বাদনের রসে সিঞ্চিত। যেমন :

গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হিঁন কুরাড়ী।
কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী॥
ছাড়ু ছাড়ু মাআ মোহা বিষম দুন্দোলী।
মহাসুহে বিলসন্তি শবরো লইআ সুণমে-হেলী॥
হেরিসে মোর তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।
সুকড়এ সেরে কাপাসু ফুটিলা॥
তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্না বাড়ী উএলা।
ফিটেলি আন্ধারি রে আকাশ-ফুলিআ॥
কঙ্গুচিনা পাকেলারে শাবরশবরী মাতেলা।
অণুদিনি শবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভোলা॥ ইত্যাদি

[গগন-লগ্নে বাড়ী, হৃদয়ে কুঠার ; কণ্ঠে নৈরাত্ম বালিকা (নিয়ে যোগী) জাগে। মিথ্যা মায়া মোহ বিষম দ্বন্দ্বের মূল ছেড়ে শবর মহাসুখে শূন্যে বিলাস-ক্রিয়া নিয়ে মগ্ন রয়েছে। দেখছি সেই বাড়ী আমার প্রভাস্বরূপ হয়েছে, এবং সুন্দর কাপাস ফুল ফুটেছে। সেই বাড়ীর পাশে জ্যোৎস্না উদিত হয়েছে, আর আকাশফুলের মত অন্ধকার পালিয়েছে। কঙ্গুচিনা ফল পেকেছে, (তার রস খেয়ে) শবর মেতেছে। কোন দিকেই শবরের দৃষ্টি নেই, এমন সুখে সে নিমগ্ন।]

এই শূন্যতার প্রাসাদে কার্পাস ফুলের অস্তিত্ব সত্যই অপরূপ, বিশেষ করে যখন সূক্ষ্ম কার্পাস-বস্ত্র (মলমল) পরা সে যুগে প্রচলিত ছিল। হয়তো এই কার্পাস-ফুল ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক রূপেই প্রতিভাত হয়েছে। বাস্তব জীবনের যে শূন্যতা তাকে মাথা তুলতে দেয় না, তা অপসৃত হয়ে পূর্ণতার জীবন ভরে উঠুক, এমনি একটা চেতনা মনের কোন অঞ্চলে গোপন থাকতে পারে, তা অস্বাভাবিক নয়। সেই পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষাই সম্ভবত কার্পাস-ফুলকে আশ্রয় করে রূপ পেয়েছে।

এটা নিঃসন্দেহ যে, এইসব গীতের মাধ্যমে সিদ্ধাচার্যগণ তাঁদের ধ্যানধারণা সাধনমার্গ ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর ও গূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন ; তাই, প্রত্যক্ষ অর্থ ছাড়াও এদের আরেকটা গোপন অপ্রত্যক্ষ দুর্জ্ঞেয় অর্থ

আছে। অবশ্য, তাঁদের ব্যবহার করা প্রতীক চিত্র-রূপক ইত্যাদি অনুধাবন করে প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করা অত্যন্ত দুরূহ। কিন্তু এদিকটা ছাড়া চর্যাগীতির একটা অনস্বীকার্য বাস্তব আবেদনও রয়েছে। বাস্তব জীবন থেকেই যে শুধু উপমা-রূপক, খণ্ড খণ্ড চিত্র গ্রহণ করা হয়েছে তা নয়, নির্বাণ লাভ করে যোগী যে গৃহ নির্মাণ করতে চান, সে গৃহের পরিকল্পনাও বাস্তবকে পরিত্যাগ করতে পারেনি। গীতিকারগণ অনুক্ষণ বাস্তবের সজীব স্পর্শ অনুভব করছেন। তাই থেকে নিঃসন্দেহে মনে হয়, তাঁদের কল্পনার উৎসও একান্ত বাস্তব। এই বাস্তব জীবনটাই কবিমনের ভাবনা-কল্পনার রসে রূপান্তরিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও আবেগের অন্তরালে সিদ্ধাচার্যগণ অন্য কোন অপ্রত্যক্ষ কথা বোঝাতে চেয়েছেন হয়তো, কিন্তু সেজন্য তাঁদের প্রত্যক্ষ জীবনকেই আশ্রয় করতে হয়েছে, সেই সত্যটা অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ, তাঁদের মনের আনাগোনা কোথায় তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এখানেই গোপন রয়েছে। আর বাস্তব জীবন থেকে উপমা-রূপক ও চিত্র গ্রহণ করা থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে, কাদের হয়ে তাঁরা কথা বলছেন, কাদের তাঁরা তাঁদের কথা বোঝাতে চাইছেন। সেই জন-সমষ্টি যে তৎকালীন সমাজের বৃহত্তর অংশ—বর্ণাশ্রমের অন্তর্গতনিম্ন বর্ণসমূহ এবং বর্ণাশ্রমের বাইরের অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য জনসমষ্টি—তা সহজেই অনুমান করা চলে। নইলে তাদের জীবনের সহিত সম্পর্কিত উপমাদি ও চিত্র আহরিত হতো না। তত্ত্বের দিক হতে চর্যাগীতিকারগণ একটা উচ্চমার্গে উঠে থাকলেও, এর ব্যবহারিক প্রয়োগ ফলটা তাঁরা কামনা করেছেন, সমাজের বৃহত্তর জনসমষ্টিকে অবলম্বন করেই। সেদিক থেকে তাঁদের ভাবনা-কল্পনা-মনন নিম্নগামী হয়েছে বলা চলে। চর্যার ভাষাগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলেও এই সিদ্ধান্তে পৌছতে হয়।

চর্যাগীতিতে প্রাচীনতম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নিদর্শন রয়েছে বলে পণ্ডিত সমাজ সিদ্ধান্ত করেছেন। সম্ভবত দৃঢ়বদ্ধ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অভিপ্রকাশের কাজ আরো আগে থেকেই আরম্ভ হয়ে থাকবে। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণরা বাংলার অধিবাসীদের এবং তাদের ভাষাকে অত্যন্ত অবজ্ঞা ও ঘৃণার চোখে দেখতেন। এবং আর্যীকরণের পরও অর্থাৎ বাংলা ব্রাহ্মণ্য সমাজসংস্থার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরও বাংলার অবজ্ঞিত ভাষার কোন সমাদর ছিল না। বাংলার নিজস্ব শিল্প-সংস্কৃতি-ভাষা

একান্তভাবেই পরাভূত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরাভূত হলেও তা নিঃশেষিত হয়নি। তাই বাঙ্গালী পাল রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের কালেই বাংলার রাষ্ট্রীয় সামাজিক জীবনে একটা সজীব স্পন্দন অনুভূত হতে দেখা যায়। কারণ, এই যুগেই বাংলা তার স্বতন্ত্র শিল্প-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভারতীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে আবির্ভূত হয়। এই নব-উন্মেষিত জাতীয় জীবনের সংগে সংগতি রেখে একটা জাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির বিবর্তন হবে তাও একান্ত স্বাভাবিক। কার্যত, এই যুগেই বাংলার নিজস্ব ভাষা ধীরে ধীরে সুসংহত রূপ নিতে আরম্ভ করে। এবং স্বল্প কালের মধ্যেই সৌরসেনী অপভ্রংশের সম-পর্যায়ে উন্নীত হয়। দেশজ ভাষার এই জাগরণের শুরু থেকে এটা উপলব্ধি করা যায়, বহিরাগত আর্যসংস্কৃতির শক্তি ও প্রভাব স্তিমিত হয়ে এসেছে; পরাজিত পরাভূত ভাষা, সংস্কৃতি ও সংস্কৃতি-আশ্রিত অধিবাসীদের উপর জোর করে চাপানো আর্যভাষা ও সংস্কৃতি তার অভীপ্সিত ফল লাভ করছে না। দেশজ জলবায়ুর আকর্ষণে ও স্থিরনিশ্চিত ইংগিতে বহিরাগত ভাষা সংস্কৃতি এদেশেরই জলবায়ুতে মিশে যেতে আরম্ভ করেছে; আর এই দেওয়া-নেওয়ার সংমিশ্রণ থেকে ভাষা-সংস্কৃতির যে রূপটা আবির্ভূত হলো সেটা নিশ্চিতরূপেই দেশজ, বহিরাগতের পরিধেয়ের বর্ণচ্ছটা এর কাঠামোকে অলঙ্কৃত করেছে মাত্র।

এই জাগরণকে সাধারণভাবে বাংলার বৃহত্তর গণ-জীবনেরই একটা অচেতন অভিব্যক্তি বলা যেতে পারে। লোকায়ত ধ্যানধারণা, জীবনবেদ ও ভাষা, দেশের সাধারণ মানুষের জীবন, যেন সমাজ বিধায়কদের নিকট স্বীকৃতি লাভ করার জন্য স্পর্ধা করে দাঁড়িয়েছে। বহিরাগত ভাষা-সংস্কৃতি বাংলা দেশের সুবিস্তৃত হয়ে থাকলেও বাঙ্গালী সম্ভবত কোন কালেই তাকে আত্মস্থ করতে পারেনি, অথবা করেনি। তাই এর আবেদনটা মুখ্যত রাষ্ট্রীয়-সামাজিক জীবনের বিধিবন্ধনের মধ্যেই সীমিত হয়েছে; কখনও কখনও হয়ত বা এ তার বুদ্ধিকে আঘাত করেছে, কিন্তু তার অন্তরে প্রবেশ করেনি। তাই তার কল্পনা ও মনন, ভাষা ও ভংগী বহিরাগত ভাষা ও মানস থেকে স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য সেই যুগেই আত্মপ্রকাশ করে। তাই পাল-চন্দ্র যুগের অবসানে বর্মণ-সেনারাষ্ট্রকে আশ্রয় করে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি পুনরায় জয়যুক্ত হলেও বাংলার লোক-জীবনের জাগরণকে রোধ করতে সমর্থ হয়নি। সেই জয়ের অন্তরালে অভ্যুদয় হয়ে চলছিল লোকায়ত জীবন-দর্শনের।

চর্যার ভাষা সম্পদ তাই একান্তই লৌকিক। সামাজিক উচ্চ বর্ণের ভাষা ও রাজসভাশ্রিত ভাষা একটা গোষ্ঠীবদ্ধ সীমায় বিচরণ করছিল, কিন্তু চর্যা বিশেষ কোন গোষ্ঠীর মধ্যে বিনিময়ের জন্য রচিত হয়নি। তার আবেদন বৃহত্তর সমাজ-মানুষের নিকট এবং তাই সেই বৃহত্তর সমাজ-মানুষের ভাষাই এখানে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। এই লৌকিক ভাষার সংগে আছে লোক-জীবনের স্বীকৃতি। তাই অধিকাংশ চর্যার পশ্চাতের চিত্ররূপ অত্যন্ত সজীব ও গতিশীল। চলতি জীবন প্রবাহ নিঃসন্দেহে নিজেকে সেখানে উপলব্ধি করেছে। চর্যার বহু উপমা-রূপক আজও আমাদের বাঙ্গালী জীবনে সত্য ও সজীব।

সুতরাং এও একান্তই স্বাভাবিক যে, চর্যাগীতিকারগণ সংস্কৃত কাব্যের রীতিতে পদ রচনা করেননি। তাঁদের সহজ সরল প্রচেষ্টা ও তার প্রকাশের ভংগী থেকে নতুন বাংলা ছন্দ ও সুর জন্মলাভ করে। যুগ-যুগান্তের সীমা পার হয়ে, এবং তার স্পর্শে রূপান্তরিত হয়ে, সেই ছন্দ ও সুর আজ পর্যন্তও বাংলার লোক-জীবনের সংগে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে আছে। এই যে কাব্যের ছন্দ ও গানের সুরের মাধ্যমে বাঙ্গালী লোক-জীবনের অভিব্যক্তি চর্যায় ধ্বনিত হয়েছে, সেটাই সে-যুগের বাঙ্গালী জীবনের প্রাণময় শক্তি ও তার বাঁচার আকৃতিকে অম্লানভাবে আমাদের নিকট ঘোষণা করছে। এই ঘোষণার জন্য সম্ভবত তাঁদের নতুন পদবিন্যাস ও ছন্দের প্রবর্তন করা অপরিহার্য ছিল। ভাবের কেতাবী-বন্ধন ভেঙে তাকে লোকায়িত করা, এবং লোকায়িত ভাবের অভিব্যক্তির প্রেরণা সে-যুগের মানস কেন্দ্রে বর্তমান ছিল হয়তো; তাই জয়দেবকে সংস্কৃত কাব্যের বিধিবদ্ধ রীতিনীতি ইত্যাদি পরিবর্জন করে সম্পূর্ণ অভিনব অপরূপ কাব্য সৃষ্টি করতে দেখি, এবং অলৌকিক বিষয়-বস্তু অবলম্বন করে সম্পূর্ণ লৌকিক মনোভাব প্রকাশ করতে দেখি। সংস্কৃতে রচিত হলেও 'গীতগোবিন্দে'র প্রকাশভংগী প্রকৃতপক্ষে দেশজ। জয়দেবের উপর বাংলার নিজস্ব শিল্প-সংস্কৃতি ও প্রকাশভংগী গোপনে প্রভাব বিস্তার করেছে, একথা কল্পনা করা কি অসম্ভব ও অবাস্তব?

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ব্রাহ্মণ্য সমাজ-সংস্কার অন্তর খুঁড়ে একটা নতুন শক্তি, একটা নতুন ভাষা, একটা নতুন মনোভাব, একটা নতুন জীবন-বোধ অভিব্যক্তি লাভের আশায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। এবং এই জীবন-বোধের

উৎস-কেন্দ্র সম্পূর্ণ লৌকিক। আর সে জন্তই ভাষা, ভাব এবং ভাবের চিত্ররূপও প্রত্যক্ষ বাস্তব লৌকিক জীবনকে অবলম্বন করে সংগঠিত হয়েছে।

তিন

চর্যাগীতির ভাব-সম্পদ আলোচনা করলে সর্বপ্রথম যা মনে রেখাপাত করে, সে হলো ভাবের অন্তরালে লুকানো অপরিসীম শূন্যতার বেদনা। পূর্বে বিভিন্ন চর্যায় ব্যবহৃত বাস্তব জীবনের খণ্ডখণ্ড চিত্রের পরিচয় দেওয়া হয়েছে; এই চিত্রগুলির মধ্য দিয়ে একটা সকরুণ বেদনার স্বর অনুরণিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই চিত্রগুলিকে যে অখণ্ড ভাবের কাঠামো রূপেই শুধু ব্যবহার করা হয়েছে তা নয়; এর সংগে মিশে রয়েছে গীতিকারের মনোগত দুঃখ ও নিরানন্দের চেতনা। এই দুঃখ ও নিরানন্দের চেতনা গীতিকারের মনে কিভাবে অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে, তা বিচার করে দেখা যেতে পারে; কাহ্নুপাদ তাঁর একটি চর্যায় বলছেন:

মন তরুপাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা।
আসা—বহল পাত ফলবাহা॥ (৪৫)

মন যেন একটি বর্ধিষ্ণু বৃক্ষ, পাঁচটি ইন্দ্রিয় তার শাখা, আশা অর্থাৎ বাসনা তার নানাবিধ বিচিত্র পাতা ও ফল। গীতিকার পরে বলছেন, এই বৃক্ষকে ছেদন করতে হবে যেন সে আর পল্লবিত না হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন, গীতিকার এই বৃক্ষকে ছেদন করার প্রয়োজন অনুভব করলেন কেন, কেনই বা তাঁর বাসনাকে বিনষ্ট করার প্রেরণা? কেনই বা তাঁর জীবনে শূন্যতার বেদনা? আর কেনই বা স্বয়ং বুদ্ধ "দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ এবং যে পথ গ্রহণ করলে দুঃখ বিনষ্ট হয়", সে পথের সন্ধানে যাত্রা করেছিলেন? কারণ, গীতিকারের ইন্দ্রিয়শাসিত মন সর্বদাই বাইরের দিকে অর্থাৎ দৃশ্যমান সংসার ও তার অন্তর্গত ভোগসামগ্রীর দিকে প্রসারিত হতে চাইছে। এই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই তাঁর বহিঃপৃথিবীর সংগে পরিচয়। এই পৃথিবী যা দিতে পারে, জীবন যা দিতে পারে, তাকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করার, ভোগের আনন্দে চঞ্চল হয়ে ওঠার, তাগিদ আসছে ঐ ইন্দ্রিয়ের কাছ থেকে। এর সহজ সরল অনাবিল অভিব্যক্তি,

এর প্রেরণা এবং প্রেরণার সার্থক সন্তুষ্টি, এই নিয়েই তার প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবন গঠিত। তাই ইন্দ্রিয়ের তাগিদ বাঁচারই তাগিদ, জীবনেরই তাগিদ। মন-বৃক্ষ যখন শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত ও ফলেফুলে মুকুলিত হয়ে উঠতে চায়, তখন সে জীবনকেই পরিপূর্ণভাবে জানতে চায়, উপলব্ধি করতে চায়, এবং তার সরল আস্বাদন লাভ করে নিজেকে এই বাস্তবের মধ্যেই, এই সংসারের মধ্যেই সৃষ্টি করতে চায়। কিন্তু তথাপি গীতিকারগণ এই বাঁচার তাগিদ, জীবনের তাগিদ নিয়ে এত সংকুচিত কেন, স্থূল জগতে বিচরণ-লিপ্সু মনকে নিয়ে তাঁদের এত সমস্যা কেন, এত চিন্তা কেন? এর একমাত্র সম্ভাব্য উত্তর, অসাম্যের আদর্শে গঠিত সমাজে জীবনকে সার্থকভাবে উপলব্ধি করার অবকাশ কোথায়? নিজেকে সৃষ্টি করার পথ কোথায়? যেখানে বিভিন্ন স্তর-উপস্তর বিভক্ত সমাজ পরস্পরের আচরণের সীমা অত্যন্ত সুকঠোরভাবে বিধিবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করে দিয়েছে, সেখানে মানুষের মানবিকতার মূল্য ও স্বীকৃতি কোথায়?

ইতিপূর্বে বর্ণ ও ধর্মগত একনায়কত্ববাদী রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থার আলোচনায় অধস্তন সামাজিক বর্ণের এবং বর্ণাশ্রমের বাইরের অন্ত্যজ অস্পৃশ্য পর্যায়ের লোকদের জীবনের পরিচয় দেওয়া হয়েছে, এবং এই হৃদয়হীন পরিবেশে তাদের পক্ষে জীবনকে বাইরের দিকে প্রসারিত ও সৃষ্টি করা যে সম্ভব নয়, তারও ইংগিত দেওয়া হয়েছে। এই সমাজ এবং সমাজ-ব্যবস্থা অমোঘ এবং অপ্রতিরোধ্য, এমনি একটা চেতনা সেই সমাজের অসহায় অবজ্ঞাত লোকদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করা অস্বাভাবিক নয়। কেন না, এই সমাজ কঠিনভাবে তাদের জীবনকে শাসন করতে পারে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার তরঙ্গকে দ্বিধাহীন চিত্তে রোধ করতে পারে, অম্লানভাবে তাদের জীবনকে চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে দিতে পারে। অসহায় মানুষ সমাজের এই অসীম দুর্দান্ত প্রতাপ ও শক্তিকে দেখেছে, আর দেখে ভয় পেয়েছে, কিন্তু তার রক্ত-চক্ষুকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিরোধ করার চেতনা তার বিকাশলাভ করেনি। এই শক্তির কাছে নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র, অত্যন্ত অক্ষম মনে হয়েছে। তাই এই অক্ষম দুর্বল মানুষ কি করে স্পর্ধা করে দাঁড়াবে সর্বগ্রাসী সামাজিক বিধানকে? এই পরাভব-চেতনা জীবনকে কোনমতেই বাইরে প্রসারিত করতে পারে না। সমাজকে, সহানুভূতিহীন সামাজিক পরিবেশকে, আঘাত করতে

না পেরে সে আঘাত করল নিজেকেই ; শক্তিমানের শক্তিকে খর্ব করতে না পেরে সে খর্ব করল নিজেরই শক্তিকে। সমাজকে শাসন করতে না পেরে সে শাসন করতে চাইল তার চিত্তকে। এই জরিষ্ণু সমাজ মানবিকতার কোন মূল্য দেয় না, সুখের আশাকে অংকুরিত হতে দেয় না, ভোগের আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত হতে দেয় না, জীবনকে সৃষ্টি করার প্রেরণাও এখানে অবরুদ্ধ ; বাস্তব জীবনের এই অভিজ্ঞতাকেই চর্যাগীতিকারগণ সঞ্চারিত করলেন তাঁদের মনোগত ভাব-মণ্ডলে। আর বাস্তব জীবনের শূন্যতার রস পান করেই তাঁদের ভাবাকাশ অস্বীকার করতে চাইল বাস্তব পৃথিবীকে, ইন্দ্রিয়ের তথা জীবনের প্রেরণাকে ; সৃষ্টির পরিবর্তে চাইল ত্যাগ, নিবৃত্তি ; বাঁচার সহজ অভিব্যক্তিকেই তাঁদের মনে হলো ভ্রান্ত মিথ্যা। বুদ্ধ প্রদর্শিত পথে তাঁরা সৃষ্টি করলেন এক নতুন জীবনাদর্শ। তাঁদের এই ভাবমণ্ডল প্রত্যক্ষ সামাজিক সম্পর্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবনের প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই নয়। লুইপাদের "এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণকপাটের আস" (ইন্দ্রিয়ের পারিপাট্যের আশা ত্যাগ কর) লাইনটিতে এর নিঃসন্দেহ ইঙ্গিত রয়েছে।

জীবনে ইন্দ্রিয়ের পারিপাট্যের আশা চরিতার্থ হবে না, এই চেতনা থেকেই সিদ্ধাচার্যগণ মন-বৃক্ষ ছেদন করতে অগ্রসর হলেন।

চাটিলপাদ বলেছেন :

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল, মাঝে ন থাহী॥

ফাড়িঅ মোহতরু পাটী জোড়িঅ। ইত্যাদি

(গহিন ভবনদী বেগে বয়ে চলেছে ; দুদিকে কাদা, মাঝখানে থৈ পাওয়া যাচ্ছে না ; মোহতরু বিদীর্ণ করে সেতু নির্মাণ করে এই নদী পার হও।)

ভুসুকুপাদ একটি গানে বলেছেন :

মারের জোইআ মূসা-পবণা।
জেণ তুটঅ অবণা-গবণা॥
ভব বিন্দারঅ মূসা খণঅ গাতি।
চঞ্চল-মূসা কলিআঁ নাশক থাতি॥ ইত্যাদি

(অর্থাৎ মূষিকরূপ চঞ্চলচিত্তকে নাশ কর, যেন তার বিচরণবৃত্তি লোপ পায়। এই ভবস্বরূপ চিত্ত তার স্বভাব বিনষ্ট করতে পারে না বলেই দুর্গতি ভোগ করে অতএব তার দোষ বুঝে তাকে নাশ কর)

আর্যপাদ তাঁর চর্যায় বলেছেন :

চান্দরে চান্দকান্তি জিম পতিভাসঅ
চিঅ বিকরণে ত হিঁ টলি পইসই ॥
ছাড়িঅ ভয় ঘিণ লোআচার।
চাহন্তে চাহন্তে সুণ, বিআর ॥

(অর্থাৎ, চাঁদের অন্তর্ধানের সংগে যেমন জ্যোৎস্না দূরে যায়, তেমনি চিত্তের বিনাশের সংগেও তার বিকল্পাদি নষ্ট হয়। ভয় ঘৃণা লোকাচার ছেড়ে চেয়ে দেখেছি যে, পৃথিবী সব শূন্যময়।)

সরহপাদ তাঁর একটি গানে বলছেন :

চীঅ থির করি ধরহু নাহী।
অন উপায়ে পারণ জাই ॥

* * *

ভব-উলোলে সব বি বোলিআ। ইত্যাদি

(চিত্ত স্থির ক'রে নৌকো ধরো। অন্য উপায়ে পারে যাওয়া যাবে না। ····· বিষয়-স্পর্শে সব নষ্ট হয়ে যায়।)

(অন্যান্য গীতিকারগণও অনুরূপ ভাষায় ইন্দ্রিয়কে, চিত্তকে বিনষ্ট করার কথা ঘোষণা করেছেন। কারণ, যে-আশা চরিতার্থ করার উপায় নেই তাকে প্রশ্রয় দিয়ে লাভ কি ? যার স্বাভাবিক প্রকাশের গতিপথ নানা বাধায় বিঘ্নিত, এবং তার প্রবাহের পথও যখন অবরুদ্ধ, তখন তাকে উদ্দীপ্ত রাখার সার্থকতা কোথায় ? মানুষের না পাওয়ার বেদনা অপরিসীম ; চেয়ে না পাওয়ার বেদনায় সংকুচিত হওয়ার চেয়ে না-চাওয়ার বৈরাগ্যকেই অনেক সময় শ্রেয় বলে মনে হয়। অন্তত সেক্ষেত্রে বিমুখ হওয়ার দুঃখ থাকে না। তাই চর্যাগীতিকারগণ তাঁদের চাওয়ার প্রেরণাকে বিনষ্ট করতে উদ্যোগী হলেন।) ভবিষ্যতে পাননি বা পাচ্ছেন না বলে তাঁদের আক্ষেপ করার কিছু থাকবে না ; কারণ, তাঁদের চাওয়ার প্রেরণাই আর নেই। তখন বাস্তব পৃথিবীর অন্যায় বিধানকেও মার্জনা করা চলবে।

চাওয়ার এই প্রেরণাকে জোর ক'রে নাশ করা অত্যন্ত দুঃখকর ; মানুষের চাওয়ার, কিছু হওয়ার, নিজেকে সৃষ্টি করার, চেতনাকে বাদ দিলে প্রকৃতপক্ষে তার জীবনকেই যে অস্বীকার করতে হয়। কিন্তু জীবনকে অস্বীকার করা কি সহজ, না, মানুষ তা পারে কখনও? সিদ্ধাচার্যগণও জীবনের মূল প্রেরণাকে অস্বীকার করতে পারেননি। তাঁরা ইন্দ্রিয়কে বিলোপ করতে চেয়েছেন, ইন্দ্রিয়ের মূলাধার চিত্তকে বিনষ্ট করতে চেয়েছেন, কিন্তু সুখের যে-চেতনা, আনন্দের যে-চেতনা মানুষের জীবনে সদাজাগ্রত থাকে, তাকে বিনষ্ট করতে চাননি। সুখ, আনন্দ সবই তাঁদের কাম্য ; শুধু আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পৃথিবীতে তার আস্বাদন সম্ভব হচ্ছে না বলেই তাঁরা অন্যত্র সুখ ও আনন্দের অনুসন্ধান করছেন। তাই তাঁদের অস্বীকার না-চাওয়া নয় ; সেটাও চাওয়া এবং পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। এই পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে তাঁরা মনে যে ভাব-চিত্র আঁকছেন, সেখানে পাওয়ার আকৃতি পূর্ণতা লাভ করে। এই চলতি সংসারের অসংখ্য খণ্ডতা, দৈন্য ও খর্বতার কলুষ সেই পূর্ণতাকে স্পর্শ করে না। সেটা অখণ্ড সুখ ও আনন্দের লীলাক্ষেত্র। কাহ্নুপাদ তাঁর একটি গানে বলছেন :

এবংকার দিঢ় বাখোড় মোড়িউ।
বিবিহ বিআপক বান্ধণ তোড়িউ॥
কাহ্ন বিলসঅ আসবমাতা।
সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা॥
জিম জিম করিণা করিণিরে রিসঅ।
তিম তিম তথতা মঅগল বরিসঅ॥ ইত্যাদি

(অর্থাৎ, একটি মদমত্ত হস্তীর ন্যায় কাহ্নুপাদ সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করেছেন এবং মহানন্দে সহজ-নলিনীবনে বিহার করছেন। হস্তিনীর সঙ্গ লাভ করে হস্তী যেমন আসক্তি-মদ বর্ষণ করে, তেমনি কাহ্নুপাদও [নৈরাত্মা-দেবীর সঙ্গ লাভ ক'রে] তথতা বা নির্বাণ মদ বর্ষণ করছেন।)

সুখরস-সিক্তি এই চিত্রটি অপরূপ। কিন্তু শুধু বন্ধন ছিঁড়ে অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করতেই যে সুখ ও আনন্দ তা নয়, ছেঁড়াতেও অনুরূপ আনন্দ সুখ ; এখানেও পরম কল্যাণ। ভদ্রপাদ তাঁর চর্যায় বলেছেন :

পেখমি দহদিহ সব্বই শূন।
চিঅ বিহূনে পাপ ন পুন্ন॥

....

চিঅরাঅ মই অহার কএলা॥

(সবই এখন আমি শূন্যকার দেখছি; চিত্তের অভাবে আমার পাপ-পুণ্যের সংস্কার তিরোহিত হয়েছে।........চিত্তরাজ আহার করে আমি পরমার্থ লাভ করেছি)।

কাহ্নুপাদ আর একটি গানে বলছেন:

চিঅ সহজে শূণ সংপুন্না।
কান্ধবিয়োএঁ মা হোহি বিসন্না॥

(আমার চিত্ত সহজ শূন্যতায় পূর্ণ হয়েছে; আমার মৃত্যু হলে বিষণ্ণ হয়ো না। অর্থাৎ চিত্ত সহজ শূন্যতায় পূর্ণ হলে আর মৃত্যু-ভয় থাকে না।)

অখণ্ড সুখ ও আনন্দলাভের চেতনা চর্যাগীতিকার মূলে। না-চাওয়া এবং না-পাওয়া নয়, পরিপূর্ণ পাওয়া। এই পাওয়ার পরিবেশকে, নির্বাণ-লাভের ক্রিয়াকে তাঁরা শবরশবরীর মিলনের সুখকর অনুভূতি ও চিত্র রূপে কল্পনা করেছেন। এই সুখানুভূতিতে অবগাহনের জন্যে তাঁরা ব্যাকুল। বাস্তব পৃথিবীর আস্বাদনলিপ্সু তাঁদের মন পৃথিবীর মধ্যে তার চরিতার্থতা খুঁজে পায় নি; পৃথিবীর অর্থাৎ সমাজ সংগঠনের সংগে সংগ্রাম করতে না পেরে তাঁরা তাঁদের মনকে সরিয়ে আনলেন পৃথিবীর কোল থেকে, এবং স্থাপন করলেন এক আদর্শ ভাব-জগতে, যেখানে সর্ব-শূন্যতা বিলুপ্ত হয়ে বিরাজ করছে অনাবিল নির্মল আনন্দ। সংসারের সমস্ত তুচ্ছতা খর্বতা ও কলুষকে পরিশুদ্ধ করে তাঁরা সৃষ্টি করলেন এক আদর্শ মনোজগৎ। কিন্তু, এই আদর্শ জগতে প্রবেশ লাভের আকাঙ্ক্ষার উৎসও তাঁদের ইন্দ্রিয়ের ভোগ-আস্বাদন লিপ্সা। তা অস্বীকার করার যো নেই।

তা'হলে অবস্থাটা দাঁড়াচ্ছে এইরূপ: আমাদের চোখের সামনে প্রকাশিত জগৎ-সংসার অসম্পূর্ণতা ও অভাবের রাজত্ব; আর নির্বাণের যে জগৎ তা সম্পূর্ণতা ও অখণ্ড আনন্দের জগৎ। মনকে সর্ববিধ মোহ থেকে মুক্ত করে যৌগিক সাধনার পথে ঐ আনন্দ জগতে পৌছাতে হয়। প্রথমটা ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার, এবং দ্বিতীয়টা ভাবের পরিমণ্ডল। সিদ্ধাচার্যগণ এই

দ্বিতীয় পরিমণ্ডলের রঙরসগন্ধ দিয়ে প্রথমটার নিরানন্দ থেকে মুক্তি লাভ করতে চেয়েছেন। তা'হলে বলা যায়, বাস্তব সংসার সম্পর্কে তাঁদের যে শূন্যতার চেতনা এবং পূর্ণতার আস্বাদ লাভের জন্য তাঁদের যে আকূতি, তা জরিষ্ণু অসহানুভূতিশীল সমাজ সংগঠনের বন্ধন থেকে, "দুঃখ" থেকে মুক্তি লাভেরই আকূতি। সিদ্ধাচার্যগণ "দুঃখকে" মেনে নিতে পারছেন না, তাঁদের সমকালীন সমাজকে মেনে নিতে পারছেন না, বেদনায় তাঁদের মন ভরে উঠেছে, এবং এর থেকে ভাল, এর থেকে উন্নততর ও সৃষ্টিশীল সমাজের জন্য, সুখের জন্য, সর্ব-শূন্য অবস্থার পরিপূর্ণ জ্ঞান, আনন্দ, করুণা, পবিত্রতা ও আলোকের জন্য, তাঁদের মন কেঁদে উঠেছে। আর সম্ভবত তাঁদের এই আকূতির মধ্য দিয়ে সে যুগের সমস্ত মানুষের মুক্তি-পিপাসা মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই মুক্তি-পিপাসাই তাঁদের ভাবপরিমণ্ডলের সৃষ্টি-কর্তা।

ভাব-মণ্ডলেও গীতিকারগণ যেমন ইন্দ্রিয়ের আস্বাদন-লিপ্সা বা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিতে পারেননি (এই লিপ্সা ভাবের রসে পরিশুদ্ধ হয়েছে মাত্র), তেমনি নির্বাণ কোথায় এবং কি ভাবে লাভ করা যায়, তার আলোচনা ও সন্ধানেও তাঁরা এই স্থূল পৃথিবীকে অস্বীকার করতে পারেননি। বরং, এই পৃথিবীতেই তাঁরা নির্বাণের আনন্দ উপলব্ধি করতে চান। উদাহরণ-স্বরূপ, কাহ্নপাদ বলছেন, "ভব জাই ণ আবই এথু কোই" (এই পৃথিবী থেকে কিছু চলে যায় না, আবার আসেও না কিছু); অথবা চাটিলপাদের "নিয়ড়ি বোহি দূর না জাহি" (নিকটেই বোধি রয়েছে, সেজন্য দূরে যেতে হয় না)। সরহপাদ এই কথাটিকেই সুন্দর ভাবে প্রকাশ করে বলেছেন :

নিঅড়ি বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক॥
হাতের কাঙ্কণ মা লেউ দাপণ।
অপণে অপা বুঝত নিঅমণ॥ ইত্যাদি

(বোধি নিকটেই আছে, সে জন্য লঙ্কা যেওনা। হাতের কঙ্কণ দেখতে দর্পণের প্রয়োজন হয় না, নিজ মনে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি কর।)

সংসারই নির্বাণ। সংসার বললেও যেন পরিবেশটা অপ্রয়োজনীয় রূপে বড় দেখায়; কারণ, নির্বাণের আধার এই সংসারেরই অতি ক্ষুদ্র একটি বস্তু। সে হলো সিদ্ধাচার্যদের দেহ। বুদ্ধদেব সংসারের অনিত্যতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে দুঃখের মূল উৎপাটন করেছিলেন, এবং এই সংসারের মধ্যে

নির্বাণ লাভ করেছিলেন। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণও চিত্ত জয় করে এই সংসারেই নির্বাণ লাভ করতে চান। সুতরাং দেহই নির্বাণ, দেহ-সাধন করলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। সরহপাদ তাঁর দোহায় (১২) বলেছেন :

এথু সে সুরসরি জমুণা এথু সে গংগা—সাঅরু।
এথু পআগ বণারসি এথু সে চন্দ দিবাঅরু॥
খেত্তু পীঠ উপপীঠ এথু মই ভমই পরিট্ঠিত্তি।
দেহ-সরিসঅ তিথ মই সুহ অণ্ণ ন দীট্‌ঠত্তি॥

[এখানেই (এই দেহে) সুরেশ্বরী (গংগা) ও যমুনা, এখানেই গংগাসাগর তীর্থ; এখানেই প্রয়াগ-বারাণসী, এখানেই চন্দ্র দিবাকর। এখানেই ক্ষেত্র, পীঠ, উপপীঠ; এখানেই আমি ভ্রমণ করি। দেহের মত তীর্থ এবং এখানকার মত সুখ আমি আর কোথাও দেখিনি।]

আরও একটি দোহায় বলা হয়েছে :

অসরির কোই সরীরই লুক্কো।
জো তহি জাণই সো তহি মুক্কো॥

(এই শরীরের মধ্যেই কোন অশরীরী লুকিয়ে আছেন ; যে তাকে জানতে পারে সেই মুক্ত হয়।)

চর্যাগীতিকারগণও এই দেহের মধ্যে এই অশরীরীকে, নির্বাণকে লাভ করার কথা বলেছেন। অধিকাংশ চর্যায় দেহকে নৌকার সংগে তুলনা করা হয়েছে, এবং এই দেহ-নৌকাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে ভবনদী পার হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন সরহপাদের চর্যা :

কাঅ ণাবড়ি খান্টি মণ কেড়ুআল।
সদ্‌গুরু—বঅণে ধর পতবাল॥
চীঅ থির করি ধরহুরে নাই।
আন উপায়ে পার ণ জাই॥ ইত্যাদি

(এই ভব-সমুদ্রে কায়া হচ্ছে নৌকা, খাঁটি মন কেড়ুআল অথবা বৈঠা, সদ্‌গুরুর বচনে হাল ধরতে হবে। চিত্ত স্থির করে নৌকা ধর, অন্য উপায়ে পারে যাওয়া যাবে না।)

অথবা কাহ্নুপাদের একটি গান :

---

১২ প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত 'দোহাকোষ' দ্রষ্টব্য

তিশরণ পাবী কিঅ অঠক মারী।
নিঅ দেহ করুণা শূণমে হেরি॥
তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইনা।
মাঝ বেণী তরঙ্গম মুনিআ॥
পঞ্চতথাগত কিঅ কেড়ুআল।
বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল॥ ইত্যাদি

[ত্রিশরণ দেহকে নৌকা করে এবং অষ্টসিদ্ধিকে মেরে দেহ-নৌকাকে শূন্যে করুণার অদ্বয় অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। সব কিছুকে মায়া-স্বপ্ন মনে করে এবং মধ্য বেণীতে (আনন্দানুভূতির) তরঙ্গে স্নান করে ভব-জলধি অতিক্রম করেছি। পঞ্চ তথাগতকে বৈঠা করে এবং কায়-নৌকায় মায়াজাল বাইতে বাইতে এসেছি।]

এই দেহ-নৌকা বয়ে চরম লক্ষ্যে উপনীত হয়ে, সিদ্ধাচার্যগণ যে আনন্দ ও অভিজ্ঞতা আস্বাদনের কল্পনা করছেন, তা-ও ইন্দ্রিয়-সুখকর চিত্র ও ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে; এবং সেই আনন্দকেও ইন্দ্রিয় সম্ভোগের আনন্দ রূপেই কল্পনা করা হয়েছে। সিদ্ধাচার্যগণ শূন্যতার মার্গে উপনীত হয়ে শূন্যতার সহচারিণী নৈরাত্মাদেবীকে আলিঙ্গন করে মহাসুখে কালাতিপাত করবেন, অনেকগুলো চর্যায় এই ভাবের চিত্ররূপ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, কাহ্নুপাদের একটি গানে বলা হয়েছে:

ভবনির্বাণে পড়হ মাদলা।
মন পবণ বেণি করণ্ডকশালা॥
জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ।
কাহ্ন ডোম্বী-বিবাহে চলিআ॥
ডোম্বী বিবাহিয়া অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম॥
অহনিসি সুরঅ—পসঙ্গে জাঅ।
জোইনিজালে রঅণি পোহাঅ॥
ডোম্বীএর সঙ্গে জো জোই রত্তো।
খনহ ন ছাড়অ সহজ-উন্মত্তো॥

(ভবনির্বাণকে পটহ-মাদল করে, মন-পবনকে করণ্ডকশালা করে, এবং দুন্দুভি শব্দে জয়ধ্বনি করে, কাহ্ন ডোম্বী বিবাহ করতে চলেছে। ডোম্বীকে বিবাহ করে জন্ম নাশ হয়েছে, যৌতুকরূপে অনুত্তর অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ধাম লাভ হয়েছে। সুখ-সাহচর্যে দিবারাত্রি কাটছে, আর জ্ঞানযোগিনীর আলোকে রজনী পোহায়। ডোম্বীর প্রতি যোগী অনুরক্ত হয়েছে ; সহজানন্দে পাগল হয়ে তার সঙ্গ ক্ষণকালের জন্যও ত্যাগ করে না।) অথবা, শবরপাদের একটি গানের কয়েকটি লাইন :

তিঅ ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী প্রেম্ম রাতি পোহাইলী॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপর খাই।
সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাসুখে রাতি পোহাই॥ ইত্যাদি

[শবর ত্রি-ধাতুতে খাট পাড়ল ; এবং মহাসুখে শয্যা বিছাল ; আর ভুজংগ (অর্থাৎ নায়ক বা নাগর) শবর দারী (নায়িকা বা নাগরী) নৈরাত্মা দেবীকে নিয়ে প্রেমে রাত্রি পোহায়। হৃদয় তাম্বুলে কর্পূর দিয়ে সে মহাসুখে খায় ; আর নৈরাত্মা দেবীকে কণ্ঠে নিয়ে মহাসুখে রাত্রি পোহায়।]

আরও অনেকগুলো চর্যায় এই যৌন-সম্ভোগের প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, এই সব চিত্র অত্যন্ত সজীব, এবং মনোহারিত্বে অপরূপ। যৌন সম্ভোগের চিত্র এবং যৌন প্রতীক ব্যবহার করেই প্রাচীন ও মধ্যযুগের লোকায়ত ধর্মমত ও পথের ব্যাখ্যা করা হতো। গম্ভীর আধ্যাত্মিক আনন্দানুভূতিকে ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের চিত্র এঁকে প্রকাশ করার প্রবণতা থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যায়, ইন্দ্রিয়ের বাস্তবতা এবং ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু ও পৃথিবীর সত্যতা সম্পর্কে সিদ্ধাচার্যদের চেতনা কত প্রবল এবং গভীর। অনুক্ষণ তাঁরা ইন্দ্রিয় ও বস্তু-পৃথিবীর আকর্ষণ বোধ করেছেন, তাই তাঁদের ভাবজগতেও তা অনায়াসেই প্রতিফলিত হয়েছে। এই জগৎ-সংসারের সংগে তাঁদের সম্পর্ক এতই ব্যাপক ও ঘনিষ্ঠ যে তাদের পক্ষে একে অস্বীকার করা কোনক্রমেই সম্ভব হয়নি।

এইখানেই তাঁদের বৈশিষ্ট্য। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সাধনার লক্ষ্য হলো, পরম ব্রহ্মের সহিত মিলন। এই মিলন বিরাট এক আত্মার সাথে তারই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের পুনঃ সংযোগ, আর তা এক অতীন্দ্রিয়

জগতেই সম্ভব। এখানে সবই পরমার্থ, তাই পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সাধনা মুখ্যত এই বাস্তব পৃথিবীর দিকে তাকায়নি, তাকিয়েছে এর বাইরে কোন এক অলৌকিক জগতের প্রতি। কিন্তু বৌদ্ধ তান্ত্রিক (শৈব তান্ত্রিকদেরও) ও সহজিয়াদের সাধনার স্বরূপ স্বতন্ত্র ও ভিন্ন। তাঁরা প্রত্যক্ষ, বাস্তব কোন সত্যকে অবলম্বন করতে চেয়েছেন, তাই তাদের দৃষ্টি প্রধানত এই পৃথিবীর উপর, দেহের উপর, নিবদ্ধ। অবশ্য তাঁদের দেহ সাধনা নিম্নতম সোপান থেকে ঊর্ধ্ব পথে যেতে যেতে অতি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, তথাপি তা কখনও দেহাতীত নয়। এদিক থেকে তাঁদের আদর্শ ও সাধনা বাস্তবকে কেন্দ্র ক'রেই গঠিত। তাই বৌদ্ধ তান্ত্রিক ও সহজিয়াদের ভাবাকাশ পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সাধনার ভাবাকাশ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; হলায়ুধ মিশ্রের যাগ-যজ্ঞ-হোমাগ্নি দীপ্ত গৃহের মন্ত্র গুঞ্জরণের সংগে তাঁদের সাধনার স্বরূপ মিলবে না। তাঁদের ধর্মমত ও পথ, ধ্যান ধারণা আচার-সর্বস্ব সাধনার বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ স্বরূপ। এই সব একান্ত বাহ্য অনুষ্ঠান ও আড়ম্বরের প্রয়োজন তাঁদের নেই, কেন না, তাঁরা দেহের মত বাস্তব ও সত্য বস্তুকে আশ্রয় করেছেন। তাঁদের আশ্রয়কে সত্য করে তোলার জন্য কোন বাহ্য আয়োজনের প্রয়োজন হয় না। বৌদ্ধ সহজসিদ্ধাগণ বজ্রযানের মন্ত্র, মণ্ডল প্রভৃতিকেও অস্বীকার করেন। বিভিন্ন চর্যায় তার স্বাক্ষর রয়েছে। লুইপাদ বলছেন:

সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখ-দুখেতেঁ নিচিত মরিঅই ॥

(সকল প্রকার সমাধি কেনই বা করছ; সুখে দুঃখে তাতে নিশ্চিত মরবে।)

দারিকপাদ বলেছেন:

কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তো রে ঝানবখানে।
অপইঠানমহাসুহলীলেঁ দুলক্‌খ পরমনিবাণে ॥
দুঃখেঁ সুখেঁ একু করিআ ভুঞ্জই ইন্দীজানী।
স্বপরাপর ন চেবই দারিক সঅলানুত্তর মানী ॥

(কি হবে মন্ত্রে, কি হবে তন্ত্রে, কি হবে ধ্যান ব্যাখ্যানে? মহাসুখে প্রতিষ্ঠিত না হলে পরম নির্বাণ লাভ হয় না। সুখদুঃখ সমান জ্ঞান করে ইন্দ্রিয়াদি ভোগ কর। সব অনুত্তর মেনে দারিক আত্মপরভেদরহিত হয়েছেন।)

সিদ্ধাচার্যগণ এই কথাই তাঁদের দোহায় (১৩) আরও সুস্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন। যথাঃ

জো জস্থ জেণ হোই সংতুট্ঠো।
মোক্‌খ কি লব্ভ ঝাণ্ণ পবিট্ঠো॥
কিন্তহ্ দাবেঁ কিন্তহ্ ণিবেজ্জঁ।
কিন্তহ্ কিজ্জই মন্তহ সেব্ব॥
কিন্তহ্ তিথ তপোবন জাই।
মোক্‌খ কি লব্ভই পাণী হ্ণাই।
ছড্ডহু রে আলীকা বন্ধা।
সো মুঞ্চউ জো আচ্ছহু ধন্ধা॥

[যে যাতে যেরূপ সন্তুষ্ট (সেই তার পথ)। ধ্যানে প্রবেশ করলেই কি মোক্ষলাভ হয়? কি হবে নৈবেদ্যে? মন্ত্রের সেবায়ই বা কি হবে? তীর্থে বা তপোবনে গেলেও বা কি হবে? জলে স্নান করলে কি মোক্ষলাভ হয়? ওরে, মিথ্যা বন্ধন ছাড়। যে ধাঁধায় আছে সে মুক্ত হোক।] যারা বাহ্য ধর্ম-কর্ম, আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁদের প্রতি সিদ্ধাচার্যদের অবজ্ঞার অবধি ছিল না। "দোহাকোষে" তার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত। সরহপাদের দোহায় আছে, যদি নগ্নদেহ হলেই মুক্তিলাভ করা যায়, তাহলে কুকুর আর শৃগালও তো মুক্তি লাভ করতে পারে......যদি ময়ূরের পালক ধারণ করলে মুক্ত হওয়া যায়, তো ময়ূর এবং হরিণের মোক্ষলাভ হওয়া উচিত; যদি তৃণ ভক্ষণেই মোক্ষলাভ, তবে হাতী বা ঘোড়া মোক্ষ লাভ করবে না কেন?

তাঁরা আরো বলেছেন:

একুণ কিজ্জই মন্ত ণ তন্ত।
নিঅ-ঘরিণি লই কেলি করন্ত॥
নিঅ-ঘরে ঘরিণি জাব ণ মজ্জই।
তাব কি পঞ্চবন্ন বিহরিজ্জই॥
এসো জপ হোমে মন্ডল-কম্মে।
অনুদিণ অচ্ছসি বাহিউ ধম্মে॥

১৩ প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত 'দোহাকোষ' দ্রষ্টব্য

তো বিণু তরুণি নিরস্তর ণেহেঁ।
বোহি কি লব্ভই এণ বি দেহেঁ॥

[(সাধক) তন্ত্র মন্ত্র কিছুই করে না; নিজ গৃহিণীকে নিয়ে খেলা করে কেবল। নিজগৃহে যতক্ষণ না মগ্ন হয়, ততক্ষণ কি ভাবে পঞ্চবর্ণ নিয়ে বিহার করবে? এই সব জপ-হোম-মঙ্গল কর্ম ইত্যাদি বাহ্য ধর্মে লিপ্ত রয়েছ। হে তরুণি, তোমার নিরন্তর স্নেহ বিনা কি এ দেহে বোধি লাভ হয়?]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধ সহজিয়া সিদ্ধাচার্যদের বেদ-বাহ্য আচার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, তাঁরা মনে করতেন, "বেদেরই প্রামাণ্য নেই। হোম করলে মুক্তি যত হোক না হোক্, ধোঁয়ায় চক্ষের পীড়া হয় এই মাত্র।" (১৪) তিনি আরো লিখেছেন যে, তাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বও স্বীকার করতেন না। (১৫) এদিক থেকে তাঁদের আচরণ ও ভাবাকাশ হলায়ুধ মিশ্রের ভাবাকাশের সম্পূর্ণ বিপরীত। হলায়ুধের ধর্মীয় সামাজিক আচরণ বেদ-সম্মত, আর তাঁদের আচরণ একান্তই বেদ-বাহ্য, লোকায়ত। হলায়ুধের ধর্ম—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম—তখন রাষ্ট্রের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে একনায়কত্বের আসনে অধিষ্ঠিত; তা সামাজিক উচ্চবর্ণের ধর্ম, তার সংস্কার সংস্কৃতি সামাজিক উচ্চবর্ণের সংস্কার সংস্কৃতি। আর পূর্ব-আলোচনায় নিরূপিত হয়েছে যে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ প্রায় সকলেই বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত নিম্ন বর্ণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বর্ণাশ্রমের বাইরের অন্ত্যজ অস্পৃশ্য সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন (বৌদ্ধ বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করার পূর্বে)। রাষ্ট্র-স্বীকৃত সামাজিক উচ্চবর্ণের ধর্ম ও সংস্কারের পাশাপাশি যখন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ তাঁদের ধর্ম ও সংস্কার প্রচার করছিলেন, তখন তা নিঃসন্দেহে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কারের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি রূপেই প্রতিভাত হয়েছে, অবশ্য তা হীনশক্তি একথা অনস্বীকার্য। এই ভাব-দ্বন্দ্বে সমাজের উচ্চ ও নিম্ন বর্ণসমূহের, শাসকগোষ্ঠী বা বর্ণ এবং লোকায়ত আদর্শের, যে প্রতিনিধিত্ব রয়েছে,

---

১৪ বৌদ্ধ গান ও দোহা, ভূমিকা; মূল গ্রন্থে আছে, "অক্খি উহাবিঅ কড্ডু এ ধুমেমিত্তি।"

১৫ মূল গ্রন্থে আছে, 'তদা চ বস্তু ন বস্তু। কথমীশ্বর ইষ্যতে সিদ্ধত্বাচ্চ।'

তা কল্পনা করা চলে। বিশেষ করে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একনায়কত্বের যুগেও সমাজের অবজ্ঞাত উপেক্ষিত স্তরগুলো কোন-না-কোন ভাবে বৌদ্ধ প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত ছিলই। সিদ্ধাচার্যগণ তাঁদের এই বিষয়গত ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন কিনা বলা কঠিন, তবে তাঁদের ভাব-কল্পনার মাধ্যমে যে সামাজিক অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রতিফলিত হয়েছে, তাও অস্বীকার করার উপায় নেই। সম্ভবত, তাঁদের অজ্ঞাতে বাংলার বৃহত্তর গণ-মানসের সমদর্শনের আদর্শ বিকাশলাভ করেছিল, অথবা জনসমষ্টির বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আদর্শের ধারা সম্ভবত তাঁরা আপ্রাণ রক্ষা করার চেষ্টা করছিলেন। তার ইংগিত চর্যাগীতিতেও রয়েছে। ইতিপূর্বে দারিকপাদের একটি উদ্ধৃতিতে আত্মপরভেদ-শূন্যতার চেতনার স্বীকৃতি দেখা গিয়েছে; সরহপাদও তাঁর একটি গানে আক্ষেপ করে বলেছেন, "অদভুঅ ভবমোহরে দিসই পর অপ্পণা" (ভবের মোহ বড়ই অদ্ভুত, ইহা আত্মপর-ভেদজ্ঞান সৃষ্টি করে)। গীতিকার যে এজন্য অসন্তুষ্ট তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এই নেতি-ধর্মী উক্তির পথে না গিয়ে ভুসুকুপাদ খুব সহজ সরল ভাবেই বললেন:

> জিম জলে পাণিআ টলিআ ভেড় ন জাঅ।
> তিম মণ-রঅণা সমরসে গঅণ সমাঅ॥
> জাসু নাহি অপ্পা তাসু পরেলা কাহি।
> আই-অণুঅণা রে জাম-মরণ ভাব নাহি॥

(জলে জল মিশে গেলে যেমন কোন বিভেদ দেখা যায় না, তেমনি মন শূন্যতায় মিশে একীভূত হয়ে গেলে কোন ভেদ-জ্ঞান থাকে না। তখন অহংই যখন নেই, পরই বা কাকে বলব। আর উৎপত্তিবিহীন পৃথিবীতে কখনও জন্ম মৃত্যু নেই।)

দেখা যাচ্ছে, বাহ্য আচার অনুষ্ঠান ও জীবন দর্শনের সমালোচনার ভিতর দিয়ে গীতিকার অভেদ-চেতনায়, সমতার আদর্শে, উদ্বুদ্ধ হতে চান; তাই তাঁর লক্ষ্য। বৌদ্ধ দোহায়ও আছে, "পর অপ্পাণ ম ভন্তি করু সঅল নিরন্তর বুদ্ধ" (আপন পর ভেদ বিচার করো না, সকলই নিরন্তর বুদ্ধ)। এই সমদৃষ্টি ব্রাহ্মণ্য চিন্তাধারায়ও বর্তমান; কিন্তু বিশুদ্ধ তত্ত্বের দিক থেকে তার স্বীকৃতি থাকলেও ব্রাহ্মণ্য সমাজ যে ভাবে সংগঠিত হয়েছে, তাতে বাস্তব ক্ষেত্রে এই সমদৃষ্টির পরিচয় নেই, তা তৎকালীন

সমাজ পরিবেশের আলোচনায় দেখা গিয়েছে। বরং সেখানে যেন অসম-চেতনাই বর্তমান ছিল। তাই অসাম্যের ভিত্তিতে গঠিত সমাজের মধ্যে থেকে, এবং সমাজ বিধায়কদের নিকট থেকে নানা অবিচার ভোগ করে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ সম্ভবত সমতার আদর্শকে পুনরায় সরবে ঘোষণা করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। হয়তো তাঁরা উপস্থিত ফল কিছু লাভ করেন নি। তথাপি আদর্শের মূল্য তো কম নয়।

তাঁদের এই আদর্শই অসাম্যের ভাবাদর্শে গড়া সমাজের নিকট, সামাজিক বিধানদাতাদের নিকট তাঁদের উত্তর। নিঃসন্দেহ যে, এই উত্তর বঞ্চিতের উত্তর, যে পৃথিবীকে ভোগ করার সুযোগ পেল না, যে রূপ-রস-গন্ধে আকুল পৃথিবীর আস্বাদন লাভ করল না, তার উত্তর। পূর্বেই বলা হয়েছে, সেকালে বৌদ্ধ ভাবধারা ক্রমেই শীর্ণ হতে শীর্ণতর হয়ে এসেছিল, এবং প্রায় অবলুপ্তির পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। হিন্দু সমাজের সুব্যাপ্ত ভাবধারায় সমুদ্রে বৌদ্ধ চিন্তাধারা প্রায় নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। বেদবিরোধী যজ্ঞবিরোধী স্বয়ং বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণ্য-ধ্যানে পূজিত হ'তে আরম্ভ করেছিলেন। সেই ক্ষয়-পেয়ে যাওয়ার লগ্নে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ রচনা করেছিলেন তাঁদের গীত ও দোহা। ব্রাহ্মণ্য-চিন্তাধারার অসমতার বিরুদ্ধে জানিয়েছিলেন তাঁদের হৃদয় অনুভূত প্রতিবাদ। রাজপ্রাসাদ বিলাস-ব্যসন ও সমৃদ্ধির তরঙ্গে সঞ্চালিত, রাজপ্রাসাদের করুণা যারা লাভ করেছে তারা ধন-ধান্য গরিমায় সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত, সমাজ বিধায়ক যারা তারা ঐশ্বর্য ও প্রভুত্বের দম্ভে স্পর্ধিত; এই ঐশ্বর্যের কলরবে চর্যাগীতিকারদের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে না, অথবা এই কলরবে তাঁদের সুর মেলানোর অবকাশও নেই। তাই এই ভোগ-লিপ্সায় উচ্ছল পৃথিবীর নিকট তাঁদের উত্তর, "তোমার এই হাসি-ঝরা দীপ্তি আমাকে আকর্ষণ করে না, আমি জানি এ সবই অনিত্য।" সমাজ-ব্যবস্থার ফলে তাঁদের জীবনে বহুশত বঞ্চনা স্তূপীকৃত হয়ে আছে; এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাঁদের উত্তর, "আমি চিত্ত জয় করেছি; আমার কোন আকাঙ্ক্ষাই নেই; আমাকে বঞ্চনা করবে তুমি কি দিয়ে?" রাষ্ট্রস্বীকৃত ধর্মের প্রবক্তা ও বিধায়ক যারা পারমার্থিক কল্যাণ কামনায় সর্বদা ধ্যানকর্মে নিমগ্ন, তাঁদের নিকট সিদ্ধাচার্যদের উত্তর, "পথভ্রান্ত তোমরা; সত্যের সন্ধান তোমরা পেলে না।" পৃথিবীকে

জীবনতৃষ্ণাকে তাঁরা অস্বীকার করতে চেয়েছেন, কিন্তু তাঁদের এই অস্বীকারের মধ্য দিয়ে পুনরায় জীবনের আকাঙ্ক্ষা, বাঁচার আকূতি এবং ভোগতৃষ্ণাই রূপায়িত হয়েছে। চাই না, এই উক্তির অন্তরালে চাওয়ার অস্থির বেদনাই স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। তাই, প্রতিভাসের মত শোনালেও, জীবনকে অস্বীকার করে জীবনই নিজেকে নূতন ছন্দে ও সুরে প্রকাশ করেছিল। অবশ্য তার প্রকাশের ভংগীটা সন্দেহাতীতরূপে নেতিধর্মী, এবং দুঃখের চেতনায় ম্রিয়মান। কিন্তু নেতিধর্মী হলেও তা সত্য। এই আকূতি তৎকালীন সমাজের অবজ্ঞাত দুঃখতাপসহা মানুষেরই আকূতি : ক্ষয়িষ্ণু সমাজের পচনশীল স্পর্শ থেকে তারা মুক্তি চায়, জীবনকে আনন্দের মধ্যে উপলব্ধি করতে চায়, নূতন আকাশ চায়।

মধ্যযুগে বাংলা

সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ

এক

(মধ্যযুগের বাংলা সমাজ আমাদের মানসপটে যে চিত্র আঁকে তা বিরামহীন রাজনৈতিক দুর্যোগ ও ঘনঘটায় আবৃত। এ আকাশ রাজারাজড়া, আমীর-ওমরাহ সুলতান-বাদশাহদের যুদ্ধবিগ্রহ, সিংহাসনলিপ্সু রাজপুরুষ এমন কি দাসদের কূটচক্রান্ত ও অন্তর্দ্বন্দ্ব, জায়গীর প্রার্থী রাজকর্মচারীদের আকস্মিক বিদ্রোহ, ভূম্যধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তিদের লোভাতুর দৃষ্টি ও পাপাচরণের মেঘে ঢাকা। আর এই কলুষ-কলঙ্কিত পটভূমির অন্তরালে শুনতে পাওয়া যায় রূপান্তরহীন আত্মচেতনাহীন গ্রাম্য সমাজজীবনের নিরন্তর বয়ে-চলা স্থির মন্থর ধ্বনি। রাজাবাদশা'র যুদ্ধ বিগ্রহ যেমন সত্য, তেমনি এই সমাজ-জীবনের বয়ে-চলার ধ্বনিও সত্য।)

ত্রয়োদশ শতকের গোড়ায় তুর্কী বিজয়ের পর একাদিক্রমে কয়েকটি রাজবংশ বাংলার রাজনৈতিক জীবনের ভাগ্যবিধাতারূপে আবির্ভূত হয়—১৩৩৯-১৪০৬ খৃষ্টাব্দ ও পুনরায় ১৪৪২-১৪৮১ খৃঃ পর্যন্ত সুলতান ইলিয়াস শাহ ও বংশধরগণ; ১৪০৬-৪২ খৃঃ পর্যন্ত রাজা গণেশ ও বংশধরগণ; ১৪৮৬-১৪৯০ খৃঃ হাবসী রাজন্যবর্গ; ১৪৯৩-১৫৩৮ পর্যন্ত হুসেন শাহ্ ও বংশধরগণ; তারপর আসেন শের-শা, কিন্তু ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে বাংলায় মুঘল শাসন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শের-শা'র বংশধরদের আধিপত্যও বিলুপ্ত হয়; ষোড়শ শতকের শেষের দিক থেকেই বাংলার সমুদ্র ও নদীপথে মগ ফিরিঙ্গিদের দস্যুতার দৌরাত্ম্য ঢেউ-এ ঢেউ-এ মাতামাতি সুরু হয়; তারপর দৃশ্যপটে আবির্ভাব হয় ইংরাজ বণিকের, অষ্টাদশ শতকে বৃটিশ বিজয়ের কলকোলাহলের সমুদ্রে আমীর ওমরাহদের রাজত্বকালের শেষসূর্য অস্ত যায়; আকাশের মধ্যযুগীয় মেঘ কাটে, দেখা দেয় নতুন মেঘ। 'এই ক'শ' বছরের রাষ্ট্রীয় শাসনের কাঠামো যেমন সামন্ততান্ত্রিক (কোন কোন ঐতিহাসিক একে Clannish Feudalism বলেছেন), (১)

১। ঢাকা বিশ্ববিত্তালয় প্রকাশিত History of Bengal vol. II.

তেমনি এই সামন্ত-জীবনের অনুধ্যেয় আদর্শও একটিমাত্রই—ক্ষমতার অধিকার। বিবদমান নবাব-সুলতানদের বেলায় যেমন একথা সত্য, তেমনি রাজহন্তা হাবসী দাস অথবা স্বজনহন্তা ভুঁইঞাদের বেলায়ও তা সমভাবে সত্য। রাজা প্রতাপাদিত্যকে এই সামন্ত-জীবনের প্রতীকরূপে তাই অনায়াসে গ্রহণ করা চলে। তিনি মগ ও মুঘলদের ভয়ে পলাতক পর্তুগীজ সমরনায়ক কার্ভালোকে আশ্রয়দান করে পরে স্বীয় স্বার্থে অম্লানচিত্তে হত্যা করেছিলেন; তাছাড়া "প্রবাদ আছে যে, বসন্ত রায়ের বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধের দিবসে পুরী প্রবেশ করিয়া প্রতাপ নিরস্ত্র পাইয়া তাঁহাকে তরবারির আঘাতে নিহত করেন। বসন্ত রায়ের দুই পুত্রও নিহত হন; কনিষ্ঠ নাবালক কচুরায় বাঁচিয়া গিয়া বাদশাহের দরবারে অভিযোগ করেন।......রাজ্যবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় এই সময়ে পাষাণ হৃদয় প্রতাপ স্বীয় নাবালক জামাতা চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি রামচন্দ্রকে হত্যা করিবার কল্পনা করেন; প্রতাপের পুত্র কন্যার কৌশলে রামচন্দ্র রক্ষা পান।" (২) প্রতাপ সম্পর্কে স্ত্রীলোকের স্তনচ্ছেদের গল্পও প্রচলিত। অর্থাৎ, মধ্যযুগীয় অধিকারের সাধনায় কোনরূপ সুকুমার মানসিক বৃত্তির প্রতিরোধ নেই; দয়া নেই, দাক্ষিণ্য নেই, স্নেহ নেই, প্রীতি নেই, কোনরূপ নৈতিক বোধের নামগন্ধ নেই। সামন্ত জীবনের নীতিবোধ স্বতন্ত্র, তারই লালসার রক্ত আভায় আলোকিত—যে কোনরূপ ছলকৌশল শঠতায় অধিকতর ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া। দিল্লী ও বাংলার কলহ, নবাব-সুলতানদের আত্মকলহ, ভুঁইঞাদের সঙ্গে বাদশাহের বিরোধ আর ভুঁইঞাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধের বিভিন্নমুখী লালসার আগুন যখন মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক আকাশকে রাঙিয়ে তুলেছিল, তখন বাংলার গ্রাম্য-সমাজের সাধারণ মানুষ আর কোন আকাশে নিরাপত্তার সূর্যের সন্ধান করেছিল।

কিন্তু, সূর্যের সন্ধান মেলেনি, বরং মগ ফিরিঙ্গি দস্যুরা যখন আবির্ভূত হলো, তখন অস্থির ত্রাস ও আতঙ্ক স্বস্তির আশায় দিগ্বিদিক আশ্রয় সন্ধান করে ফিরেছে। সামসুদ্দিন তালিস নামক জনৈক মুসলমান লিপিকার লিখেছেন, আকবরের সময় থেকে সায়েস্তা খাঁর চট্টগ্রাম বিজয় অবধি আরাকানের মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুরা বাংলা লুণ্ঠন করত। "তাহারা হিন্দু-মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ ছোট বড় সকলকেই বন্দী করিয়া তাহাদের হাতের পাতা ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে

২ মধ্যযুগে বাঙলা—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

সরু বেত প্রবেশ করাইয়া বাঁধিত এবং একজনের উপর আর একজনকে চাপাইয়া জাহাজের পাটাতনের\ নিম্নে ফেলিয়া রাখিত। যেমন লোকে পাখীকে আহার দেয় সেইরূপ তাহারা প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় উপর হইতে বন্দীদের আহারের নিমিত্ত চাউল ছড়াইয়া দিত।··· ··মগেরা বহুকাল ধরিয়া দস্যুতা করার ফলে তাহাদের দেশ শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে এবং তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলা দেশ ক্রমেই জনশূন্য হইয়াছে এবং দস্যুদিগকে বাধা দিবার শক্তিও ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে এই দস্যুদলের যাতায়াতের নদীগুলির উভয় পার্শ্বে একজন গৃহস্থও রহিল না। তাহাদের সচরাচর যাতায়াতের পথে বাকুলা অঞ্চল এবং বাঙ্গলার অন্যান্য অংশ পূর্বে শস্যশালী এবং গৃহস্থের পল্লী দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। প্রতি বর্ষে এই প্রদেশ হইতে বহু পরিমাণ সুপারির কর আদায় হইয়া রাজকোষ পূর্ণ করিত। কিন্তু এই দস্যুদল লুণ্ঠন ও নরনারী হরণ করিয়া এই প্রদেশের অবস্থা এমন করিয়া ফেলিয়াছে যে তথায় একখানি বসতবাটীও নাই; অথবা একটি প্রদীপ জ্বালাইবার লোকও নাই," ইত্যাদি। (৩)

মধ্যযুগের বাংলার রাষ্ট্রীয় ইতিহাস যুদ্ধের হুঙ্কার, দস্যুতার দাপট আর ক্রূরতার নিঃশঙ্ক অভিপ্রকাশে চিহ্নিত। অবশ্য, এই কাল আকাশের মেঘের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছে, যেমন হুসেন শাহের রাজত্বকাল—কিন্তু সে সময়েও বাংলা সমাজ জীবন পূর্ণ সংহতি ও শান্তি অর্জন করেছে বলা যায় না। বৃন্দাবনদাস লিখেছেন, চৈতন্যদেব নৌকায় নীলাচল যাওয়ার পথে সংকীর্তন আরম্ভ করেন; তখন নৌকার মাঝি আতঙ্কিত হয়ে বলছে,

বুঝিলাঙ আজি আর প্রাণ নাহি রয় ॥
কূলে উঠিলে সে বাঘে লইয়া পলায়।
জলে পড়িলে সে বোল কুম্ভীরেই খায় ॥
নিরন্তর এ পানীতে ডাকাইত ফিরে।
পাইলেই ধনপ্রাণ দুই নাশ করে ॥

---

৩ আচার্য যদুনাথ সরকারের Studies in Mughal India
কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়ের 'মধ্যযুগে বাঙ্গলা' দ্রষ্টব্য

এতেকে যাবত উড়িষ্যার দেশ পাই।
তাবত নীরব হও সকল গোসাঞি॥

(অন্ত্যখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়)

এই অধ্যায়েরই প্রথম দিকে আছে, "দুই রাজায় হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ। মহাযুদ্ধ স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ॥" অর্থাৎ, মধ্যযুগের সর্বাপেক্ষা শান্ত ও সৃষ্টি-শীল কালও রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা ও জীবনের নিরাপত্তাবোধহীনতার চেতনায় বিষণ্ণ, অত্যাচারীর অত্যাচারে হকচকিত।

'শান্তি, নিরাপত্তা এবং নির্বিরোধ জীবনযাত্রাকে যদি গণ-মানসের আরাধ্য লক্ষ্য বলে গণ্য করি, তাহ'লে নিঃসন্দেহে বলা চলে মধ্যযুগের আকাশ ছিল তমসাবৃত। এই অন্ধকার আকাশ সিংহাসন-লিপ্সু ক্রুরচক্রী ব্যক্তি, লোভী ভুঁইঞা আর মানুষ ও পণ্যের ব্যবসাদার ফিরিঙ্গি ও মগ দস্যুদের অবাধ লীলা-ভূমি। বিভিন্ন ঘটনা ও চক্র-চক্রান্তের ফলে এরা এই আকাশে আবির্ভূত হয়েছে, এবং নির্দিষ্ট স্থানে ও কালে তাদের লীলার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে। তাদের লক্ষ্য ছিল এক, ক্ষমতার অধিকার ; কর্ম ছিল বিবিধ—লুণ্ঠন, নরহত্যা, ছলকৌশল, শঠতা। এইসব বিবিধ কর্ম যখন একই সামাজিক পরিবেশে ঘুরপাক খেয়েছে, তখনই সৃষ্টি হয়েছিল মার্ক্স বর্ণিত প্রাক্-বৃটিশ রাষ্ট্রীয় অবস্থা—when all were struggling against all. (৪)

এরই অন্তরালে চলেছিল রূপান্তরের খেলা, এমন কি সুষুপ্ত গ্রাম্য সমাজ-জীবনেও।

দুই

রাষ্ট্রীয় জীবনের এই ঘূর্ণিপাক ও ওঠানামার পাশাপাশি আরও একটা বিরোধ চলেছিল সমাজ-জীবনে, আর প্রায়শই তা রূপ পরিগ্রহ করত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের। ইহা ধর্ম-কলহ। আমীর ওমরাহের যুদ্ধবিগ্রহের চেয়ে ধর্ম-বিরোধের প্রভাব তুলনায় নগণ্য বা অল্প ছিল না, ছিল অধিকতর ব্যাপক ও অর্থবহ।

---

৪ মার্ক্স—Articles of India

ভারতবর্ষে মুসলিম অভিযান পূর্বেকার অভিযানগুলির ন্যায় শুধুমাত্র সামরিক অভিযানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; মুসলমান অভিযানকারীদের ছিল বিশিষ্ট সংস্কার সংস্কৃতি এবং আদর্শ। তাই সংঘাতটা দুটো বিরোধী সংস্কৃতি ও সামাজিক আদর্শের সংঘাতে পরিণত হয়। অবশ্য ভারত অভিযানের বহু পূর্বেই ইসলাম তার প্রথম যুগের মানবিক আদর্শ, ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং প্রগতিশীল দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছিল। সুতরাং ভারতে সনাতন হিন্দু এবং মুসলিম সংস্কৃতির যে সংঘাত দেখা দেয়, তা দুটো ক্ষয়িষ্ণু জীর্ণ সামাজিক আদর্শ ও সংস্কৃতির সংঘাতে পর্যবসিত হয়। এই সংগ্রামে ইসলাম জয়ী হয়েছে; কারণ, সে যুগে বিশ্বের সমাজ সংস্কৃতির ইতিহাসে তার প্রগতিশীল ভূমিকা নিঃশেষিত হয়ে গিয়ে থাকলেও তৎকালীন ভারতে প্রচলিত সামাজিক আদর্শের তুলনায় ইসলামের আদর্শ ছিল প্রাগ্রসর। বলা বাহুল্য, ইসলামের এই বিজয় সহজ এবং সুগম হয়নি। তাই দেখি, চৈতন্যদেবের আমলে এবং পরবর্তীকালে বহিরাগত মুসলমান এবং হিন্দু-বৌদ্ধ ভারতীয়দের মধ্যবর্তী যোগসূত্র—ভারতীয় মুসলমানদের আবির্ভাব হওয়া সত্বেও হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সংঘাত তখনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চলছিল। চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের চিত্র আছে বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতায়'। তিনি লিখেছেন,

কতহুঁ তুরক বরকর,
বাট জাইতেঁ বেগার ধর।
ধরি আনএ বাঁভন-বড়ুআ,
মথাঁ চড়াবএ গাইক চুড়ুয়া।
ফোট চাট জনউ তোড়,
উপর চড়াবএ চাহ ঘোড়।
ধোআ উড়িধানে মদিরা সাঁধ,
দেউল ভাঁগি মসীদ বাঁধ।
গোরি গোমঠ পূরলি মহী,
পএরহু দেবাক ঠাম নহী।
হিন্দু বোলি দূরহি নিকার,
ছোটেও তুরুকা ভভকী মার। (৫)

৫ সুকুমার সেনের "মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙ্গালী" গ্রন্থে উদ্ধৃত

[কত তুরুক রাস্তায় যেতে বেগার ধরে। ব্রাহ্মণবটুকে ধরে এনে তার মাথায় চড়িয়ে দেয় গোরুর রাঙ। ফোঁটা চাটে, পৈতে ছেঁড়ে, ঘোড়ার উপর চায় চড়াতে। ধোয়া উড়ি ধানে মদ চোলাই করে, দেউল ভেঙে মসজিদ বানায়। গোরে ও গোমঠে মহী হলো পূর্ণ, পা দেবার একটুও স্থান নেই। হিন্দুকে বলে, দূরে সিকালো। তুরুক ছোট হলেও বড়কে মারতে যায়।]

(কথিত আছে যে, রাজা গণেশ স্বল্পকালের জন্ত পাঠানদের পরাজিত করে বাংলায় হিন্দু রাজত্ব পুনঃ সংস্থাপন করে মুসলমানদের উপর অত্যাচার করেছিলেন প্রচুর; এবং তাঁর (রাজনৈতিক বা অন্ত কারণে) স্বধর্মত্যাগী পুত্র জলালু-দ-দিনও রাজা হয়ে হিন্দুদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছিলেন। এই ঘাত-প্রতিঘাতের ধাক্কায় দেখতে পাই চৈতন্ত দেবের সমকালীন রাজা হুসেন শাহ নানা ভাবে বিস্তা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেও উড়িস্থার দেবমন্দির বিনষ্ট করছেন। এই আমলের ধর্মকলহ সম্পর্কে জয়ানন্দ লিখেছেন,

পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥
বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে।
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে॥

এ ছাড়াও সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্তভাগবতে'। বৈষ্ণব হরিদাসকে মুসলমান হয়ে হিন্দু আচার পালন করার অপরাধে মুসলমানরা মুল্লুক পতির কাছে ধরে নিয়ে যায়। তিনি হরিদাসকে হিন্দুআচার ত্যাগ করার অনুরোধ করে বলছেন,

কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন।
তবে কেনে হিন্দুর আচারে দেহ মন॥
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা তুমি ছোড় হই মহাবংশজাত॥
জাতি-ধর্ম লঙ্ঘি কর অন্ত-ব্যবহার।
পর-লোকে কেমতে বা পাইবা নিস্তার॥

(আদিখণ্ড, ১১ শ অধ্যায়)

হরিদাস-বিচারের কাহিনী ছাড়াও 'চৈতন্যভাগবত' এবং 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ নবদ্বীপের কাজীর আদেশে চৈতন্য দেবের পার্ষদদের কীর্তন ও মৃদঙ্গ ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ভাঙার কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। বহুপূর্বে ইবন বতুতা লিখে গিয়েছেন, Hindus are mulcted of half of their crops and have to pay taxes over and above that. (৬)

হিন্দু সমাজের মধ্যেও প্রতিরোধের প্রবল আগ্রহ। যবন সংস্পর্শদোষে যাদের জাত গিয়েছিল তাদেরকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে পুনরায় হিন্দুসমাজে স্থান দেওয়ার প্রচেষ্টা হিন্দু সমাজপতিদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। (অবশ্য, এই ধর্মকলহ শুধু হিন্দু মুসলিম্ ভাবধারার কলহেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সে কালে হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মমতের সংঘাতও যে বর্তমান ছিল, তার স্বাক্ষর রয়েছে 'চৈতন্য ভাগবতে'। বৃন্দাবনদাস লিখেছেন

> তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।
> দেখিলেন প্রভু বসি আছে বৌদ্ধগণ ॥
> জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহো উত্তর না করে।
> ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে ॥
> পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়া।
> বনে ভ্রমে' নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়া ॥)

(আদি খণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

'চৈতন্য চরিতামৃতে' মধ্যলীলার নবম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, তত্ত্ববিচারে বৌদ্ধগণ চৈতন্যদেবের নিকট পরাভূত হয়ে তাঁকে "অপবিত্র অন্ন" খাওয়ানোর ষড়যন্ত্র করেছিল।

৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের History of Bengal vol II থেকে উদ্ধৃত

তিন

এই ধর্ম-কলহ এবং সংস্কৃতি-সংঘাতের অন্তরালে ইসলাম ভারতে কোন নতুন বাণী বহন করে এনেছিল, এবং কোন ধারায় ভারতের সমাজেতিহাসকে প্রবাহিত করছিল, তা বিচার করে দেখা যাক। প্রথমেই স্বীকার্য যে, ভারতে যারা ইসলামের বার্তাবহ রূপে এসেছিল, তাদের মধ্যে ইসলামের মৌলিক সজীবতা, নিষ্ঠা, উদারতা ছিল না। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাক। প্রথম খলিফা আবুবকর 'ফওজে এলাহী'র প্রতি এক নির্দেশনামায় বলেছিলেন, "ন্যায়পরায়ণ হবে, অন্যায় আচরণকারীরা কখনও উন্নতি করতে পারে না। সাহসী হবে, মৃত্যু বরণ করবে, তবু আত্মসমর্পণ করবে না। সদয় ব্যবহার করবে, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ ও শিশুর গায়ে হাত তুলবে না। ফলের গাছ নষ্ট করবে না, খাদ্যশস্যাদি এমন কি পশুও নয়। শত্রুকেও একবার কথা দিলে কিছুতেই সেই কথার খেলাফ করবে না। আশ্রম-বাসীদের প্রতিও কখনও কঠোর হবে না।" আবুবকরের এই উক্তির মধ্যে যে উদারতা এবং সুস্থ কল্যাণবোধ প্রকাশ পেয়েছে, ভারতে অভিযানকারী কোন মুসলমানই তা দাবী করতে পারে না; কারণ, ইতিহাসের সাক্ষ্য অন্যরূপ। কিন্তু তথাপি তাদের আচরণে ছিল এমন একটা নতুন ভংগী এবং কণ্ঠে ছিল এমন একটা নতুন সুর যা সমকালীন ভারতীয়দের মনে রেখাপাত করেছে, এবং অবিচলভাবে তাদের আকর্ষণ করেছে। সেই আকর্ষণ ছিল এমন সম্ভাবনাময় যা বহু মানুষকে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছে। তাতে ইতিহাসেরও নব রূপায়ণ হয়েছে।

প্রথমত, ইসলামের সামাজিক সাম্যের আদর্শ। ভারতে আসতে আসতে এই আদর্শ কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকলেও মোটামুটিভাবে তা অক্ষুণ্ণ ছিল। সামাজিক সমানাধিকারের এই আদর্শ এবং শ্রেণীগত সংস্কারের অনুপস্থিতিই বর্ণ-সংস্কারে জর্জরিত ভারতে ইসলামের বিজয়াভিযানের অন্যতম কারণ। আর ইসলামের পরিধির বাইরে অবস্থিত বিভিন্ন উৎপীড়িত মানুষের কাছে ইহাই সর্বাপেক্ষা বড় আকর্ষণ ও প্রলোভনরূপে কাজ করেছে। হিন্দু সামাজিক সংস্থার নির্মম বিধানে যারা নির্যাতিত হচ্ছিল,—

বর্ণসমাজের অন্তর্গত নিম্ন বর্ণগুলি এবং বর্ণসমাজের বাইরের অস্পৃশ্য জাতিগুলি—তারা ইসলামিক সমাজ-সংস্থায় আশ্রয় গ্রহণ করে সামাজিক নির্যাতন থেকে মুক্তিলাভ করেছে। হিন্দু সমাজের বিধানদাতাদের নিকট যারা ছিল শূদ্র এবং অস্পৃশ্য পর্যায়ের, ইসলাম তাদের দিলো মুক্ত মানুষের অধিকার, এবং শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণদের উপরেও প্রভুত্ব করার ক্ষমতা। চৈতন্য দেবের আমলে বিবদমান হিন্দু সমাজ-সংস্কৃতি এবং মুসলিম সমাজ সংস্কৃতি উভয়ের বুকে ক্ষয়ের চিহ্ন বর্তমান থাকলেও, এই খানেই তুলনায় মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতি ছিল প্রগতিশীল, আর সেজন্য তার বিজয়ও হয়েছে অপ্রতিহত। সামাজিক চিন্তাধারার এই উদারতা এবং সমানাধিকারের আদর্শই ভারতের সমাজেতিহাসে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। আর এই আদর্শের মধ্যে আছে মানুষের মানবতার স্বীকৃতি। ভারতে ইসলামের বিজয়াভিযান সম্পর্কে হ্যাভেল বলেছেন, মহম্মদের "সমাজ ব্যবস্থা প্রত্যেক মুসলমানকে সমান আত্মিক মর্যাদা দান করেছে ইসলামকে রাজনীতি ও সমাজনীতির মিলনভূমি করেছে, আর তার উপর ন্যস্ত করেছে সমাজশাসনের ভার। পৃথিবীকে সহজ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে সাধারণ মানুষের পক্ষে সুখী হওয়ার বিধান হিসেবে ইসলাম যথেষ্ট। বৌদ্ধদর্শন এবং ব্রাহ্মণ্য চিন্তাধারার গোঁড়ামি যখন সমগ্র উত্তর ভারতে একটা রাজনৈতিক বিক্ষোভ সৃষ্টি করে, তখন সেই সংকট মুহূর্তেই ইসলাম তার চূড়ান্ত রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয় করে।" (৭) এই বিজয়লাভ তার পক্ষে কখনই সম্ভব হতো না যদি না তার মধ্যে সাধারণ মানুষের মানবতার স্বীকৃতি থাকত।

এই সামাজিক আদর্শের পাশাপাশি আছে তার একেশ্বরবাদের আদর্শ। ঈশ্বর এক এবং অভিন্ন, এই জ্ঞান পৃথিবীর বহু মানুষের সংস্পর্শজাত ব্যবহারিক বিষয়চেতনা থেকেই জন্মলাভ করে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বাহ্য আকৃতি প্রকৃতি এবং হৃদয়ানুভূতির মধ্যে যে ঐক্য দেখতে পাওয়া যায়, সে চেতনা থেকেই একক অভিন্ন সৃষ্টিকর্তার আদর্শ বিকাশলাভ করে থাকে। সুতরাং একেশ্বরবাদের আদর্শকে বিবেকবুদ্ধি ও যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। ভারতের নিকট এই আদর্শ সম্পূর্ণ নতুন না হলেও বহিঃপৃথিবীর সংগে ভারতের সংযোগ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায়, এবং তার আধ্যাত্মিক

(৭) Aryan Rule in India.

আদর্শকে প্রত্যক্ষ বিচারের তুলাদণ্ডে পরিমাপ করতে হয়নি বলে, সে আদর্শ একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল; এবং মুসলমান অভিযানের কালে তেত্রিশ কোটি দেবতার অস্তিত্ব ছিল ভারতে। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার এই শোচনীয় অবস্থায় ইসলাম যে ভারতের চিন্তাজগতে এক অভিনব তরঙ্গাভিঘাত তুলেছিল তা বলা বাহুল্য। আর এই ভূমিকা গ্রহণ করে ইসলাম ভারতে যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করছিল। এ শুধু বহু ভগবানের আদর্শকেই আঘাত করেনি, পৌত্তলিকতাকেও সমভাবে আঘাত করেছে; ফলে, অন্ধ বিশ্বাসের ভিত্তি শিথিল হয়েছে।

তারপর বহু মানুষের মেলামেশা ও পারস্পরিক আদানপ্রদান থেকে যে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভংগীর উন্মেষ, তার মধ্যে বহু মানুষের মিলনের বীজও অন্তর্নিহিত থাকে। ব্যবহারিক কার্যক্ষেত্রে যতই উপেক্ষিত হোক না কেন, 'কানান্না সো উম্মাতান ওয়াহেদাতান" (সমগ্র মানবমণ্ডলী এক জাতি) ইসলামেরই বাণী॰। ইতিহাসবিদ আচার্য যদুনাথ সরকারের মতে, ভারতে ইসলাম বিজয়ের বহুবিধ সুফলের অন্যতম সুফল হলো, বাহির বিশ্বের সংগে ভারতের সংযোগ পুনঃস্থাপন, এবং ভারতের নৌ ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন। এর ফলে ভারতের আত্ম-নির্ভর অহমিকা ও সঙ্কীর্ণতা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়, এবং দেশবিদেশের বিচিত্র মানুষের সমবায়ে ভারতে নতুন মানবতার প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি রচিত হয়।

তাছাড়া, ইসলাম জনসাধারণের সম্মুখে যে অনাড়ম্বর জীবনাচরণের আদর্শ তুলে ধরে তার অবদানও কম নয়। ইসলামের প্রথম খলিফাগণ সকলেই অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ আদর্শ জীবন যাপন করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে দ্বিতীয় খলিফা ওমারের ন্যায়পরতার জন্য ঐতিহাসিক গীবন তাঁকে উচ্ছুসিত প্রশংসা করেন। আরবদের মধ্যে বহু বিবাহের নামে যে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রচলন ছিল তিনি তার সংস্কার করেন, এবং আরবের জাতীয় জীবন থেকে বিলাসিতাকে বিসর্জন দেন। খলিফাদের জীবনাচরণের এই অনাড়ম্বর ঔদার্য ও মাধুর্য মুসলমান অভিযানকারীদের মাধ্যমে এদেশে আসেনি, এসেছে মুসলমান ভক্ত ও সাধুদের বাস্তব জীবনকে অবলম্বন করে। এইসব ভক্তদের সাধুতা নিষ্ঠা ও নির্লিপ্ত জীবন ভারতের অসংখ্য শান্তিকামী মানুষের হৃদয় জয় করে, এবং ভ্রাতৃত্বের প্রীতিরসে নতুন সমাজ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার আলোক বিকীরণ করেছে।

ইসলামের বিজয়ের আরও একটি অমূল্য অবদান হলো, লৌকিক ভাষা ও সাহিত্যের আবির্ভাব ও বিকাশ। আর এই সাহিত্যের আবির্ভাবের সংগে সংগে জাতীয় জীবনের বিকাশের সূত্রপাত। শিল্প সাহিত্য সংগীত ছাড়া সংক্ষেপে এই হলো ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান। এই অবদানের আলোকেই ভারতের মধ্যযুগের ভাবাকাশ আশ্চর্যভাবে রূপান্তরিত হয়।

বাংলার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে ইসলামের প্রভাব অনুভূত হয়েছে আরও একভাবে। ইসলাম অভিযানের পূর্বে বাংলার সুসংহত বা ঐক্যবদ্ধ জাতীয় জীবনের কোন অস্তিত্ব ছিল না। বহিরাগত আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং বাংলার নিজস্ব অধিবাসির অনার্য সংস্কৃতি বহু শতাব্দী ধরে পাশাপাশি তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে বর্তমান থাকলেও তাদের সমন্বয়ে নবতর সংস্কৃতি ও নবতর জাতীয় জীবন গঠন করা সম্ভব হয়নি। এমনকি, সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য আদর্শে সমাজ সংগঠনের ব্যাপক প্রচেষ্টা হলেও তাতে শুধুমাত্র কাঠামো স্থাপন হয়েছিল, কাঠামোকে বাঁচিয়ে রাখে যে প্রাণ তার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। এবার মুসলমান আক্রমণের আঘাতে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির স্ব স্ব সীমা আপনাথেকেই মুছে যেতে আরম্ভ করে, এবং উভয়ের সংমিশ্রণে গড়া এক নতুন আদর্শ আত্মপ্রকাশ করে। আর্যের প্রজ্ঞাধর্মী জীবনবাদের সংগে অনার্যের বস্তুনিষ্ঠ প্রাণ ধর্মিতা এসে মিলিত হয়; আর্যের চিন্তা ও মনন অনার্যের সজীব ক্রিয়াশীলতার সংগে যুক্ত হয়। আর এই সমন্বিত রূপের উপর সামগ্রিকভাবে বর্ষিত হলো ইসলামের প্রভাব। এই প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয় নতুন বাঙ্গালী চরিত্র। চৈতন্যদেব এই নবাবির্ভূত বাঙ্গালী জাতির প্রতীক।

চার

ভাবজগতে মুসলিম সাধুসন্তদের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করলেও সর্বথা স্মরণযোগ্য, মধ্যযুগের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা একান্ত-ভাবেই ছিল সামন্ততান্ত্রিক। আর সামন্ততন্ত্রের নৈতিক মূল্যমানে মানুষের মানবিক মর্যাদার স্থান খুব সামান্যই ছিল। পূর্বকাল থেকে চলে-আসা

দাসপ্রথা এ-যুগে বদ্ধমূল হয়। মধ্যযুগের বাজারে শুধু পণ্যের বিকিকিনি হ'তো না, মানুষ-পণ্যেরও ব্যবসা চলতো। ইবন বতুতা বাঙ্গালায় এসেছিলেন চতুর্দশ শতকে। তিনি যে ভ্রমণ-লিপি রেখে গিয়েছেন, তাতে দেখা যায়, তখন সুন্দরী যুবতী ক্রীতদাসীর বিক্রয়-মূল্য ছিল এক স্বর্ণ দীনার (প্রায় ১০৲ টাকা); তিনি স্বয়ং একটি পরমাসুন্দরী ক্রীতদাসী ক্রয় করেছিলেন ঐ দামে, আর তাঁর বন্ধু একজন সুশ্রী কিশোর দাস কিনেছিলেন দুই স্বর্ণ দীনারে। (৮)

পর্তুগীজ পর্যটক বার্বোসা এসেছিলেন ষোড়শ শতকে। তাঁর বিবরণীতে প্রকাশ, "মুসলমান বণিকেরা দেশের ভিতরে গিয়া অনেক বালকবালিকা ক্রয় করে; ইহাদের পিতামাতা বা বালক চোরেরা বিক্রয় ক'রে। লইয়া আসিয়া খোজা করিয়া দেয়; কেহ কেহ এরূপে মারা যায়, যাহারা বাঁচিয়া উঠে তাহাদিগকে ভালরূপে মানুষ করিয়া ২০।৩০ ডুকাট মূল্যে পারসীকদিগের নিকট বিক্রয় করে।" (মধ্যযুগে বাঙ্গালা)

অষ্টাদশ শতকের রিপোর্টে দেখতে পাই, ১৭১৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে মগেরা বাংলার দক্ষিণ অঞ্চল থেকে আঠার শ' নাগরিক ও বালকবালিকা ধরে নিয়ে যায়। তারা আরাকান পৌঁছায় দশ দিনে। বন্দীদের উপস্থিত করা হয় আরাকান রাজের সম্মুখে। তিনি শিল্পকর্মকুশল ব্যক্তিদের বাছাই করে নিজের দাসরূপে গ্রহণ করেন। এদের সংখ্যা মোট বন্দী সংখ্যার এক চতুর্থাংশ। বাকী বন্দীদের গলায় দড়ি বেঁধে বাজারে নেওয়া হয়, এবং শারীরিক বলের তারতম্য অনুসারে তাদের কুড়ি থেকে সত্তর টাকা দরে বিক্রী করা হয়। ক্রেতারা দাসদের কৃষিকর্মে নিয়োগ করে, এবং খোরাকের জন্য এদের মাসিক বরাদ্দ ছিল ১৫ সের চাল। (৯)

১৮০৭ সালে ডাঃ বুকাননের রিপোর্টে দেখা যায়, দরিদ্রের ঘরের সন্তান হাটবাজারে বিক্রী হচ্ছে। তখনকার দিনে, "পূর্ণিয়ায় পূর্ণ বয়স্ক দাস (নগরে) ১৫৲ হইতে ২০৲ টাকায়, ১৬ বৎসরের বালক ১২ হইতে ২০৲ এবং ৮।১০ বৎসরের বালিকা ৫ হইতে ১৫ টাকায় মিলিত।" (১০)

৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের History of Bengal Vol IIতে উদ্ধৃত

৯ Good old Days of Hon. John Company Vol. I

১০ মধ্যযুগে বাঙ্গলা গ্রন্থে উদ্ধৃত

এই পরিবেশে গণ-জীবনও সুখের ছিল না। অবশ্য, সেকালের বাংলায় পণ্যোৎপাদন হ'তো প্রভূত। আর দামেও ছিল অস্বাভাবিক সস্তা। বিদেশী পর্যটকগণ এবং মুসলমান ইতিহাসকারগণ বাংলার পণ্য সমৃদ্ধি দেখে মুগ্ধ বিস্মিত হয়েছেন। সোনা দিয়ে ঘরের "মাথা" মুড়ানো, সোনার পাতে ছানি এবং রূপোতে ঠুনি দেওয়ার, "টুয়ের মধ্যে রত্ন অলঙ্কার, হাজার বাণিজ্য নায়, সাগর বাহিয়া যায়" কাহিনী শোনা গেলেও (পূর্ব-বঙ্গের 'ভেলুয়া' গীতি দ্রষ্টব্য), গ্রাম্য জীবনের আসল চিত্ররূপ তা নয়। এই সোনার বাংলা সম্পন্ন ভদ্র গৃহস্থদের, সাধারণ মানুষের নয়। সেকালে অবশ্যই টাকায় পাঁচ মণ ধান বিক্রী হ'তো, কিন্তু বিস্মৃত হ'লে চলবে না, সেকালে সাধারণ শ্রমজীবির মজুরি ছিল "চার পয়সারও কম।" (১১) সুতরাং, তাদের পক্ষে উদরান্নের সংস্থান করাই ছিল এক অসম্ভব সমস্যা। তাই, র‍্যালফ্‌ ফিচ্‌, বুকানন প্রভৃতি পর্যটকরা পল্লী-বাংলার দৈন্যদশার কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। বুকানন দিনাজপুর, রংপুর অঞ্চলে অর্ধ উলঙ্গ দরিদ্র প্রজা লক্ষ্য করেছেন। তিনি ঐ এলাকায় গৃহস্থালীর আসবাবপত্রের মধ্যে দেখেছেন, মাটির বাসন, চড়কা, দা, বঁটি, কোথাও একটিমাত্র ঘটি, খাটিয়া ও কাঁথা। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ঘরে কয়েকটা মাত্র পিতল কাঁসার বাসন। কয়েক শ' বছর আগেও যে অবস্থা এইরূপই ছিল, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। অথচ আবুল ফজল বর্ণিত পণ্যমূল্যের তালিকায় দেখতে পাই, তখন এক থান সুতি কাপড় আট আনা থেকে দু'টাকায় বিক্রী হতো, একখানা কম্বলের দাম ছিল চার আনা থেকে দু'টাকা। কিন্তু বাংলার দরিদ্র চাষী এত সস্তার কাপড়ও কিনতে পারত না, তাই নেংটি পরে' ও কাঁথা গায়ে দিনযাপন করত।

তার উপর ছিল আবার রাজস্ব আদায়কারী রাজকর্মচারী জায়গীরদারদের অত্যাচার। কথিত আছে, হুসেন শাহের রাজত্বকালে, ডিহিদার মামুদ শরিফের অধীনে সরকারগণ 'খিল' জমি 'আবাদী' বলে লিখে নেয়, এবং প্রজারা অতিরিক্ত খাজনা পরিশোধ করতে না পেরে ধান, গোরু প্রভৃতি বিক্রী করে সর্বস্বান্ত হ'তে বাধ্য হয়। পরবর্তী কালের ইতিহাস এর চেয়ে উন্নত নয়। বিশেষত, আকাল ও ব্যাপক

১১ মধ্যযুগে বাঙ্গালা—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

খাদ্য সংকটের কালে গ্রাম্যসমাজের অবস্থা কি রূপ ধারণ করে, সে কথা সুবিদিত।

রাজরাজড়া, নবাব-বাদশাহেরা ক্ষমতা অধিকারের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, সমাজ-বিধায়করা নিজ নিজ সমাজ সংরক্ষণের দুশ্চিন্তায় ছিলেন মগ্ন, গ্রাম্য প্রধানরা রাজন্যবর্গের সুখবিধানের জন্য ছিলেন চিন্তিত, কিন্তু সাধারণ দুঃস্থ মানুষের জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করার অবসর বা চিন্তা কাহারও ছিল না। তাই বাংলার বৃহত্তর গণজীবন প্রাচুর্যের দেশেও ছিল বঞ্চনার বেদনায় পাণ্ডুর। অ-মানবিক বিধিবিধান ও পরিবেশের শাসনে বিষন্ন।

পাঁচ

এই সামন্ত সমাজের অর্থনৈতিক জীবন ছিল অনিশ্চিত, নিরাপত্তা-বোধহীন। সমাজ ছিল আত্মসমাহিত, বহির্জগতের সম্পর্কহীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই অসহায় পরিস্থিতিতে নৈসর্গিক প্রভাবের নিকট মানুষের পরাভব অবশ্যম্ভাবী। এখানে প্রাকৃতিক পরিবেশকে জয় করার সৃষ্টিশীল কর্ম নেই, আছে পরাভবের নিঃসঙ্কোচ স্বীকৃতি। সুতরাং, কুসংস্কার, প্রাকৃতিক শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ এবং যুগ-বিস্তৃত আদর্শের নিকট প্রশ্নহীন আত্মবিক্রয় সেকালের মানুষকে সমস্ত রকমের আত্মচেতনা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। অর্থাৎ, সামন্ত যুগের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সামন্ত সমাজ অত্যন্ত সংকীর্ণ সীমার বন্ধনে মানুষকে আবদ্ধ করে রেখেছিল। তাই, রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক বিধাতৃ-পুরুষদের স্বৈরাচার এখানে একান্তই সহজ ও সম্ভব। আর এই স্বৈরাচার শুধুমাত্র শাসন ব্যবস্থার নয়, ভাবাদর্শেরও। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন সেকালের সাংস্কৃতিক ও মনোজীবনের অধঃপতনের নিদর্শন স্বরূপ সমসাময়িক "তথাকথিত" রণনীতির একটি পুথি থেকে একটি বিধান তাঁর "মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। শত্রুসৈন্য চারদিক ঘিরে আক্রমণ করলে, কর্তব্য কি সম্পর্কে ঐ পুথিতে বলা হ'য়েছে, "শ্মশানের ছাই কয়েকটি বিশেষ বিশেষ গাছের ছাল ও মূলের সঙ্গে বেটে তূর্য্যের গায়ে ভালো করে মাখিয়ে এই মন্ত্র পড়ে বাজাতে হ'বে,

ওং অং হং হালিয়া হে মহেলি বিষ্কহি সাহিণেহি
মশাণেহি থাহি লুঙ্কহি কিলি কিলি কালি হং ফট্ স্বাহা।

আর শ্বেত অপরাজিতার মূল ধুতুরা পাতার রসে বেটে নিজের কপালে তিলক এঁটে সর্বজ্ঞোদয় মন্ত্র জপ করতে হবে। তা হলে সেই তূর্য্যের শব্দ শুনে "ভবতি পরচক্রভঙ্গং স্বসৈন্যবিজয়ঃ"। তাছাড়া, ধর্মাচরণে বিকৃতি, অন্তর্জলি, নরবলি, সহমরণ ইত্যাদি বিধিব্যবস্থার মধ্যেও এমন এক মানস-সংগঠনের পরিচয় পাওয়া যায়, যাকে কোনভাবেই গতিশীল বা কার্যকারণ সম্পর্কের চেতনাযুক্ত বলে স্বীকার করা যায় না।

এই অধঃপতন দীর্ঘকাল পূর্ব থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। মুসলমান অভিযানের বহু পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষ বাহির বিশ্বের সহিত সংযোগ হারিয়ে ফেলেছিল। ফলে, সমাজের দৃষ্টি বাইরের বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা হারিয়ে অন্তরে সঙ্কুচিত হয়ে যায়, এবং এই সংকোচনের মধ্যেও নিজের অস্বাভাবিক ক্ষুদ্রতাকে মহত্ব বলে প্রতিভাত হয়। সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক অল বারুনি ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে ভারত ভ্রমণে আসেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে তিনি সে সময়কার হিন্দুদের বিকৃত বুদ্ধি, অহঙ্কার, জাত্যভিমান, ভিন্নদেশী বিদ্বেষ ও ঘৃণা, এবং যুক্তিহীন আত্ম-সর্বস্বতা দেখে দুঃখিত হয়েছিলেন। তাঁর অভিমত কঠোর হ'লেও এখানে উল্লেখযোগ্য: "The Hindus believe that there is no country like theirs, no nation like theirs, no kings like theirs, no sciences like theirs. They are haughty, foolishly vain, self-conceited and stolid. They are by nature niggardly in communicating what they know, and take the greatest possible care to withhold it from men of another caste among their people, still much more, of course, from any foreigner. According to their belief there is no other country on the earth but theirs, no other race of man but theirs, and no created beings besides them have any knowledge or science whatsoever." (১২) এই একান্ত আত্মনির্ভর, ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ

---

১২ অল বারুনি: ভারতবর্ষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩

দৃষ্টি যে অন্ধ, জীবনের গতিশীলতাহীন এবং সমস্ত কল্যাণবুদ্ধি-বর্জিত তা বলা বাহুল্য। জীবন এবং চিন্তাধারা যখন এমনি খাতে প্রবাহিত হয়, তখন তা আর কোন কিছুকেই সৃষ্টি করতে পারে না, সৃষ্টিকেও সহজেই বিনষ্ট করে পঙ্কিলতায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

বাইরে প্রসারিত দৃষ্টিকে অন্তরের মধ্যে সংকুচিত করার ফলে এবং জীবন সম্পর্কে সর্বপ্রকার সৃষ্টিশীল গতিশীল আগ্রহ-অনুরাগ বিলুপ্ত হওয়ার ফলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পক্ষে কাশী নবদ্বীপের শিক্ষাকেন্দ্রে ব্যাকরণের তর্ক নিয়ে মশগুল থাকা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের এই কূট তর্ক বাস্তব জীবনের সংগে কোনভাবে সম্পর্কিত কিনা তা অনুসন্ধান করার অবসর তাঁদের ছিল না; অথবা তাঁদের তর্কযুদ্ধ দ্বারা সমকালীন জীবন কোনভাবে উপকৃত হচ্ছে কি না তা বিচার করাও তাঁদের মনোজগতের অন্তর্গত ছিল না। তাঁরা তাঁদের মানস জগতের আভিজাত্য, সংস্কৃতের আভিজাত্য এবং সংস্কার-সংস্কৃতির আভিজাত্য সংরক্ষণের প্রতিই যত্নবান ছিলেন। তাই কৃত্তিবাস কাশীদাস প্রভৃতি বাংলা ভাষায় রামায়ণ-মহাভারত রচনা করায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। (১৩)

আর শুধু তাই বা বলি কেন, সে যুগের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, এ কথা বলাও বোধ হয় অসঙ্গত নয়। অপর দিকে, তাঁরা এবং সাধারণভাবে দেশের জনসমষ্টিও সর্বপ্রকার সজীব কর্ম থেকে বিরত ছিলেন। ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীতে যখন আর কোন দেশ নেই, ভারতের জ্ঞান বিজ্ঞান সংস্কৃতির সহিত তুলনীয় আর কোন সংস্কৃতি যখন নেই, নিজেরা ছাড়া পৃথিবীতে আর যখন কোন লোক নেই, তখন বাইরের বাধা বিপত্তির চেতনা থেকেও মন মুক্ত হয়; এবং শৌর্য বীর্য শক্তির চর্চা নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আত্মাভিমানের সংগে সংগে নানা ধরণের অর্থহীন আত্মধ্বংসী তন্ত্রমন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস হয় দৃঢ়। জ্ঞানানুশীলনের পরিবর্তে তন্ত্র মন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস সামাজিক উচ্চবর্ণের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখতে কতখানি সাহায্য করেছে তা অনুমান করা চলে; অন্তত এসবের সাহায্যে অজ্ঞ জন-

১৩ "কৃত্তিবেসে, কাশীদেসে আর বামুন ঘেঁষে, এই তিন সর্ব্বনেশে;" এই উক্তিটি ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের "প্রাচীন বাংলা সাহিত্য" নামক পুস্তিকা থেকে তার "বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। পৃঃ ১০৪

সাধারণকে যে বঞ্চিত ও পদানত করে রাখার চেষ্টা হতো, তা ঐতিহাসিক অল বারুণির দৃষ্টি এড়ায়নি। প্রজ্ঞা-ধর্মী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করেন না, এ অভিমত ব্যক্ত করে তিনি বলেছেন যে, এইসব মূর্তি ও শালগ্রাম-শিলা প্রভৃতি অশিক্ষিত নিম্ন-শ্রেণীর লোকদের জন্য; পুরোহিতবর্গের নানা ছলচাতুরীতে জনসমষ্টিকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রাখা হয়—"Such ideas are made only for the uneducated, low-class people of little understanding.......The crowd is kept in thraldom by all sorts of priestly tricks and deceits." (১৪) তাতে ক্ষতিটা যে শুধু শ্রেণী বিশেষের হয়েছে তা নয়, সামগ্রিকভাবে সমাজ-জীবনও শক্তি হারিয়ে ফেলে।

এই সাংস্কৃতিক অধঃপতনের যুগে সুস্থ নীতিবোধ এবং কল্যাণের আদর্শ হারিয়ে গিয়েছিল। চৈতন্যদেবের সমকালীন মানুষ হীন স্বার্থবুদ্ধি ও বিষয়কর্মে নিমগ্ন ছিল বলে বৃন্দাবনদাস আক্ষেপ করেছেন, এবং তারা চৈতন্যদেব ও তার পরিষদদের সম্পর্কে কিরূপ হীন এবং কুৎসিত মতামত ব্যক্ত করত তিনি "চৈতন্যভাগবতে" বারবার তা উল্লেখ করেছেন। এইসব মন্তব্য যে শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করত তা এই কটি লাইন থেকে বুঝা যাবে।

কেহো বোলে "অরে ভাই! মদিরা আনিয়া।
সভে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া॥"

কেহো বোলে "অরে ভাই! সব হেতু পাইল
দ্বার দিয়া কীর্ত্তনের সন্দর্ভ জানিল॥
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চকন্যা আনে'।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা' সভার সনে॥
ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, মাল্য বিবিধ বসন।
খাইয়া তা' সভা সঙ্গে বিবিধ রমণ॥
ভিন্ন লোকে দেখিলে—না হয় তার সঙ্গ।
এতেকে দুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ॥"

....

১৪ অল বারুণি: ভারতবর্ষ, ১ম খণ্ড; পৃঃ ১২৩

যেনা ছিল রাজ্যদেশে আনিঞা কীর্ত্তন।
দুর্ভিক্ষ হইল—সব গেল চিরন্তন॥
দেবে হরিলেক বৃষ্টি—জানিল নিশ্চয়।
ধান্য মরি গেল, কড়ি উৎপন্ন না হয়॥

(মধ্যখণ্ড, ৮ম অধ্যায়)

এর কুৎসিত দিকটার কথা বাদ দিলেও লক্ষ্য করার বিষয় যে, দেশের দুর্ভিক্ষ অনাবৃষ্টির জন্যও তারা বৈষ্ণবদের দোষারোপ করছে, এবং 'কেহো বোলে "যদি ধান্যে কিছু মূল্য চড়ে। তবে এ-গুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে॥" (আদি খণ্ড, ১১শ অধ্যায়)। "চৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে (আদি খণ্ড) বৈষ্ণব বিরোধী গোপাল নামক ব্রাহ্মণের যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তাও এ-প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। চিন্তাজগতের এই বিকৃতির সংগে তৎকালীন ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের সামাজিক আচরণেও বিকৃতি ধরা পড়ে। এই কাহিনীটি তার সাক্ষ্য, "অদ্বৈত প্রভু একদিন তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া হরিদাস ঠাকুরকে পাত্রান্ন ভোজন করান। শ্রাদ্ধের পাত্রান্ন বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহাকেও ভোজন করাইতে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, কিন্তু হরিদাসকে ভক্তিগুণে ব্রাহ্মণ হইতেও অধিক মনে করিয়া অদ্বৈত প্রভু পাত্রান্ন ভোজন করান। তন্নিমিত্ত অদ্বৈত প্রভুর কুটুম্ব নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণমণ্ডলী ক্রুদ্ধ হইয়া সেইদিন ভোজন করিলেন না। ব্রাহ্মণ ভোজন না করায় অদ্বৈত প্রভু সবান্ধবে উপবাসী থাকিলেন এবং পরদিন অনেক বিনয় করায় ব্রাহ্মণগণ 'সিধা' হইতে স্বীকার করিলেন। অদ্বৈত প্রভু তাঁহাদিগকে সিধা দিলেন। সেই দিন বর্ষা হইল, এবং ব্রাহ্মণেরা পাক করিতে অগ্নি গ্রামে কাহারও গৃহে পাইলেন না, কোন স্থানে অগ্নি নাই, নিকটবর্ত্তী গ্রামেও অগ্নি ছিল না। তন্নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরা অদ্বৈত প্রভুর প্রভাব বুঝিয়া সপরিবারে ক্ষুধায় জন্য কাতর হইয়া অদ্বৈত প্রভুর নিকটে আসিয়া পূর্ব্বদিনের বাসী অন্ন খাইতে স্বীকার করিলেন।" (১৫) এই চিত্রে সুস্থ নীতি ও মর্যাদাবোধের অভাব এবং সাংস্কৃতিক অধঃপতনের ছাপ সুস্পষ্ট।

---

১৫ এই কাহিনীটি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুল-শাস্ত্র থেকে রাধিকানাথ গোস্বামী ও নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত "চৈতন্য-চরিতামৃতে" উদ্ধৃত হয়েছে; পৃঃ ২৩৩ (আদিলীলা)।

তাছাড়া, "শৈব বা শাক্ত সাধক সেকালে ফেৎকারিণী বা উড্ডামরেশ্বর তন্ত্রের উৎকট সাধনার সন্ধানে নিরত, কেহ বা 'কামধেনু'র সহযোগে 'মাতৃকা ভেদ' সমাধা করিয়া 'কুলার্ণবে' পার্থিব তনু ভাসাইবার উপকরণ সংগ্রহে ব্যাপৃত।......বামাচার ও বীরাচার মতের ক্রমশঃ অধঃপতনের ফলে প্রতিপক্ষকে 'পশ্বাচারী' সংজ্ঞা দিয়া সংজ্ঞারহিত 'বীর' সাধক ভ্রষ্টাচারে নিজেই বিকট পশুভাবে উত্থান করিয়াছেন। কৌল, দণ্ডী প্রভৃতিরাই প্রথম প্রথম চক্র করিয়া মকার সাধন করিতেন এবং ইহারই নাম দেওয়া হইয়াছিল 'মহাবিদ্যা'। শেষে অর্থাদিলোলুপ গৃহীও বামাচারীর সাহায্যে সাংসারিক ফললাভের আশায় অভিচার ক্রিয়াদি করাইয়া লইত।" (১৬)

এই সমস্ত অনাচার বুকে নিয়ে মধ্যযুগের বাংলা ব্রাহ্মণ্য সমাজ আত্মক্ষয় করে চলেছিল। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ বংশে যবন সংস্পর্শ দোষও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাই, এই সমাজের ওপর মুসলমান অভিযানের আঘাতটা একটু কঠোর বলেই অনুভূত হয়েছিল। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সমাজ বিধায়কগণ সচকিত হ'য়ে ওঠেন। ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও শাস্ত্রানুশাসনের অভিনব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সুরু হয়। রঘুনাথ, রঘুনন্দন এবং পরে দেবীবর প্রভৃতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সমাজ রক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন,—শাস্ত্রবিধানকে যুগোপযোগী করার ব্যবস্থা করেন, গুণবিচারে ব্রাহ্মণদের 'মেল' বন্ধন হয়, এবং এইসব সংস্কারের প্রভাব ব্রাহ্মণ্য সমাজের অন্তর্গত অন্যান্য বর্ণের মধ্যেও অনুভূত হয়। কিন্তু, এত সত্বেও ব্রাহ্মণ্য সমাজের ভাঙন এবং নব-মানবতার বিকাশের পথকে রোধ করা যায়নি। ভৌগোলিক সীমার মধ্যে জীবনকে সীমিত করে রাখা সম্ভব হয়নি।

ছয়

সমাজের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর অন্তরালে নিঃশব্দে রূপান্তর সংসাধিত হয়ে চলেছিল। মুসলমান বিজয়ের পর বিশেষ করে বাংলাদেশ মুঘল শাসনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে বাংলায় অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা বিনষ্ট

১৬ মধ্যযুগে বাঙ্গালা

হয়। বাংলা সর্বভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়। আর এই অর্থনৈতিক রূপান্তর ধীরে ধীরে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের উপরও নিঃসন্দেহে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। অবশ্য, সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা ভাঙার কাজ মুঘল বিজয়ের পূর্বে শ্রীচৈতন্যদেব আরম্ভ করেছিলেন।

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, এই সামন্ত সমাজের অন্তরেই দেখা দেয় শক্তিশালী ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদগত অঙ্কুর। ষোড়শ শতকে পর্তুগীজ পর্যটক বার্বোসা বাংলা সম্পর্কে লিখেছিলেন, "নানা দিগেদশ হইতে বহু লোক এখানে সমবেত হয়। ইহার মধ্যে আরব, পারসীক, আবিসিনীয় ও ভারতবাসী সবাই আছে। ইহারা বড় বড় ব্যবসায়ী। ইহাদের বড় বড় জাহাজ আছে, সেগুলি মক্কার জাহাজের ধরণে গঠিত; আবার জুংো নামে কথিত চীনা ধরণের প্রকাণ্ড জাহাজও আছে, সেগুলিতে অনেক মাল ধরে। এই সমস্ত জাহাজ লইয়া ইহারা চোলমন্দর, মালাবার, কাম্বে, পেগু, টেনাসেরিম, সুমাত্রা, সিংহল ও মলক্কায় বাণিজ্য করিতে যায়।" (১৭) তার অব্যবহিত পরেই পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকরা এদেশে সুদৃঢ় ঘাঁটি গড়িয়া তোলে। পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারে বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হ'লেও ঐ দস্যুরা স্বয়ং ছিল এক নব যুগের, নব সমাজ-সংগঠনের, অগ্রদূত; বণিক সভ্যতার বাহক। ইউরোপের এই গড়ে-ওঠতে-থাকা বণিক-সমাজ বাংলার গ্রাম্য জীবনকেও কতখানি তার আবেষ্টনীর মধ্যে টেনে নিয়ে চলেছিল, তা এই নজিরটি থেকে বুঝা যাবে; "...in the four years 1680-1683 taken together, a single European nation, the English, imported into Bengal silver worth £ 200,000 to pay for their purchases. The Dutch annual investment in Bengal was at least as large in amount as this, because they were firmly set in this province earlier than the English. Now, this English investment, at the then rate of exchange, amounted to four lakhs of rupees per annum, when the rupee had twenty times its

১৭ মধ্যযুগে বাঙলা গ্রন্থে উদ্ধৃত।

purchasing power of our own days". (১৮) অর্থাৎ, প্রাক্-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন টাকার পরিমাপে বাৎসরিক প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা একটি মাত্র ইউরোপীয় কোম্পানী বাংলাদেশের বাণিজ্যে নিয়োগ করেছিল। তার চেয়েও বড় কথা, বাংলা বহু দেশাগত বিচিত্র মানুষের মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সমাজতাত্ত্বিকরা যে পরিস্থিতিকে সাংস্কৃতিক যোগবিয়োগের সন্ধিস্থল বলে বর্ণনা করেন ষোড়শ শতকের পর থেকে বাংলাও সেই নব-রূপায়ণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েছিল। বিচিত্র দেশ থেকে বিচিত্র মানুষের আগমন, বিচিত্র তাদের চালচলন আচরণ, কণ্ঠে তাদের বিচিত্র সুর—তারই মেলামেশার ঐকতানে সৃষ্টি হয়ে চলেছিল নব মানুষের, নব মানবতার।

এই মানুষ যতটা না তার ধর্ম, জাত্যভিমান, দেশাচার ও দেশাচারগত বিধিনিষেধ দ্বারা পরিচালিত হয়, তার চেয়ে ঢের বেশী আকৃষ্ট হয় বহু মানুষের মেলামেশা সঞ্জাত ভাবতরঙ্গের প্রতি। লক্ষ্য তার স্বার্থ, পণ্যের লেনদেন থেকে লাভবান হওয়া; পাথেয় তার মেলামেশার মনোভাব, প্রীতি। এই গরজের টানে যখন সে অন্যের অভিজ্ঞতা ও কথাবার্তা চলনবলন আচারের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দেয়, তখন সে বিস্মিত হয়ে দেখে পারস্পরিক অভিজ্ঞতায় গড়মিলের চেয়ে ঐক্য বেশী। তাদের ইন্দ্রিয়াভিজ্ঞতা এক। ঐ একের খাতিরেই অজ্ঞাতসারে গড়মিলের বাধাগুলি ধীরে ধীরে খসে পড়ে, সে সংস্কারবর্জিত হয়ে বহু মানুষের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে। অর্থাৎ, বণিক-সমাজের অনুকূল নব মানবতার হয় বিবর্তন। তাছাড়া, ব্রাহ্মণ্য সংস্কার-সংস্কৃতির প্রভাব ছাপিয়ে বাংলার লোকমানসের বিবর্তন এবং গণজীবন ও সংস্কার-সংস্কৃতির জাগরণও এই বিবর্তনের সঙ্গে ছিল সম্পৃক্ত।

মধ্যযুগের বাংলায় এমনি ধরণের নব মানবতার বিবর্তন ধীরে ধীরে সংসাধিত হয়ে চলেছিল, আর এই পটভূমিতেই রচিত হয়েছিল বাংলার মঙ্গলকাব্য, আর বৈষ্ণব গীতিকবিতা।

---

১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত History of Bengal Voll. II.

মঙ্গল কাব্য

মঙ্গলকাব্যের ভাবাকাশ—ক ;
চণ্ডীমঙ্গল—খ ;
পদ্মাপুরাণ কাহিনী—গ ;
ধর্মমঙ্গল—ঘ ;
বিবিধ—ঙ

মঙ্গলকাব্যের ভাবাকাশ—ক

এক

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত সময় বাংলার মঙ্গলকাব্য সৃষ্টির কাল। বাংলার সমাজ-জীবনে যে সময়টা সাধারণভাবে মধ্যযুগ বলে আখ্যাত সেই যুগের বিচিত্র আবহাওয়ায় স্নান করেই মঙ্গলকাব্যগুলির আবির্ভাব। এই সুদীর্ঘকাল রাষ্ট্রীয় ওঠা-নামা, একটানা ভাঙ্গা আর ভাঙ্গা, এবং ভাঙ্গার কলুষ-স্পর্শ থেকে বাঁচার আকুল আকুতিতে মুখর। বিভিন্ন রাজা ও ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ আশ্রয়ী রাষ্ট্রের আসা-যাওয়া এবং সামাজিক আবর্তের কম্পন লৌকিক জীবনেই অনুভূত হয় সর্বাপেক্ষা বেশী। আর সামাজিক সংঘাত ও যুদ্ধবিগ্রহ মানুষের জীবন বা তার সমাজ-জীবনের কোন অঙ্গাবরণকেই কোনরূপ সম্মান বা ক্ষমা করে না বলেই মানুষের জীবনে যা কিছু মূল্যবান, যা কিছু কল্যাণকর, যা কিছু মাননীয় তা সমস্ত যায় নিঃশেষে ধূলিসাৎ হয়ে। আর এই ধ্বংসের ধূলি মেখেই মানুষ নিজেকে মনে করে অসহায়, এবং জীবনকে মনে করে দুর্বিষহ। কিন্তু এই অসহায়-চেতনা তার মধ্যে যত প্রবল হোক না কেন, মানুষের কাছে এর থেকেও বড় সত্য হ'লো যে সে মানুষ, এবং মানুষ হিসেবে তার জীবনের অবিশ্রান্ত সাধনা হলো নিজেকে সৃষ্টি করা, প্রতিকূল পরিবেশকে জয় করে নিজের পরিপূর্ণ শক্তি-সৌন্দর্যে নিজেকে উপলব্ধি করা। তাই তার পরাজয়ের দিনেও তার মধ্যে এই চেতনা বর্তমান। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসের সংগে এই চেতনা ও তার সার্থক প্রকাশ অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে আছে।

মঙ্গলকাব্যগুলির মূল সুরের মধ্যে তার অভিপ্রকাশ রয়েছে। অধিকাংশ মঙ্গলকাব্য উদাসীন শিবের প্রভাবের বিরুদ্ধে শক্তির প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে রচিত। আর্য-সমাজের বাইরে অন্ত্যজ জাতিদের মধ্যে শিবের প্রতিষ্ঠা

দেখা যায় কৃষি-দেবতা রূপে;) তিনি কুবেরের কাছ থেকে সামান্য ধান মূলধন রূপে গ্রহণ করে জমি চাষ করছেন, বা চাষবাসের নির্দেশ দিচ্ছেন, জমি থেকে মশা এবং জোঁক ইত্যাদি তাড়িয়ে কৃষকদের সাহায্য করছেন। (আর এই সামাজিক ক্রিয়া সম্পাদনের পর বাকী অবসর তাঁর কাটে নানাবিধ কৌতুকে এবং কাম-চর্যায়। সামাজিক দিক থেকে সর্বনিম্ন জাতি এবং সামাজিক উৎপাদনের দিক থেকে সর্বনিম্ন শ্রেণীর দেবতা বলে তাঁর উপর সমস্ত নীচ প্রবৃত্তি ও গুণ আরোপিত হয়েছে, এবং এই সমস্ত গুণের সংগে মিলিত হয়েছে তাঁর একান্ত দরিদ্র নিঃস্ব সহায়সম্বলহীন অবস্থা। তাই যদিও তিনি দেবতা-রূপে সমস্ত সৃষ্টির আদিতে, তথাপি তাঁর চালচলন বলনকথন সাজসজ্জা ইত্যাদি সবই নিম্নশ্রেণীর। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, যাদের দেবতা বলে তিনি চিত্রিত, তাদের বাস্তব জীবনেরই নানা কাহিনী ও চিত্র ও গুণ দেবতায় প্রতি-ফলিত হয়েছে। একটি পুরাতন গোরক্ষবিজয় থেকে শিব সম্পর্কিত নিম্ন বর্ণনাটি দীনেশ সেনের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে:

ভাঙ খাইবে ধুত্‌রা খাইবে খাইবে ভাঙ্গের গুড়া।
পিরথিমি মজলে শিব না হইবে বুড়া॥)
ভাঙ্গ খাইবে ধুতরা খাইবে খাইবে শতাবরি (?)
দিবারাত্রি থাকবে তুইন কুচনারীর বাড়ী॥
ষোলশ কুচনীর মধ্যে একলা ভুলানাথ।
অপেক্ষা না মিট্‌বে তব কামিনীর সাঁত॥
শ্মশানে মশানে থাকবে মাখবে ভস্ম ছালি।
সগলে ডাকবে তবে পাগলা শিব বলি॥
ভূত পেরেতের লগে একত্রে করবে বাস।
অঘোর সাগরে পইড়া থাকবে বারমাস॥
বলদের কান্ধে উঠবে পিন্‌বে বাঘের ছাল।
কুচনীর পাড়াতে থাক্যা কাটাইও কাল॥

আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যবিচারে এই বিবরণের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সন্দেহ করা গেলেও লৌকিক শিবের লৌকিক জীবনের পরিচয় এতে রয়েছে। মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতেও অতিরিক্ত কামাসক্ত শিবের রুচিবিরোধী কার্যের বিবরণ

দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য, খণ্ডিত শিব-শক্তির উপর মনসার প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা মনসামঙ্গল কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ায় সেই উদ্দেশ্যের খাতিরে শিব-চরিত্রে একটু বেশী কালিমা-রেখা পড়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তথাপি তিনি যে কলুষ-কালিমায় নিমগ্ন তা অনস্বীকার্য। এ ছাড়াও তাঁর আরও দোষ তিনি উদাসীন, অনাসক্ত, কর্মভোলা এবং আপনভোলা। এমন কি, তাঁর নিজস্ব যা অবলম্বন এবং যে কর্ম ও শিল্পের দেবতারূপে তিনি পূজিত, সেই কৃষিকর্মও তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে ভুলে থাকেন; অর্থাৎ জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় উৎপাদন থেকেও তিনি বিরত থাকেন। এই হলো তাঁর সাধারণ রূপ। এর সংগে পৌরাণিক শিবের শান্ত-সমাহিত ভাবাকাশ মিলিত হয়ে শিবকে একান্তই কর্মবিমুখ নিরুৎসাহ উদাসীন দেবতায় রূপায়িত করে। জীবন যখন নিরুপদ্রব, শান্ত ও ভাবনাহীন, তখন এই অনাসক্ত ঔদাসীন্য বিশেষ কোন ক্ষতি করে না; অচঞ্চল কাল-প্রবাহের সংগে উৎসাহহীন জীবনপ্রবাহ তাল ফেলে চলে যায়। কিন্তু এই সহজ-চলা প্রবাহ, যখন অস্বাভাবিক অদৃষ্টপূর্ব প্রতিকূল অবস্থার আঘাতে কেঁপে ওঠে এবং জীবনকে প্রচণ্ড দাপটে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়, তখন এই আত্মভোলা ঐশ্বর্যের উপর নির্ভর করা কঠিন। মানুষের মধ্যে জীবনকে ঘোষণা করার, প্রতিকূল পরিবেশের দুর্দৈব থেকে আত্মরক্ষা করার, যে সহজ প্রবৃত্তি আছে তা নিজেকে প্রকাশ করতে চায়, কিন্তু নিষ্ক্রিয় জীবনদর্শন ও আরাধ্য দেবতা তার পথ আটকিয়ে থাকে। তখনই আঘাতের স্পর্শে সৃষ্ট নতুন ব্যক্তি-সত্তার সংগে পুরাতন সত্তার অন্তর্বিরোধ দেখা দেয়; মানুষের নিজস্ব সত্তা যেন বিরোধী দুটো সত্তায় বিভক্ত হয়ে যায়—এক, তার পুরাতন ভাবাদর্শের প্রতি আকর্ষণ, দুই সৃষ্টি-চেতনায় উন্মুখ নতুন। এই দুয়ের সংঘাত থেকেই নতুন ব্যক্তি-সত্তার আবির্ভাব। এই সংঘাতে পরিবেশের সংগে খাপ-না-খাওয়া পুরাতন আদর্শ আপনাকে বাঁচাতে পারে না; মধ্যযুগের ঝড়-ঝঞ্ঝায় বিপর্যস্ত আবহাওয়ায় শিব তাই বেমানান। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "বস্তুত সাংসারিক সুখদুঃখ-বিপদসম্পদের দ্বারা নিজের ইষ্টদেবতার বিচার করিতে গেলে, সেই অনিশ্চয়তার কালে শিবের পূজা টিঁকিতে পারে না। অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার তরঙ্গ যখন চারিদিকে জাগিয়া উঠিয়াছে, তখন যে-দেবতা ইচ্ছা-সংযমের আদর্শ, তাহাকে সাংসারিক

উন্নতির উপায় বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। দুর্গতি হইলেই মনে হয় আমার নিশ্চেষ্ট দেবতা আমার জন্ত কিছুই করিতেছেন না, ভোলানাথ সমস্ত ভুলিয়া বসিয়া আছেন। চণ্ডীর উপাসকরাই কি সকল দুর্গতি এড়াইয়া উন্নতি-লাভ করিতেছিলেন? অবশ্যই নহে। কিন্তু শক্তিকে দেবতা করিলে সকল অবস্থাতেই আপনাকে ভুলাইবার উপায় থাকে। শক্তিপূজক দুর্গতির মধ্যেও শক্তি অনুভব করিয়া ভীত হয়, উন্নতিতেও শক্তি অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে। আমারই প্রতি বিশেষ অকৃপা, ইহার ভয় যেমন আত্যন্তিক, আমারই প্রতি বিশেষ দয়া, ইহার আনন্দও তেমনি অতিশয়। কিন্তু যে দেবতা বলেন, সুখ-দুঃখ, দুর্গতি-সদ্গতি, ও কিছুই নয়, ও কেবল মায়া, ও-দিকে দৃক্‌পাত করিয়ো না, সংসারে তাঁহার উপাসক অল্পই অবশিষ্ট থাকে;—সংসার, মুখে যাহাই বলুক, মুক্তি চায় না, ধন-জন-মান চায়। ধনপতির মতো ব্যবসায়ী লোক সংযমী সদাশিবকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিল না, বহুতর নৌকা ডুবিল, ধনপতিকে শেষকালে শিবের উপাসনা ছাড়িয়া শক্তি উপাসক হইতে হইল।" (১) লৌকিক মানুষ তাই শিবকে পরিত্যাগ করে শক্তিকে গ্রহণ করে—শক্তি, ক্ষমতা যার কোন সীমায় ধরা যায় না, ইচ্ছা-অনিচ্ছা যার কোন নিয়ন্ত্রণ মানে না, যা সহজেই মানুষকে সর্বোচ্চ চূড়ায় ওঠাতে পারে, আবার তেমনি সহজেই অতল গহ্বরে ডুবাতে পারে। এমনি এক শক্তির কল্পনা করে এবং তার অপ্রতিহত প্রভাবের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে মানুষ তার পরিবেশের বিপর্যয় এবং আঘাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে, সেই পরিবেশকে জয় করার চেষ্টা করেছে। এই শক্তির আরও একটা দিক আছে, সেটা হলো সৃষ্টির, এই শক্তি মেয়ে দেবতা, তাই প্রচণ্ড হলেও তা মাতৃ-রূপা। আর মাতৃরূপে দেবতার কল্পনার মাধ্যমে মানুষ তার অন্তর্নিহিত সৃষ্টি ও লালনপালন প্রেরণারই সংগঠিত রূপের অভিব্যক্তি দিয়েছে। তাই শক্তি-কল্পনার মধ্যে মানুষের দুটো সহজাত প্রবৃত্তি পরিশোধিত রূপে প্রকাশ লাভ করেছে,—এক দিকে তার বাঁচার আকূতি, আত্মরক্ষার ও সেজন্য প্রয়োজনীয় সংগ্রামের প্রেরণা এবং অন্যদিকে সৃষ্টি ও পালনের আকূতি। আর এই দুই প্রেরণার সংযুক্ত অভিপ্রকাশের ভিতর দিয়ে মানুষ নিজেকেই প্রকাশ করেছে, প্রকাশ করেছে

---

১ সাহিত্য; পৃঃ ১৪৬।

তার মনোগত ভাবকে যে সে মানুষ, এবং মানুষ হিসেবে তার জীবনের অব্যক্ত লক্ষ্য হলো, নিজেকে উপলব্ধি করা।

মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ একটি উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তাঁর কথায়, "কবিকঙ্কণে দেবী এই যে ব্যাধের দ্বারা নিজের পূজা মর্তে প্রচার করিলেন, স্বয়ং ইন্দ্রের পুত্র যে ব্যাধরূপে মর্তে জন্মগ্রহণ করিল, বাংলা দেশের এই লোকপ্রচলিত কথার কি কোন ঐতিহাসিক অর্থ নাই? পশুবলি প্রভৃতির দ্বারা যে ভীষণ পূজা এককালে ব্যাধের মধ্যে প্রচলিত ছিল, সেই পূজাই কি কালক্রমে উচ্চ সমাজে প্রবেশ লাভ করে নাই? কাদম্বরীতে বর্ণিত শবর নামক ক্রূরকর্মা ব্যাধজাতির পূজা-পদ্ধতিতেও ইহারই কি প্রমাণ দিতেছে না?" (২) অবশ্য এই প্রশ্নের মধ্যেই এর উত্তর বহুলাংশে নিহিত রয়েছে। এই ইতিহাসকে আরও সহজ সুন্দরভাবে বুঝতে পারি যদি মনে রাখি যে বাংলার আর্যীকরণ নিতান্ত নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়নি। আর্যব্রাহ্মণদের নিকট বাংলার আর্যেতর অধিবাসীরা চিরকালই অত্যন্ত ঘৃণিত নিন্দিত ছিল; কিন্তু তা সত্বেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে এই অনার্য অধিবাসীরাও নিজেদের কৃষি-ভিত্তিক সভ্যতাসংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল, এবং তার মান সেকালে আর্য সংস্কৃতির থেকে খুব নীচু ছিল না। তাই আর্যব্রাহ্মণরা বাংলাকে শুধু দেয়ইনি, গ্রহণও করেছে। এই দেওয়া-নেওয়ার ভেতর দিয়ে বাংলার একটা সম্মিলিত সংস্কৃতি বিকাশলাভ করছিল, এবং কালের অগ্রগমনের সংগে সংগে লৌকিক প্রভাবটাই যে প্রবলতর হচ্ছিল তার স্বাক্ষর রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। বাঙালী পালচন্দ্র রাজাদের আমল থেকে দেশের রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও ভাবাকাশে লৌকিক জীবনের কম্পন অনুভূত হতে আরম্ভ করে; এবং তার অব্যবহিত পরে ভিন্‌দেশাগত সেন-বর্মণ রাজাদের আশ্রয় করে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলেও তা লৌকিক জীবনের স্বপ্রকাশকে রোধ করতে পারেনি—প্রাদেশিক বাংলা ভাষার বিবর্তন, চর্যাগীতি এবং চর্যাগীতিতে রূপায়িত লোক-জীবনের চিত্র, ভাব ইত্যাদি তার প্রমাণ; আর এই লোকজীবন ও লৌকিক ভাবাকাশের প্রভাবে জয়দেবকেও বিদ্রোহী কবি হ'তে হয়েছিল। বাংলার মধ্যযুগ লৌকিক জীবনের জাগরণ ও অভিব্যক্তিতে চঞ্চল ও মুখর। এই জাগরণ ব্রাহ্মণ্য সংস্কার-সংস্কৃতির কিছুটা স্বীকার করে কিছুটা অস্বীকার করে আত্মপ্রকাশ করে। আর এও স্বীকার্য যে,

২ সাহিত্য; পৃঃ ১৪৬।

এই স্বীকার-অস্বীকার একটা মূলগত সংঘাতের ফল ; এই সংঘাত ব্রাহ্মণ্য আদর্শের বিরুদ্ধে লৌকিক আদর্শের সংঘাত, ব্রাহ্মণ্য জীবন-দর্শনের সংগে লৌকিক জীবন-দর্শনের সংঘাত। তাই শিবের বিরুদ্ধে শক্তির সংগ্রামের মধ্যে একটা দ্বি-মুখীভাবের ব্যঞ্জনা রয়েছে; একদিকে তা অনাসক্ত কর্মভোলা লৌকিক দেবতা শিবের বিরুদ্ধে সক্রিয় শক্তির সংগ্রাম, অপরদিকে তা পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আদর্শে অঙ্কিত মনোধর্মী শিবের বিরুদ্ধে প্রাণধর্মী শক্তির বিদ্রোহ। আধিভৌতিক ক্ষেত্রে এই শিব-শক্তির কলহের বাস্তব সামাজিক রূপ দেখতে পাই সামাজিক উচ্চ ও নিম্ন বর্ণের বিরোধের মধ্যে; অথবা অন্য কথায় বলা যায়, সামাজিক ক্ষেত্রে উচ্চ ও নিম্ন বর্ণের মধ্যে প্রতিনিয়ত যে সংগ্রাম চলে, তা-ই আধিভৌতিক ক্ষেত্রে শিব-শক্তি সংগ্রামের রূপকের মাধ্যমে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। সামাজিক শক্তিসমূহের মধ্যে এই যে বিরোধ ও সংঘাত তা যে সর্বদাই নির্দিষ্ট সুস্পষ্টরূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, তা নয়, অনেক সময়েই তার প্রকাশ অত্যন্ত জটিল ও সূক্ষ্ম। রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যে তার নিদর্শন পাওয়া যাবে : "শঙ্করাচার্যের ছাত্রগণ যখন বিদ্যাকেই প্রধান করিয়া তুলিয়া জগৎকে মিথ্যা ও কর্মকে বন্ধন বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছিলেন—তখন সাধারণে মায়াকেই, শান্তরূপের শক্তিকেই মহামায়া বলিয়া শক্তীশ্বরের ঊর্ধ্বে দাঁড় করাইবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। মায়াকে মায়াধিপতির চেয়ে বড়ো বলিয়া ঘোষণা করা, এই এক বিদ্রোহ।.. ব্রহ্মের সহিত জগৎকে ও আত্মাকে প্রেমের সম্বন্ধে যোগ করিয়া না দেখিলে হৃদয়ের পরিতৃপ্তি হয় না। তাঁহার সহিত জগতের সম্বন্ধ স্বীকার না করিলেই জগৎ মিথ্যা—সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই জগৎ সত্য। যেখানে ব্রহ্মের শক্তি বিরাজমান, সেইখানেই ভক্তের অধিকার, যেখানে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সেখানে ভক্তির মাৎসর্য উপস্থিত হয়। ব্রহ্মের শক্তিকে ব্রহ্মের চেয়ে বড়ো বলা ভক্তির মাৎসর্য—কিন্তু তাহা ভক্তি,—শক্তির পরিচয়কে একেবারে অসত্য বলিয়া গণ্য ও তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিমুখ হইবার চেষ্টা করাতেই ক্ষুব্ধ ভক্তি যেন আপনার তীর লঙ্ঘন করিয়া উদ্বেল হইয়াছিল।" এর মধ্যেই দুটো মনের দুটো দৃষ্টির বিরোধ অনুভব করা যায়।

এই জগৎকে সত্য বলে স্বীকার করেই লৌকিক মানস আবর্তিত হয়। জগৎ সম্পর্কে এই ধারণায় অবশ্য তাকে কোনরূপ আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক

আলোচনার সাহায্যে উপনীত হতে হয় না; তার কর্মের মাধ্যমেই মানুষ জগৎকে সত্য বলে জানে। আর তার মনও এই নিত্য জগৎকে অবলম্বন করে আবর্তিত হয়। তাই তার দেবতা-কল্পনার মধ্যেও বাস্তব সংসারের ছাপ ও নিয়ন্ত্রণ সুস্পষ্ট। (প্রতিনিয়ত মানুষকে যে সব প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রবৃত্তির শাসনাধীনে থেকে জীবনের সংগ্রাম চালাতে হয় সেইসব অনিয়ন্ত্রিত শক্তির নিকট পরাভূত হয়েই সে আধিভৌতিক চিন্তায় ধাবিত হয় এবং সেই শক্তিরই একটা মানবিক দেহ-রূপ কল্পনা করে তার কৃপা প্রার্থনা করে।) সহজ ও সমৃদ্ধ কৃষি-কর্মের জন্য তাই একজন কৃষি-দেবতার প্রয়োজন, নবজাত শিশুদের জীবন রক্ষা ও লালন-পালনের জন্য তাই ষষ্ঠীদেবীর কল্পনা; পার্থিব সুখসম্পদ ও অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য সর্বপ্রকার বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য তাই মঙ্গলচণ্ডী ও সত্যনারায়ণের আবির্ভাব, রোগ-শোক নিবারণের জন্য, নিঃসন্তান মাকে সন্তানদানের জন্য এবং অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টিদানের জন্য, তাই মানুষ ধর্মঠাকুরের পূজা করে। আর বাঘ ও সাপের ভয়ে ভীত মানুষ 'দক্ষিণরায়' ও 'মনসাদেবীর' পূজা করে, বাঘ ও সাপের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। (সমস্ত লৌকিক দেবতারই উদ্ভবের কাহিনী এই। এর একমাত্র অর্থ যে, মানুষের মন সর্বদাই বিষয়-চেতনায় নিমগ্ন; এই বিষয়কে কর্ষণ করে কি ভাবে রূপায়িত করে মানুষের ভোগৈশ্বর্যে নিয়োজিত করা যায়, সে চিন্তায়ই তার মন ব্যাপৃত। এই ভোগের দৃষ্টিতে দেখা জীবনের একটা সুন্দর চিত্র আছে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ণ গ্রন্থে। যথা,

তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দু'টি সুতে সপ্ত মুখ পঞ্চমুখ পতি॥
তিন জন একুনে বদন হইল বার।
গুটি গুটি দু'টি হাতে যত দিতে পার॥
তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায়॥
এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়॥
দেখি দেখি পদ্মাবতী বসি এক পাশে।
বদনে বসন দিয়া মন্দ মন্দ হাসে॥
সুক্ত খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া শাকে।
অন্ন আন অন্ন আন রুদ্র মূর্তি ডাকে॥)

কার্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য ধরে খা॥
মূষগ মায়ের বোলে মৌন হয়ে রয়।
শঙ্কর শিখায়ে দেয় শিখিধ্বজ কয়॥
হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে।
ঈষদুষ্ণ সুপ দিল বেশরির পরে॥
শঙ্কর বলেন শুন নগেন্দ্রের ঝি।
সুপ হইল সাঙ্গ আন আর আছে কি॥
দড় বড় দেবী এনে দিল ভাজা দশ।
খেতে খেতে গিরিশ গৌরীর গান যশ॥

এই চিত্র নিঃসন্দেহে দারিদ্রের করুণ রসে আপ্লুত, কিন্তু এই করুণ রসের মধ্যেও একটা অনাবিল মাধুর্য সংমিশ্রিত হয়েছে। সে মাধুর্য হলো শঙ্করের চাওয়া ও গৌরীর দেওয়ার মধ্যে। জীবনে ভোগের আনন্দ, চাওয়ার আনন্দ এতই তীব্র যে দরিদ্র স্বামী দরিদ্র গৃহিণীকে জেনে শুনে বিপদে ফেলে তা থেকে আনন্দ কুড়িয়ে নিতে কুণ্ঠিত নন। এই যে নিঃশঙ্ক নির্মল চাওয়া, ইহাই জীবনের অভিব্যক্তির মূল কথা, আর গৌরীর অক্ষয় ভাণ্ডার থেকে অফুরন্ত অনন্ত পাওয়ার মধ্যেই এর সার্থকতা। এই চাওয়া-পাওয়ার মধ্যেই লৌকিক মনের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ।

তাই তাদের মন সাধারণ পৃথিবীতেই আবদ্ধ; সুখ স্বাস্থ্য ধন সমৃদ্ধি শান্তি, শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা ইত্যাদি পার্থিব কামনাতেই তাদের মন সংগঠিত। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের "শিব-মঙ্গল" কাব্যে দেখতে পাওয়া যায়, শিব কৃষি কর্মের জন্য বিশ্বকর্মাকে দিয়ে তার ত্রিশূল ভাঙিয়ে জোয়ালি, কোদাল, ফাল ইত্যাদি চাষের সরঞ্জাম তৈরী করাচ্ছেন:

ঈশ্বরীর ইচ্ছায় বিশাই পায় পড়ে।
লাঙ্গল জোয়ালি মই সত্ত্ব দিল গড়ে॥
পূর্ব্বে পরামর্শ ছিল পার্ব্বতীর সাথে।
শূলে হতে শূলী শূল দিল তার হাথে॥
শাল পাতি শূল ভাঙ্গি সজ্জা কর বসি।
জোয়ালি কোদাল ফাল দা উখুন পাশী॥

তৌলে ক'রে শূলে ধরে তৌলিল তখন।
ঠিক্‌সারা হৈল খাড়া দু'শ দশ মণ॥
কায় কত দিব? দিবে যায় যত সয়।
বিবরিয়া বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বনাথে কয়॥
পাঁচ মণে পাশী করি আশী মণে ফাল।
দু মণের দু জলুই অর্দ্ধেকে কোদাল॥
দশ মণের দা অষ্ট মণের উখুন।
দু'শ দশ মণ দেখ করিয়া একুন॥
বুঝে পশুপতি অনুমতি দিলা তারে।
বিশাই বসাইল শাল শিবের গোচরে॥

'শূন্য পুরাণ' গ্রন্থে ভিক্ষাজীবী শিবের কৃষি-কর্ম গ্রহণের সংকল্প বর্ণনায় বলা হয়েছে

আহ্মর বচনে গোসাঞি তুহ্মি চসবাস।
কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস॥
পুখরী কাঁদাএ লইব ভুম খানি।
আরসা হইলে জেন ছিচএ দিব পানি॥
আর সব কিসান কাঁদিব মাথে হাত দিআ।
পরম ইচ্ছাএ ধান্য আনিব দাইআ॥
ঘরে ধান্য থাকিলেক পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নর বিহনে পরভু কত দুখ পাব॥
কাপাস চসহ পভু পরিব কাপড়।
কতনা পরিব গোঁসাই কেওদা বাঘর ছড়॥
তিল সরিসা চাষ কর গোঁসাই বলি তব পাএ।
কতনা মাখিব গোঁসাঞি বিভূতিগুলা গাএ॥
মুগ বাটলা আর চসিহ ইখু চাস।
তবে হবেক গোঁসাই পঞ্চামৃতর আস।
সকল চাস চস পরভু আর রুইও কলা।
সকল দ্রব্য পাই যেন ধর্ম পূজার বেলা।

চাষের যে ফর্দ দেওয়া হয়েছে তাতে প্রাত্যহিক জীবনের গরজের ছাপ সুস্পষ্ট; এই গরজ মিটানোর জন্যই তাদের সমস্ত ভাবনা-কল্পনা-কামনা। শিব বা শক্তি উপাসনা যা-ই হোক তার ভিতর দিয়ে মানুষ এই কামনার চিত্রই এঁকেছে; অবশ্য এই কামনার সংগে স্বর্গ বা মোক্ষলাভের কামনাও সংযুক্ত হয়েছে। নিঃসন্দেহ যে, এটা পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কার-সংস্কৃতির প্রভাব। কিন্তু একথাও স্মরণযোগ্য যে, পার্থিব জীবনের দুঃখদুর্দশা দৈন্যের আঘাতে ম্রিয়মান হয়েই মানুষ এ থেকে মুক্তির আশা করে বা স্বপ্ন দেখে; কিন্তু এই আশা ও স্বপ্নের মধ্যে প্রকারান্তরে যে জীবনের বা ভোগের, পার্থিব পরিতৃপ্তি ও সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত হচ্ছে তাও অনস্বীকার্য। উপরোক্ত বর্ণনার সংগে বাংলার মেয়েলি ব্রতকথার এই কামনাকে মিলিয়ে পড়া যেতে পারে :

কোদাল-কাটা ধন পাব,
গোহাল-আলো গোরু পাব,
দরবার-আলো বেটা পাব,
সভা-আলো জামাই পাব,
সেঁজ-আলো ঝি পাব,
আড়ি-মাপা সিঁদুর পাব।
ঘর করব নগরে,
মরব গিয়ে সাগরে,
জন্মাব উত্তম কুলে,
তোমার কাছে মাগি এই বর—
স্বামী পুত্র নিয়ে যেন সুখে করি ঘর।' (৩)

এই দুটো বর্ণনার মূল সুর এক; এবং এই কামনার উৎস-কেন্দ্রও এক। বস্তুজগতের এই বলিষ্ঠ স্বীকৃতি, জীবনকে অখণ্ড চাওয়া ও পাওয়ার আনন্দে ভরে দেওয়ার ইচ্ছা, ভোগৈশ্বর্যের দৃষ্টিতে সংসারের দিকে তাকানোর মনোভাব অর্থাৎ এক কথায় প্রাণধর্মী জীবনদর্শনই মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে রূপায়িত হয়েছে।

কিন্তু এই প্রাণধর্মিতার স্বীকৃতি পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে অনুপস্থিত। তাই দেখতে পাওয়া যায়, সেন-আমলের ভাবাকাশ যাগযজ্ঞহোমাগ্নিতে ও

৩ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে উদ্‌ধৃত।

মন্ত্রগুঞ্জনে আলোকিত ও মুখরিত। সুতরাং ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রমের বাইরের অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের এবং বর্ণাশ্রমের অভ্যন্তরে স্থান-পাওয়া সামাজিক নিম্নবর্ণের প্রাণ-ধর্মিতাকে যদি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয়, তাহলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং সংগ্রামে জয়ী হয়ে তাকে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে। মধ্য-যুগের বাংলা সাহিত্যে এই যে অব্রাহ্মণ্য জীবন-দর্শন ও সংস্কৃতির সগৌরব প্রতিষ্ঠা দেখা যায়, তাতে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় যে, সেকালে বাংলার আর্যেতর জনসমষ্টির ভাবধারা ও জীবনাদর্শ সামাজিক প্রাধান্য অর্জন করতে আরম্ভ করেছিল; এবং সেজন্যই আর্য-সংস্কৃতির মধ্যে তার অনুপ্রবেশ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এই সংঘাত ভাবগত এবং আদর্শগত সংঘাতেই মুখ্যত রূপ পেয়েছে—অনাসক্ত শিবের বিরুদ্ধে শক্তির সংঘাত। কিন্তু এই বিরোধী আদর্শগুলোকে আশ্রয় করে আছে পরস্পরবিরোধী সামাজিক শ্রেণী বা বর্ণ। তাই সংঘাতটা বাস্তব সামাজিক ক্ষেত্রেও অনুভূত হয়েছে; ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সংঘাতে জয়পরাজয়ের অর্থ সামাজিক মর্যাদায় শ্রেণী বা বর্ণ বিশেষের উত্থান অথবা পতন, অথবা বিজয়ী শ্রেণীর বা বর্ণের প্রচলিত সামাজিক সংস্থায় স্বীকৃতিলাভ। চণ্ডীমঙ্গলে দেখা যায়, চণ্ডীর দয়ায় নিম্নবর্ণ বা অনার্য ব্যাধ উচ্চাসন লাভ করেছে, দেবী ব্যাধকে দিয়ে তাঁর পূজার প্রবর্তন করছেন এবং স্বয়ং ইন্দ্রের পুত্র ব্যাধরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করছে। তার ইঙ্গিত স্পষ্ট, তা হলো অবনমিত সম্প্রদায়ের উপরে ওঠার ইতিহাস। অপর-দিকে চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতি সওদাগরকে দিয়ে এবং মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগরকে দিয়ে চণ্ডী ও মনসাদেবী পূজা আদায় করছেন। বণিক সম্প্রদায়কে দিয়ে অনার্য মেয়ে দেবতা পুজো আদায় থেকে মনে হয় যে, তৎকালীন সমাজে বণিক সম্প্রদায় সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল, অথবা এই সম্প্রদায়ই ছিল ব্রাহ্মণ্য সংস্কার-সংস্কৃতির প্রধান সহায়ক ও ধারক। অবশ্য কথিত আছে যে, সেন-আমলে বণিক ও অন্যান্য ধনোৎপাদক সম্প্রদায়ের সামাজিক মর্যাদার হানি হয়েছিল; কিন্তু মঙ্গলকাব্যগুলোর আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য মানতে হলে স্বীকার করতে হয় যে, পরবর্তীকালে তারা হৃত মর্যাদা ও প্রভাব পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিল। তাই তাদের দিয়ে অনার্য দেবতা ও দেবতার অন্তরালে অনার্যদের সামাজিক স্বীকৃতিলাভের এত প্রবল চেষ্টা। সুতরাং মঙ্গলকাব্য রচনার পেছনে গভীর সামাজিক উদ্দেশ্য নিহিত ছিল।

মঙ্গলকাব্যের শক্তিমাহাত্ম্য প্রচারের সংগে লৌকিক জীবনের কাহিনী অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশ্রিত রয়েছে; তাই বলা যায়, এদের ভাবাকাশ অত্যন্ত বাস্তব। সেইকালে এবং স্থানে যে জীবন নিজেকে সৃষ্টি করেছিল, এবং যে ভাবে সৃষ্টি করেছিল, কবির সরল সজীব দৃষ্টি তা-ই তার বর্ণনার রেখায় রেখায় তুলে ধরেছে। কবি চোখ দিয়ে যা দেখেছেন, হৃদয় দিয়ে যা অনুভব করেছেন, ব্যাপক জীবনবোধ দিয়ে যা বুঝেছেন তা-ই কাব্যে ভাষা পেয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনের সুখদুঃখ আশানিরাশা ব্যথাবেদনা এবং প্রচলিত জীবনের সামগ্রিক প্যাটার্ণ তাই অবশ্যম্ভাবীরূপে কাহিনীর সংগে রূপ পেয়েছে। এই সব বর্ণনা থেকে এবং সমস্ত খণ্ড খণ্ড চিত্রকে অবলম্বন করে মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক জীবনের একটা অখণ্ড চিত্র সৃষ্টি করা চলে। অনার্য দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার এবং অনার্যের সামাজিক স্বীকৃতি বিধানের উদ্দেশ্যের সংগে অনেক বঞ্চনা অনেক নিরাশা অনেক ব্যর্থতায় ম্রিয়মান জীবনকে উন্নীত করার গোপন আশাও সম্ভবত কবি-মানসে উপস্থিত ছিল। আর সেই আশা থাক বা না থাক এই সব খণ্ডচিত্র এবং কাহিনীর ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে একটা সত্য, সামাজিক জীবনের সত্য; এই সত্যতার মধ্যেই তার মর্যাদা এবং মাধুর্য দুই-ই। এই সত্যতার অভাব হলে তার উদ্দেশ্যও সম্ভবত ব্যর্থ হতো।

এই দুই বিরোধী জীবনাদর্শ ও শক্তির সংঘাতের ভিতর দিয়ে মানুষ নতুন এক সংশ্লেষে উপনীত হচ্ছিল; অবশ্য এই সংশ্লেষের পেছনে সচেতন কর্ম বা ভাব ছিল কিনা বলা কঠিন, কিন্তু কোন সজ্ঞান ক্রিয়া বর্তমান না থাকলেও এই সংশ্লেষ সাধিত হয়েছে, কারণ তা ছিল অপরিহার্য। এর ফলে বাঙালী চরিত্র শুধু মাত্র মনোধর্মী আর্যের বৈশিষ্ট্য দিয়ে গড়ে ওঠে নি, বা শুধুমাত্র প্রাণ-ধর্মী অনার্য বৈশিষ্ট্য দিয়েও নয়, গড়ে উঠেছে দুয়ের সংমিশ্রণে। বাঙলার জাতীয় সমাজ-জীবন বিশুদ্ধ আর্য বা অনার্য নয়, মিশ্রিত; আর পারস্পরিক প্রভাবে ধর্মমত দেবদেবী কল্পনা এবং উপাসনার পদ্ধতিও নানাভাবে পরিমার্জিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য আচার-আচরণে অ-ব্রাহ্মণ্য আচার-আচরণ এবং অ-ব্রাহ্মণ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব তাই অতি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। লৌকিক দেবদেবী কল্পনার সংগে তাই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ভাবধারা অনায়াসে মিশতে পেরেছে। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস কার আশুতোষ ভট্টাচার্য মনসাদেবী সম্পর্কে বলেছেন, "অত্যন্ত প্রাচীন কাল হইতেই এই পূর্ব ভারতীয় বৌদ্ধ সমাজে জাঙ্গুলী দেবীর

পূজা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনার সূত্রগ্রন্থ 'সাধন মালা'তে এই জাঙ্গুলী দেবীর পূজার প্রকরণ ও তাহার মন্ত্রের সম্বন্ধে বিস্তৃত উল্লেখ রহিয়াছে। তাহা হইতে সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে, এই জাঙ্গুলী দেবী বর্ত্তমান বাংলার সমাজে পূজিতা সর্পদেবী মনসা হইতে প্রায় অভিন্ন।" (৪) অপর পক্ষে, পদ্মাপুরাণের কাহিনী মহাভারতের আদিপর্বের নাগকাহিনীর উপর স্থাপিত। চণ্ডী সম্পর্কে বলছেন, "চণ্ডীমঙ্গলের কতকগুলি বিষয় হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যোগ-তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রভাবিত সমাজেই এই দেবতার পূজার বিশেষ বিস্তার লাভ ঘটিয়াছিল। এই বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য চণ্ডীমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্ব। এই চণ্ডীমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্ব ও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রভাবিত অন্যতম গ্রাম্য দেবতা ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচারক কাব্য ধর্ম্মমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পূর্ণ একরূপ এবং বৌদ্ধমত শূন্যবাদের অনুকূল। ইহার সহিত আবার পরবর্ত্তীকালে নাথ-সম্প্রদায়ের সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীও আসিয়া মিলিত হইয়াছে। যদিও ইহাতে উক্ত দেবতাগণ পৌরাণিক তথাপি এই বিষয়ে পুরাণের স্বতন্ত্র কোন প্রভাব ইহাদের উপর একেবারেই দৃষ্টিগোচর হয় না। অবশ্য নাথগ্রন্থ ও ধর্ম্মপূজা উভয়েই বৌদ্ধধর্ম্ম কর্ত্তৃক প্রভাবিত বলিয়া উভয়ের কাহিনীর মধ্যে স্বভাবতঃই কতকটা ঐক্য রহিয়াছে এবং এই মঙ্গলচণ্ডীও বৌদ্ধ সমাজের ভিতর দিয়া আগত বলিয়া তাহার সহিত বৌদ্ধ সমাজসম্মত সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীও সংযুক্ত হইয়া আসিয়াছে।" (৫) কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিচিত্র হইলেন ধর্মঠাকুর, "ইনি একাধারে ব্রাহ্মণ্য দেবতা বিষ্ণু ও শিব, বৌদ্ধস্তূপের প্রতীক, এবং নামহীন অনার্য দেবতা যাঁহার বাহন উলুক অথবা বানর। ধর্মঠাকুরের বিশেষ আদর দক্ষিণ-রাঢ়ে। বর্তমান সময়ে ইনি অনেক স্থলে বিষ্ণুরূপে অথবা শিবরূপে পূজিত হইয়া থাকেন, কিন্তু ধ্যানের মন্ত্র হইতে বোঝা যায় যে ইনি বৌদ্ধ-বজ্রযানের ব্রহ্ম 'শূন্য'ও বটেন।" (৬) মধ্যযুগের অরাজক সমাজ-পরিবেশ এই সমন্বয় সাধনে উল্লেখযোগ্য সহায়তা করে থাকবে হয়তো।

---

৪ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস ; পৃ, ১০৮

৫ ঐ ; পৃ, ২৫৩

৬ সুকুমার সেন ; বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড।

এই সমন্বয়ের ভিতর দিয়ে বা আর্য ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার বিরুদ্ধে অনার্য ভাবধারার বিজয় ঘোষণার মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের বাঙালী ভাব-মুক্তি অর্জন করে। এই মুক্তি তার একান্তই কাম্য ছিল; বিবদমান সাংসারিক বিধিব্যবস্থার এবং সমস্ত সমস্যার সমাধান সম্ভবত সে এই পথেই অর্জন করতে চেয়েছে। বিভিন্ন ভাবধারার সমন্বয়ের সাহায্যে তাহার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র নতুনভাবে গড়ে উঠতে আরম্ভ করে; সে সকলকেই গ্রহণ করল, কাউকেই অনাদরে দূরে ঠেলে দিল না। কালকেতুর আদর্শ রাজ্য স্থাপনের মধ্যে তার স্বাক্ষর রয়েছে। সেখানে বসবাসের জন্য ব্রাহ্মণরা আসছেন, কায়স্থরা আসছেন, ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-গোপ-ধীবর প্রভৃতিরা আসছেন, মুসলমানরাও আসছেন। সবাই সেই রাজত্বে চণ্ডীর কৃপা লাভ করে সুখশান্তি সমৃদ্ধিতে জীবন নির্বাহ করতে পারে। সবাইকে গ্রহণ করার মনোভাব থেকেই দেখতে পাই কবি চণ্ডীমাহাত্ম্য চিত্রণ করতে গিয়েও আর সব দেবতাকে বিস্মৃত হননি; তাঁদের প্রত্যেককে বন্দনা করে তিনি কৃপা প্রার্থনা করছেন এবং হরি হরি বলে মনসার মাহাত্ম্য প্রচার করার মধ্যেও কবি কোন অসংগতি দেখতে পাননি। তাই একটা নির্দিষ্ট স্বার্থ ও উদ্দেশ্য মঙ্গলকাব্য রচনার মূলে থাকলেও এর মধ্য দিয়ে একটি ঐক্যের সুর ধ্বনিত হয়েছে; সাধারণ বাঙালী জীবনে নির্দিষ্ট ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে ভিন্ন ধর্ম-সম্মত আচার-আচরণ দেখা যায়, তার মূল এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।

মঙ্গলকাব্যের বাইরের ছাঁচটা পৌরাণিক; বিভিন্ন দেবদেবীর জন্ম, ঘরসংসার, দ্বন্দ্ব ও প্রাধান্য লাভের উপাখ্যান মঙ্গলকাব্যের উপজীব্য। কিন্তু এই বাইরের আবরণের মধ্যে যে কাহিনী রূপ পেয়েছে, তা একান্তভাবে মানবিক এবং বিভিন্ন দেবতার মধ্যে যে পারস্পরিক কলহ তা-ও সংঘটিত হচ্ছে মানবিক পটভূমিতেই। কোন অস্বাভাবিক অলৌকিক জগৎ কবি-কল্পনায় স্থানলাভ করেনি। মানুষের পৃথিবীতে দেবতারা পরিভ্রমণ করেছেন বলে তাঁদের আচরণও একান্তই মানুষেরই মত—স্থানে কালে আকৃষ্ট যে কোন সামাজিক মানুষের মত। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে অভিব্যক্ত যে সব গুণ তা-ই দেবতাতে আরোপিত হয়েছে। তাই সম্পূর্ণ অ-মানুষিক গুণের সংগে অতি তুচ্ছ মানবিক গুণও মিশ্রিত দেখতে পাই—যেমন ঈর্ষা ভয় ও নোংরামি। এই যে মানুষের মত করে দেবতাকে চিত্রিত করা অথবা

মানুষের ব্যবহারিক বাস্তব পৃথিবীর সীমার মধ্যে দেবতাকে আকৃষ্ট করা, তা মানুষের চিন্তাধারার বিবর্তনের একটা উল্লেখযোগ্য স্তর। কারণ, সম্ভবত প্রথমে অলৌকিক, পরে মিশ্রিত অলৌকিক-মানবিক জগতের ভেতর দিয়ে মানুষের মন ও দৃষ্টি বিশুদ্ধ মানবিক জগতে নিবদ্ধ হয়। হিসেব-না-পাওয়া শক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে ধীরে ধীরে হিসেব পাওয়া শক্তি ও পৃথিবীর মধ্যে মানুষ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং ফিরে সেই শক্তিকেই নিয়ন্ত্রণ করতে অগ্রসর হয়। এই ইতিহাস মানুষেরই আত্মচেতনার বিকাশের ইতিহাস। আর আত্মচেতনার বিকাশের সংগে সংগে মানুষের কাব্যও ধীরে ধীরে সমস্ত পৌরাণিক ও দেবদেবীর প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে পার্থিব জীবনকে সৃষ্টি করে। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের মানবায়িত দেবদেবীর কাহিনীর মধ্যে মানুষের বর্দ্ধিষ্ণু আত্মচেতনার স্বাক্ষর বর্তমান। সেটা কর্মের ক্ষেত্রে যেমন, ভাবের ক্ষেত্রেও তেমনি।

মঙ্গলকাব্যের সাংস্কৃতিক পরিবেশ তাই আশ্চর্যভাবে সজীব। এখানে যে জীবন বিভিন্ন ধারায় ও বিবিধ আচার আচরণ কর্মের মধ্যে বিকাশ লাভ করেছে, তা সে যুগের সর্ববিধ প্রাধান্য ও গরিমায় প্রতিষ্ঠিত নাগর-জীবন থেকে স্বতন্ত্র আর সেজন্য এর সংস্কৃতির রূপটাও আলাদা। মধ্যযুগের সামন্ত-রাজাদের রাজপ্রাসাদ ও রাজধানীকে কেন্দ্র করে বহু পূর্ব থেকেই নাগর সভ্যতার পত্তন হয়ে গিয়েছিল এবং সেই সভ্যতার যে আনুষঙ্গিক সাজসজ্জা ও অঙ্গাবরণ তার সাক্ষাৎও রাজানুকূল্যে রচিত কাব্যাদিতে পাওয়া গিয়েছে। এই সভ্যতা নিঃসন্দেহে রাজা ও রাজপ্রাসাদ-কেন্দ্রিক; শুধুই অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকেই নয়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও রাজপরিবার, রাজপ্রাসাদ এবং রাজারাজড়ার প্রিয়জনরাই সমস্ত অনুরাগের উৎস। তাই, মধ্যযুগের রাজপ্রাসাদ ও নাগর-জীবনে যে বিরস বিকৃত ভাবানুরাগ ও জীবন-বোধের প্রতিষ্ঠা দেখা যায়, তার স্পর্শ থেকে নাগর-সংস্কৃতি মুক্ত নয়। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের সাংস্কৃতিক ভাবাকাশ সম্পূর্ণ অন্যরূপ। রাজপ্রাসাদ ও রাজধানীর বাইরে দেশময় যে জীবন প্রসারিত, নাগরিক শ্রেয়বোধের স্পর্শ থেকে যে জীবন সম্পূর্ণ মুক্ত, মঙ্গলকাব্যের মধ্যে সেই জীবনই নিজেকে প্রকাশ করেছে। তাই এখানে নাগর-জীবনের সাজসজ্জা নেই, চটুলতা নেই, বিকৃতিও নেই, যা আছে তা প্রকৃতির স্বভাব-সৌন্দর্যের মতই নিরাভরণ। রাজরাজড়া অথবা তাঁদের

প্রিয়জনরা এখানকার সমস্ত ভাবনা কল্পনা বা অনুরাগের উৎস-কেন্দ্র নন, সম্ভবত এককভাবে ব্যক্তিবিশেষও নন, সমগ্রভাবে সে জীবন ছড়ানো রয়েছে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে, উৎসকেন্দ্র হলো সেই বৃহত্তর জীবন। সেজন্যই সেই কালে এই কাব্যগুলি সহস্র সহস্র মানুষের অব্যক্ত আকূতিকে ভাষা দিয়ে পেয়েছিল ব্যাপক বিস্তৃতি অর্জন করেছিল জাতীয় সাহিত্যের মর্যাদা। সেই গণ-জীবনই কবিমানসের মাধ্যমে সহস্র ধারায় সহস্র প্রবাহের মধ্য দিয়ে নিজেকে সৃষ্টি করেছে। এখানে তাই কোন আবিলতা নেই, নেই কোন অবসাদও। নদীর জলস্রোতের মত তা নিরন্তর প্রবাহিত হয়ে চলেছে। মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর মধ্যে বিচরণ করার অর্থ সেই স্রোতে অবগাহন করা।

এদিক থেকে, বাংলা কাব্য সাহিত্যের বিকাশে, মঙ্গলকাব্যগুলো এক নতুন যুগের, নতুন সাংস্কৃতিক মূল্যমানের দ্যোতক।

চণ্ডীমঙ্গল—খ

এক

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী দু'ভাগে বিভক্ত; প্রথম ভাগে কালকেতু উপাখ্যান, দ্বিতীয়ে ধনপতি-শ্রীমন্ত উপাখ্যান। প্রথম উপাখ্যানে পাওয়া যায় চণ্ডী-মাহাত্ম্য প্রচারের প্রথম পর্বের পরিচয়; বিধিবিধান ও সমস্ত নিয়ম কানুনের বন্ধন মুক্ত অনার্য দেবতা চণ্ডী নিজের প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতির জন্য যে কোন ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে যে কোন কর্মে প্রবৃত্ত হচ্ছেন; পরিশেষে স্বীকৃতিও খানিকটা লাভ করছেন, কিন্তু এই স্বীকৃতির জোরে তখন পর্যন্তও তিনি ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি-সম্মত সমাজে প্রবেশাধিকার লাভ করেননি; এই সমাজের বাইরে গুজরাটের বনে তাঁর অধিষ্ঠান। দ্বিতীয় ভাগে দেখতে পাই তিনি ব্রাহ্মণ্য সমাজ সংস্থায় প্রবেশ লাভ করেছেন, এবং সেখানে প্রচলিত সমৃদ্ধ দেবতা শিবকে বিতাড়িত করে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করছেন। প্রথম পর্বে যার আরম্ভ, দ্বিতীয়ে তার পরিণতি। তাই, চণ্ডীমঙ্গলে দুটো স্বতন্ত্র কাহিনীর সংযোগ অথবা স্বতন্ত্র দুটো ভাগে এর বিভাগ আকস্মিক নয়, অথবা কবি মনের কারণ-না-জানা বিভ্রমও নয়। এই বিভাগের হেতু সুস্পষ্ট, এবং সেদিক থেকে গভীর অর্থবহ। যিনি এই বিভাগ সর্বপ্রথম কল্পনা করেছেন, তিনি এই বিভাগের ইংগিত সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই মনে হয়। মূল উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্যের দিক থেকে এদের বিভিন্নতার জন্যই দুটো কাহিনীর পটভূমিও একটু বিভিন্ন; তাই উভয়েই স্বতন্ত্র বিচারের অপেক্ষা রাখে।

চণ্ডীর ছলনায় ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর চণ্ডীমাহাত্ম্য প্রচারের জন্য ব্যাধরূপে পৃথিবীতে প্রেরিত হ'লেন; তার পত্নী ছায়াস্বামীর অনুগামিনী হ'লেন। পৃথিবীতে তাদের পরিচয় হ'লো কালকেতু ও ফুল্লরারূপে। বনের পশুপক্ষী শীকার ও মাংস বিক্রয় তাদের পেশা। নিরুপদ্রব শান্তিময় জীবন, অবশ্য দারিদ্র্যের

চেতনায় ম্লান। কালকেতুর অত্যাচারে এদিকে বনের পশুপক্ষীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠায় এরা চণ্ডী দেবীর শরণাপন্ন হ'লো, দেবী তাদের অভয় দিলেন। দেবী কালকেতুকে ছলনা করলেন, শীকার মেলে না, কিন্তু একদিন দেবী স্বর্ণ গোধিকা হয়ে কালকেতুর হাতে ধরা দিলেন। কালকেতুর অনুপস্থিতিতে দেবী ফুল্লরার নিকট একটি লাবণ্যময়ী নারীমূর্তিতে প্রকাশিত হন। ফুল্লরা তাঁকে স্বগৃহে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ উপরোধ করে, কিন্তু তিনি অচল। পরে কালকেতুও তাঁকে পীড়াপীড়ি করল; কিন্তু কোন ভাবেই তাঁকে বিচলিত করতে না পেরে কালকেতু ধনুকে শর জুড়ে। তখন দেবী আত্মপ্রকাশ করেন, এবং কালকেতুকে সাতঘড়া ধন ও একটি অঙ্গুরি দিয়ে প্রস্থান করেন। দেবীর আদেশে কালকেতু গুজরাট বন কাটিয়ে নগর স্থাপন করল, নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করল। কিন্তু ভাঁড়ু দত্তর চক্রান্তে কলিঙ্গরাজের সংগে তার যুদ্ধ দেখা দিল; কালকেতু যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে বন্দী হ'লো। চণ্ডীর আক্রোশে ইতি-পূর্বেই কলিঙ্গরাজের দেশ ভেসে গিয়েছিল, এবার দেবী কলিঙ্গরাজকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে কালকেতুকে মুক্তি দেওয়ার জন্য এবং তার রাজত্বকে স্বীকার করার জন্য আদেশ করলেন। মুক্তির পর সে কলিঙ্গরাজের সহায়তায় রাজ্য ভোগ করতে লাগল, এবং শাপান্তে স্বর্গে ফিরে গেল।

প্রথম পর্বের কাহিনী এখানে পরিসমাপ্ত হয়েছে। কাহিনী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, দেবী কলিঙ্গরাজের কাছ থেকে পরাজিত শত্রু কালকেতুর প্রতি সম্মাননা এবং স্বীকৃতি আদায় করে নিলেও সমাজ-সংস্থায় তার স্থান স্বীকৃত হয়নি; তাকে গুজরাটের বনেই প্রত্যাবর্তন করতে হলো। রাজার এক পরিষদ তাঁকে বলছেন,

কোন ছার বনভূমি তার তরে রায় তুমি
অকারণে করহ আবেশ।
ছোড়ান করিয়া আনী কহিয়া মধুর বাণী
বীরে পাঠাইয়া দেহ দেশ॥

একজন অরণ্যচারী ব্যাধ অস্বাভাবিক শক্তিশালী হয়ে উঠেছে; কিন্তু তার জীবনের মূল্যই বা কি, অরণ্যের মূল্যই বা কি; তাই অকারণ বিরোধের বিশৃঙ্খলাকে ডেকে এনে লাভ কি, মিষ্টিকথায় তাকে খুসী করাই বিধেয়, বিশেষ করে তার দাবী যখন উল্লেখযোগ্য রকমের ভীতিপ্রদ কিছু নয়।

কলিঙ্গরাজ কর্তৃক কালকেতুর স্বীকৃতিটা যেন অনেকটা এমনি ধরণের। তাই এই সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হই যে, প্রচলিত সমাজে তখনও সে আসন লাভ করেনি। অরণ্যের মুক্ত পরিবেশে তার আদর্শ রাজ্য ও সমাজ; সেখানকার নিয়ম কানুন দিয়ে কলিঙ্গ প্রভাবিত হ'বে না, অথবা কলিঙ্গের প্রভাবও গুজরাটে অনুভূত হবে না। পারস্পরিক সম্পর্কের এই সমাধান কলিঙ্গের দিক থেকে শ্রেয়। চণ্ডীর মাহাত্ম্যের ও কালকেতুর দিক থেকে অর্থাৎ অনার্য সম্প্রদায়ের প্রাণধর্মী জীবন দর্শনের দিক থেকে আরও বহুবিস্তৃত স্বীকৃতি লাভের পূর্বে এই সমাধান অশুভ নয়, বিশেষত যেখানে সে পরাজিত। পরাজয়ের মধ্যে এই বিজয় তার আরও গভীর স্বীকৃতির সূচনা মাত্র।

কাহিনীর এই কাঠামোর মধ্যে চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ সে যুগের স্থানে কালে বিধৃত জীবনের জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন। এই চিত্রগুলোকে সংগ্রথিত করে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ-জীবনের একটা সামগ্রিক রূপ পাওয়া যেতে পারে। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, এই সব চিত্রের পেছনে আছে কবি-মানসের গভীর জীবনবোধ। এই জীবনবোধের অভাব হলে কোন কবিই তাঁর কালকে সার্থকভাবে সৃষ্টি করতে পারে না। ইতিহাসের বিশেষ এক ক্ষণে সমাজের গতি ধারা কি, কোন কোন শক্তি কোন কোন ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে, বিবর্তনের কোন পর্যায়ে সমাজের অধিষ্ঠান, এ সম্পর্কে সার্থক পরিচয় থাকলেই পরবর্তী স্তরে পৌঁছানোর ইংগিত পাওয়া যেতে পারে, অথবা কোন কর্ম দ্বারা এই গতিধারাকে বিশেষ ধারায় প্রবাহিত করা যাবে, তার সংকেত পাওয়া যেতে পারে। নিজের সমাজকে এবং নিজেকে সত্যরূপে জানলেই চণ্ডীর প্রসাদে কোন বস্তু ও ফল আমার চাই, অথবা চণ্ডীর কোন আশীর্বাদ আমার প্রয়োজন, তার নির্ধারণ করা সহজ; আর উপাসনা বন্দনার মাধ্যমে সেই চাওয়া বা প্রয়োজনই অভিব্যক্ত হয়। চণ্ডীর আশীর্বাদ-পাওয়া নবজীবনকে বুঝতে হ'লে তাই তাঁর আশীর্বাদ-না-পাওয়া জীবনকে জানা চাই। চণ্ডী-মঙ্গলের কবিদের মধ্যে সেই জানার রূপ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও সত্য। সেই পরিবেশে সেই কালে বয়ে-চলা জীবনের বিবিধ সম্পর্ক কাব্যের মধ্যে অম্লানভাবে ফুটে উঠেছে।

পূর্বেই নির্দেশিত হয়েছে যে, মঙ্গলকাব্যের সামাজিক পটভূমি অর্থাৎ বাংলার মধ্যযুগ নানা অসংগতি বিশৃঙ্খলায় চিহ্নিত। বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলার সংগে মিশেছে সমাজের আভ্যন্তরীণ গলদ, শ্রেণীগত বৈষম্য বর্তমান, সুতরাং

উৎপীড়নও ; সুদ-বাট্টা ভোগী মহাজনরা রীতিমত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, এবং দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে আরম্ভ করেছে। রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় ও সামাজিক অসংগতির চাপে বৃহত্তর জনসমষ্টির জীবন নানা দিক থেকে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। মুকুন্দরাম কবিকঙ্কন চণ্ডীতে আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলছেন—

সরকার হৈল কাল খীল ভূমি লিখে লাল
বিনি উপকারে খায় ধুতি।
পোতদার হৈল যম টাকা আড়াই আনা কম
পাই লভ্য খায় দিন প্রতি॥
ডাঁদা রহে প্রতিনাছে প্রজারা পালায় পাছে
দুয়ার জাঁতিয়া দেই থানা।
প্রজাকার বিয়াকুলি বেচেঘর কুটভালি
টাকাকের বস্তু দশ আনা॥

স্বয়ং কবিকে মামুদ সরিপ নামক এক ডিহিদারের অত্যাচারে সপরিবারে দেশত্যাগ করতে হয়েছিল। কবি নিজের জীবন দিয়ে এবং উন্মুক্ত দৃষ্টিতে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তাই তাঁর কাছে মূর্ত হয়েছে ; দেশ অরাজক, নিয়ম নীতি শৃঙ্খলা-শাসন এখানে অপরিজ্ঞাত। কালকেতুর অত্যাচারে উৎপীড়িত হ'য়ে একটি মেয়ে-বাঘ পশুরাজ সিংহকে বলছে—

আমি তব পায় মাগী হে বিদায়
ছাড়িব তোমার বন।
পাত্র অধিকারী না শুনে গোহারী
বিপাকে ছাড়ি জীবন॥
রাণীগণ সঙ্গে থাক লীলা-রঙ্গে
না কর দেশ বিচার।

মেয়ে বাঘটির এই অভিজ্ঞতার সংগে সেই কালে সেই সমাজে বিচরণশীল মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা সংযুক্ত হয়েছে বলে মনে হয় ; অথবা মানুষের অভিজ্ঞতাই এই উক্তির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে বলা যেতে পারে। বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সমস্ত শ্রেয়বোধ-মুক্ত ক্ষয় ও অনাচার এবং সামাজিক ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান ব্যক্তি ও শ্রেণীর হৃদয়হীন শাসন, এই উভয়ের চাপেই সাধারণ মানুষ

ভয়বিস্ময়ে অভিভূত। কারও শক্তির কোন সীমা আছে কিনা, তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন নিয়ন্ত্রণ আছে কিনা, তা ভেবে তারা ব্যাকুল। অথচ এই অসহায় পরিবেশ থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় সে জানে না। তাদের পার্থিব সহায়-সম্বল রাজা এবং অপার্থিব সহায়-অবলম্বন ভগবান উভয়েই তাদের আবেদন-নিবেদনের প্রতি সমান উদাসীন। অথচ শুধুমাত্র আবেদন-প্রার্থনায়ও তাদের ভাগ্যের বিবর্তন সম্ভব নয়। এই অসহায় চেতনায় তারা ম্রিয়মান। আর এই চেতনার সংগে যুক্ত হয়েছে তাদের অপরিসীম দারিদ্রের কশাঘাত। গৌরীর মুখ দিয়ে কবি বলিয়েছেন,

উচিত কহিতে আমী সবাকার বৈরী।
দুঃখ কৌতুক দিয়া বাপ বিভা দিলা গৌরী॥

হর-গৌরী জীবন এবং কালকেতু ফুল্লরার জীবনের চিত্রে কবি দুঃখভরা বেদনাকেই অভিব্যক্ত করেছেন। এইভাবে সমস্ত দিক থেকে অসহায় যে গণ-জীবন তার কোন মর্যাদা নেই, কোন স্বীকৃতি নেই, কোন কল্যাণবোধ থেকেই কেউ তাদের পানে তাকায় না। কবি বলেন—

দরিদ্র পতি জার বিফল জনম তার
দারিদ্রে গুণরাশী নাসে।
গৃহিনী হবে ভিক্ষে জনম জাব দুঃখে
দারীদ্রে কেহ বা সম্ভাসে॥

সাধারণ জীবনের এই পরিচয়। সমস্ত দিক থেকেই তা অনাদৃত, অধঃ-পতিত। কিন্তু সামাজিক দুঃখভোগের সুযোগে যারা ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করেন, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কল্যাণ বোধে যারা সামাজিক অকল্যাণ সৃষ্টি করেন, তারা যে সুখেই কালাতিপাত করছিলেন একটি পশুর মুখে প্রকাশিত বিদ্রূপে তার পরিচয় আছে। কালকেতুর সংগে সমস্ত পশুরা পরাস্ত হলে সে আক্ষেপে বলছে—

উইচারা খাই পশু নামেতে ভল্লুক।
নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক॥

এই বিদ্রূপের মানবিক গুণ উল্লেখযোগ্য; সম্ভবত বাস্তব মানুষের মনোভাব এক্ষেত্রেও কবিকে প্রভাবিত করে থাকবে।

এইরূপ সহায়-অবলম্বনহীন দুঃখ বঞ্চনা নিরানন্দে-গড়া জীবনে লৌকিক মন পরিতৃপ্ত থাকতে পারে না। তার জীবনের অন্তর্নিহিত প্রেরণাতেই—যা হলো অখণ্ড চাওয়া পাওয়া এবং অনন্ত হওয়ার প্রেরণা—তাকে এই নিরানন্দের ঊর্ধ্বে নিজের জীবনকে স্থাপন করতে হবে; বঞ্চনাকে সৃষ্টির পূর্ণতা দ্বারা ভরে দিতে হবে। যত অস্পষ্ট এবং অসংগঠিতই হোক না কেন, এই চেতনা মানুষের মধ্যে আছেই, এবং তার কর্মকেও নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু চণ্ডীর আশীর্বাদ না পাওয়া জীবনের দেবতা হলেন শিব, উদাসীন কর্মভোলা দেবতা। যদিও এককালে "জে জন শঙ্কর পুজে নহে ধনহীন", বর্তমানে তা আর সত্য নয়। দেবতা স্বয়ং অকর্মন্য পরাশ্রয়ী হয়ে পড়েছেন, গৌরী তাঁকে নিয়ে সংসার করতে পারছেন না, মেনকা বিরক্ত হয়ে গৌরীকে বলছেন—

> মিছে কাজে ফিরে পতি নাহি চাশ বাস।
> অন্ন-বস্ত্র কত যোগাইব বারমাস॥
> দুই পুত্র তীন দাসী স্বামী শূলপানী।
> প্রেতভূত পিশাচের লেখা নাহি জানী॥
> অব্যাগত সদাই দারুণ উৎপাত।
> রান্ধ্যা বাড়্যা দিয়া গ কাকালে বেলে বাত॥
> প্রেত ভূত পিশাচ লইয়া তার সঙ্গে।
> সাঘুড়ি হইয়া কত কিনী দিব ভাঙ্গে॥
> লোক-লাজে মোর স্বামী কিছু নাহি কয়।
> জামাতার পাকে ঘরে হৈলা শর্পভয়॥
> তোমার কর্ম্মের গতি স্বামী বামপথি।
> তথি সহ সুতা তোরে মিলীলা দুর্গতি॥

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে নলকূবর অন্নদা সম্পর্কে বলছে,—

> "শঙ্কর ভিখারী সে ত তারি নারী
> আমি মর্ম্ম জানি তার।
> বাপার ভাণ্ডারে অন্ন চাহিবারে
> দিনে আসে তিনবার।"

সামাজিক প্রয়োজনের দিক থেকে, অথবা উৎপাদন ও সৃষ্টিশীল কর্মের দিক থেকে বিচার করলে শিব সমস্ত সৃষ্টিধর্মী কর্ম থেকে বিরত হয়েছেন; সামাজিক পরিবেশ যে মুহূর্তে প্রচণ্ড প্রবল কর্ম ও উদ্যমের দাবী জানায়, সেই মুহূর্তে এই কর্ম ও উদ্যমের উপযোগী কোন প্রেরণা দেওয়ার মত শক্তি তাঁর নেই, কর্মের বদলে আছে ঔদাসীন্য বিরাগ। অথচ সৃষ্টির আহ্বান ও আকৃতি তখন চতুর্দিকে, তাকে ভাষা পেতেই হবে; সৃষ্টিকে ভাষা দিয়ে মানুষ ভাষা দেবে নিজেকেই। অথচ শিব—পুরুষ দেবতা—সমস্ত সৃষ্টির প্রেরণা হারিয়ে ফেলেছেন; তাই মানুষকে বাধ্য হয়ে এমন কোন শক্তির আশ্রয় করতে হয় যা সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে, যার হওয়া-পাওয়ার সম্ভাবনা অপরিসীম। সৃষ্টি-অক্ষম পুরুষ দেবতার প্রতিবাদে মানুষ সহজেই সৃষ্টি সমর্থ মেয়ে দেবতাকেই স্থাপন করে; বিশেষ করে মাতৃমূর্তির যখন রক্ষণাবেক্ষণ এবং সৃষ্টি উভয়েরই প্রতীক। শিবের স্থানে শক্তির প্রতিষ্ঠা তাই স্বাভাবিক। চণ্ডীর শক্তির ও ক্ষমতার প্রচণ্ডতা আমাদের বিস্ময়াভিভূত করে; অসম্ভব সম্ভবের প্রতিশ্রুতিতে আমরা অভিভূত হই। তাঁর আশীর্বাদে "মাটিমুটা ধর যদি সোনামুটা হবে।" (ভারতচন্দ্র) অবশ্য চণ্ডীর উপর এই সীমাহীন শক্তির আরোপ সে কালের মানুষের পক্ষে অপরিহার্য ছিল। কেন না তাকে জয় করতে হবে তার প্রতিকূল পরিবেশকে, পরাজিত করতে হবে সমস্ত অকল্যাণ বুদ্ধিকে, প্রতিষ্ঠা করতে হবে ন্যায় ও কল্যাণবুদ্ধিকে। সাধারণ মানুষ জীবনের অস্বাভাবিক ভাবে পীড়িত ও বিকলাঙ্গ; তার পক্ষে এই গুরু কর্মদায়িত্ব পালন করা অসম্ভব। এই কর্ম তার বিরাটত্বের জন্যই মানুষের চোখে অসম্ভব বলে ঠেকে। এই অসম্ভব কার্য সম্পাদনের জন্য তাই অসম্ভব শক্তির আবাহন করতে হয়। নিজেকে নিঃশেষে তার হাতে তুলে দিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "এইরূপ শক্তি ভয়ঙ্করী হইলেও মানুষের চিত্তকে আকর্ষণ করে। কারণ, ইহার কাছে প্রত্যাশার কোন সীমা নাই। আমি অন্যায় করিলেও জয়ী হইতে পারি, আমি অক্ষম হইলেও আমার দুরাশার চরমতম স্বপ্ন সফল হইতে পারে। যেখানে নিয়মের বন্ধন, ধর্মের বিধান আছে, সেখানে দেবতার কাছেও প্রত্যাশাকেও খর্ব করিয়া রাখিতে হয়।" (সাহিত্য)

সীমাহীন চাওয়া-পাওয়া ও সৃষ্টির সম্ভাবনাময়ী দেবী চণ্ডী তাই মধ্যযুগের উৎকেন্দ্রিক পরিবেশে নিজেকে প্রচার করলেন। অথবা মানুষই তার মনোগত

ভাবকে এই দেবতা-প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ করল। তার নব-উন্মেষিত ভাবের সম্ভাবনা যে প্রচুর এবং শক্তি বিরাট, তাই সে প্রমাণ করল তখন পর্যন্তও আয়ত্তের মধ্যে না-আনা অলৌকিক শক্তি দিয়ে তার ভাবকে মণ্ডিত করে। এই ভাব সেকালের সাধারণ লৌকিক জীবনের ভাব, তাই অনার্য ব্যাধ কালকেতুকে আশ্রয় করে তা রূপ পেল। দেবী চণ্ডী অকারণ কালকেতুকে কৃপা করলেন, তেমনি অকারণে কলিঙ্গ রাজকে বিব্রত করলেন, প্রবল বন্যায় কলিঙ্গ ভাসিয়ে দিলেন। কেননা তাঁকে সৃষ্টি করতে হবে নতুনকে; কলিঙ্গ পুরানো জীর্ণ শৈব-দেশ, তাই নানা অসম্পূর্ণতা ও কলুষে তা ভরপুর। এই অসম্পূর্ণতাকে দূর করে সৃষ্টি করতে হবে পূর্ণতাকে, কলুষ দূর করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে অনাবিল সৌন্দর্যকে। দেবীর কার্য তাই 'না' 'এবং হাঁ' এই দুই ভাগে বিভক্ত; না-এর দিক হলো কলিঙ্গের ক্ষয়ের দিক, আর হাঁ-এর দিক হলো কালকেতুর গুজরাটে নতুন রাজ্য স্থাপনের দিক। মানুষের সৃষ্টিধর্মী মন না থেকে হাঁ এর দিকে অগ্রসর হলো, কুৎসিত বর্তমানকে অতিক্রম করে সম্ভাবনাময় আদর্শ ভবিষ্যতের কোঠায় স্থান লাভ করল; বর্তমান ভবিষ্যতে প্রসারিত করল। কালকেতু চণ্ডীর আশীর্বাদে নতুন রাজ্য স্থাপন করল; সেখানে সমাজের অন্তর্গত কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়েরই কোন অমর্যাদা হবে না; কোন অকল্যাণবুদ্ধিই সেখানে জয়যুক্ত হবে না; সেখানে চাওয়া বৃথা আশায় কেঁদেকুটে মরবে না, সার্থক পাওয়ায় পরিণত হবে। কালকেতু বুলান মণ্ডলকে বলছে—

শুন ভায়্যা বুলন মণ্ডল।
সন্তাপ করিব দুর   আস্যই আমার পুর
কানে দিব কনক কুণ্ডল॥

মনে না ভাবিবে আন   মুলে তোরে দিব ধান
গরু দিব লাঙ্গল বাহনে।
যার যেবা নাহি থাকে   শেই ধন দিব তাকে
কোন চিন্তা না করিহ মনে॥

আমার নগরে বস   জত হালে চাশ চশ
তিন শন বই দিবে কর।

হালে হালে দিবে তঙ্কা কারে না করিবে শঙ্কা
পাট্যায় নিশান মোর ধর॥
নাহিক বাউড়ি ডেরি রয়্যা বস্যা দিহ কড়ি
ডিহিদারি নাহি দিব দেসে।
জত বেচ চালু ধান তার নাহি লব দান
অঙ্ক নাহি বাড়াব বিশেষে॥
জত বৈসে দ্বিজবর তার নাহি লব কর
চাস ভূমি বাড়ী দিব দান।
হৈয়া ব্রাহ্মণের দাস সভার পূরিব আস
জনে জনে করিব সম্মান॥

সুতরাং কোন সম্প্রদায়কে বা কোন ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে নয়, সবাইকে নিয়েই এই আদর্শ সমাজ গড়ে উঠবে। এখানে ন্যায় এবং কল্যাণধর্মিতার প্রতিষ্ঠা সম্ভাবনা দেখে দলে দলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কায়স্থ, গোপ, ধীবর, মুসলমান এবং অন্যান্য সম্প্রদায় এসে বসবাস স্থাপন করে। চণ্ডীর আশীর্বাদ পাওয়া সমাজ থেকে যা কিছু অশুভ যা কিছু কুৎসিত যা কিছু অকল্যাণকর সমস্তই দূরীভূত হয়েছে; বাদবিসম্বাদ শোষণ উৎপীড়ন সেখানে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। সেখানে "দুঃখী দরিদ্র তাতে এক নাহি জানি। কনককলসী ভরি প্রজা খাএ পানী।" (মাধবাচার্য) এই ভাবেই মানুষ বর্তমানের দৈন্যকে ভবিষ্যতের সমৃদ্ধি দ্বারা পূর্ণ করে; বাস্তবকে অধ্যাস দ্বারা সৃষ্টি করে।

কিন্তু এই সাধারণ সুখসমৃদ্ধি শান্তির স্পর্শ থেকে বঞ্চিত একমাত্র ভাড়ু দত্ত। তাকে চিত্রিত করা হয়েছে সমাজ-বিরোধী শক্তির প্রতীক হিসাবে, মানুষকে নানাভাবে বঞ্চনা ওলচাতুরী করে সে বেঁচে থাকে। কালকেতুর সমাজের আদর্শ যেখানে ছলচাতুরীর ঊর্ধ্বে ওঠা, সমস্ত অকল্যাণবুদ্ধিকে দূর করা, সেখানে ভাঁড়ু দত্তের মত লোকের স্থান হতে পারে না; স্থান লাভ করতে হলে তাকে তার অশুভ বুদ্ধির উপরে উঠতে হবে, অথবা সামাজিক কল্যাণের জন্যই এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে তার ক্রুর বুদ্ধি মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে। কার্যত হলোও তাই। সমস্ত নাগরিকের নিকট ভাঁড়ু দত্তের লাঞ্ছনা অপমান সম্ভবত সমাজদ্রোহী ব্যক্তি ও শক্তির উদ্দেশে বলা এক নিশ্চিত সাবধানবাণী।

কিন্তু এই আদর্শ সমাজ গড়ে উঠেছে প্রচলিত সমাজের বাইরে; চণ্ডীর প্রভাব অর্থাৎ লৌকিক জীবনাদর্শ তখন পর্যন্তও ব্রাহ্মণ্য সমাজে স্বীকৃতিলাভ করে নি।

ধনপতি উপাখ্যানে চণ্ডী ব্রাহ্মণ্য সমাজের অন্তরে প্রবেশ করেছেন, এই সমাজের প্রভাবশালী বিধায়কদের নিকট স্বীকৃতি লাভের প্রচেষ্টা করছেন; তাই এই সংগ্রামটা আর পূর্বের ন্যায় দুটো স্বতন্ত্র সামাজিক আদর্শও সমাজের সংগ্রাম নয় একই সমাজের অন্তর্গত দুটো শক্তির সংঘাত। সমাজের বাইরে থেকে সংঘাতটা সমাজের অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছে। ধনপতি সমাজে প্রচলিত শৈবধর্মাশ্রয়ী সওদাগর; আর মঙ্গলকাব্য সমূহের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের প্রমাণ যে, সেকালে বণিকরা সমাজে প্রতিপত্তিশালী এবং সম্ভবত ব্রাহ্মণ্য সমাজ-সংস্কৃতির ধারক ছিলেন। সুতরাং স্বীকৃতিলাভের প্রত্যাশী চণ্ডীর একমাত্র লক্ষ্য, এই বর্ণের প্রভাব খর্ব করা এবং অনার্যের ধর্ম ও প্রাণধর্মী জীবনাদর্শকে তাদের দিয়ে মানিয়ে নেওয়া। ধনপতির দ্বিতীয় স্ত্রী খুল্লনাকে ধনপতির প্রতিদ্বন্দ্বী আদর্শের প্রতিনিধিরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। সপত্নীর অত্যাচারে অরণ্যে বিচরণকালে খুল্লনা চণ্ডীর কৃপা লাভ করে এবং ফিরে এসে চণ্ডীর পূজার্চনা প্রচলনে ব্রতী হয়। তাই একই পরিবারের মধ্যে পরস্পরবিরোধী আদর্শ পরস্পরের সংগে পরিচিত হলো।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, অরাজক সমাজ-পরিবেশে সমস্ত সৃষ্টিশীল কর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়ায় শিবের প্রতি লোক-মানস প্রীত ছিল না; পক্ষান্তরে, চণ্ডীর মধ্যে রূপ পেয়েছিল অনন্ত পাওয়া, সীমাহীন শক্তি ও অখণ্ড সম্ভাবনার বাণী। তাই লোক-মানস সহজেই তাতে আশ্রয় পেয়েছিল। তাছাড়া মানুষের নিকট চণ্ডীর দাবীও ছিল সামান্য, অতি অল্পেই তাঁর প্রীতি। খুল্লনাকে তিনি বলছেন,

অষ্ট তণ্ডুল দূর্ব্বা নিত্য নিরমিয়া।
পূজিও মঙ্গলবারে জয় জয় দিয়া॥

সুতরাং নানা দুর্বলতা ও বঞ্চনার ঘেরা লোক-মানস সর্ব দিক থেকে সুবিধাজনক দেবতাকে আশ্রয় না করে পারে না। কিন্তু লৌকিক জীবনে যার স্বীকৃতি সহজ, সামাজিক উচ্চ বর্ণের নিকট তা নয়। তাই খুল্লনার দেবতার প্রতি ধনপতির আক্রোশ।

এতেক বলিয়া সাধু জলে কোপানলে।
লঙ্ঘিয়া দেবীর ঘট ধরে তার চুলে॥
ভুমিতে দেবীর ঝারি গড়াগড়ি যায়।
নিকট হইয়া সাধু ঠেলে বাম পায়॥
কেমন দেবতা এই পূজিস্ ঘটঝারি।
স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহি করি॥

এই আক্রোশ তার নিতান্ত ব্যক্তিগত নয়, তা সামাজিক। কারণ, তার পরিবারে এই সমাজ-অস্বীকৃত অনার্য স্ত্রী দেবতার পূজা প্রচলিত হলে সামাজিক দিক থেকে তার অধঃপতন অনিবার্য; ধনপতি এ ব্যাপারে তাই অস্বাভাবিক সচেতন।

ধনপতির হাতে এই লাঞ্ছনা দেবী নিঃশব্দে হজম করলেন না; কূলহীন সমুদ্রে ধনপতির ছ'টি ডিঙ্গা ডুবিয়ে দিলেন; তার রূপ নষ্ট হলো; একমাত্র 'মধুকর ডিঙ্গা' নিয়ে বহু ক্লেশ ও দুর্ভোগ ভোগ করে সে সিংহল পৌঁছাল। পথে দেবী ধনপতিকে কমলে-কামিনী রূপ দেখালেন; কিন্তু পরবর্তীকালে ধনপতি সিংহলরাজকে সে দৃশ্য দেখাতে নিয়ে এলে দেবী তাকে ছলনা করলেন। সিংহল রাজের আদেশে ধনপতি যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ হলো। ধনপতির এই নিগ্রহ নিতান্তই অহেতুক; দেবীকে স্বীকার করে অনায়াসেই সে এই অবাঞ্ছিত উপদ্রব ও বিপদ থেকে মুক্ত হতে পারে। দেবী তাই স্বপ্নে তাকে দেখা দিলেন, এবং তার উদ্ধত অহমিকা ত্যাগ করে দেবীকে স্বীকার করার কথা বললেন।

ওহে সাধু ধনপতি পূজ মহামায়া।
স্বপন কহেন মাতা শিয়রে বসিয়া॥
স্মরণ করহ যদি ভবানী ভবানী।
কালি দহে দেখাইব কমলে কামিনী॥

তুলি দিব মগরায় ডুবা ছয় নায়।
ভরা দিয়া দিব ধন যত লাগে তায়॥
মণি মুক্তা প্রবাল পুরিয়া মধুকর।
কিঙ্কর করিয়া দিব সিংহল ঈশ্বর॥

কিন্তু ধনপতি নিশ্চল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁর স্থির বিশ্বাসকে সে হারাতে পারে না। তাই সদম্ভে সে ঘোষণা করছে

যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী।
মহেশ ঠাকুর বিনা অন্য নাহি জানি॥
জীবন ত্যজিব যদি নৃপ-কারাগারে।
ঠাকুর মহেশ বিনা না স্মরি কাহারে॥

ধনপতির এই সংগ্রাম প্রশংসনীয় হলেও নিষ্ফল; কেন না, তার দেবতা ও আদর্শ ইতিমধ্যেই সমস্ত সামাজিক মূল্য এবং সৃষ্টি মূল্য হারিয়ে ফেলেছিল; একটা মরে-যাওয়া আদর্শকেই সে আঁকড়ে ধরেছিল, যার কোন কিছু সৃষ্টি করার কোন ক্ষমতাই ছিল না। তাই সৃষ্টি-ধর্মী আদর্শের নিকট তার পরাভব ছিল নিশ্চিত, অবশ্যম্ভাবী। পরিণামে শ্রীমন্তের কল্যাণে, তার হারান সম্পদ পুনরুদ্ধৃত হলে সে দেখতে পেলো তার সনাতন আদর্শকে জুড়ে আছে এই নতুন আদর্শ, দুই আদর্শ এক হয়ে মিশে আছে। কিন্তু এই এক হওয়ার মধ্যে পুরাতন আর ঠিক পুরাতন নয়, নতুন প্রভাবে তা রূপান্তরিত। তাই পুরাতন আদর্শও এক নতুন সত্যে প্রকাশিত হলো। ধনপতি নতুন দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে তাকালো।

দুই জনে একতনু মহেশ পার্ব্বতী।
না জানিয়া এত দুঃখ পাইলুঁ মূঢ়মতি॥
চর্ম্ম চক্ষে আমি মাতা না চিনি তোমায়।
এই হেতু আমার ডুবিল ছয় নায়॥
না জানিয়া মূঢ়মতি হৈলাম প্রতিদ্বন্দ্বী।
এই হেতু দ্বাদশ বৎসর হৈলাম বন্দী॥
দোষ ক্ষমা কর মাতা লহ ফুল জল।
অন্তিমকালে চরণ যুগলে দিও স্থল॥

এভাবে ধনপতির নিকট স্বীকৃতি লাভ করে দেবী ব্রাহ্মণ্য আদর্শে গড়া সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

কিন্তু তাঁকে স্বীকার করার অর্থ কি এবং তাঁর আদর্শ জীবনকে সৃষ্টি করার অর্থ কি, তা দেবীর আশীর্বাদ-পাওয়া শ্রীমন্ত চরিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। খুল্লনা দেবীর কৃপা লাভ করেছিল, এবং সমাজে দেবীর পূজার প্রচলন করেছিল, এবং শ্রীমন্তের জীবনও দেবীর আশীর্বাদে সৃষ্টি হয়েছে; সুতরাং তার জীবন এবং চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব প্রতিদিনের চোখে দেখা সাধারণ জীবনের অনুরূপ হ'তে পারে না; তাকে এর চেয়ে বেশী কিছু অর্থাৎ সমস্ত দিক থেকে আদর্শস্থানীয় হতে হবে। কবি-মানসে সে ধরাও দিল তেমনি ভাবে। তার গুণাবলীর বর্ণনায় মুকুন্দরাম বলছেন,

সকল বিদ্যায় ধীর সত্যবাক্যে যুধিষ্ঠির,
দানে হব কর্ণের সমান।
শুকদেব সম জ্ঞানী, কুবের সমান ধনী,
পরম কল্যাণ ॥

রূপে অভিনব কাম, ইচ্ছায় শ্রীপতি নাম, ইত্যাদি।

শ্রীমন্তের এই অসাধারণ চরিত্র চিত্রণের জন্য কবি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার অনেক অলৌকিক কাহিনী তাতে আরোপ করেছেন; তার অসামান্য পাণ্ডিত্যের প্রমাণ স্বরূপ তাকে দিয়ে পণ্ডিত জনার্দন ওঝার সংগে পাণ্ডিত্যের বিচার করিয়েছেন আর তার অসাধারণ পৌরুষের বলেই সে মাত্র বার বৎসর বয়সে রাজ-আনুকূল্যে পিতার উদ্ধারের জন্য সিংহল যাত্রা করে। তার পক্ষে যে কোন কাজ সম্পাদন করা, যে কোন অসাধারণ শক্তি অর্জন করা যে কোন গুণে গুণান্বিত হওয়া সম্ভব; কেন না, সে সীমাশূন্য শক্তির আধার চণ্ডীর আশীর্বাদ লাভ করেছে। যাই হোক, সিংহলে যাওয়ার পথে সেও কমলে কামিনী মূর্তি দেখতে পেল; কিন্তু রাজকন্যা ও অর্দ্ধেক রাজত্বের প্রতিশ্রুতি পেয়ে সেও সিংহল রাজাকে মূর্তি দেখাতে পারল না। তাকে মশানে নেওয়া হলো; সম্মুখ বিপদ দেখে চণ্ডী প্রত্যক্ষ সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন, তাঁর ভূতপ্রেতের নিকট রাজ-সৈন্য পরাভূত হলো। তারপর পিতা পুত্রের মিলন, সিংহলরাজকন্যা সুশীলার সংগে শ্রীমন্তর বিবাহ, স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, উজানি নগর-রাজকে কমলে

কামিনী মূর্তি দেখানো, এবং তার কন্যা জয়াবতীর সংগে বিবাহ ও আনুষঙ্গিক সমৃদ্ধি।

কবি শ্রীমন্তর জীবনকে এমন সব উপকরণ দিয়ে সাজিয়েছেন যার মধ্যে নিহিত রয়েছে পার্থিব সুখসমৃদ্ধি। জীবনের সহজ ধর্মই যে সে বাইরে নিজেকে প্রসারিত করতে চায়; সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে আর কোথাও জীবনের সন্ধান করতে চায় না। সীমাহীন চাওয়া-পাওয়া এবং ভোগৈশ্বর্যের মধ্য দিয়েই জীবন আপনাকে সৃষ্টি করতে পারে, সার্থকভাবে প্রকাশিত হতে পারে। এদিক থেকে শ্রীমন্তর জীবন সার্থক। মানুষের নিকট আদর্শস্থানীয় যে সব গুণ, সে তার অধিকারী, আর এই পৃথিবীর যা কিছু দেওয়ার আছে যা কিছু আছে ভোগের, তা-ও সে পেয়েছে। সুতরাং সে পূর্ণ। তার জীবন পূর্ণ। কিন্তু তার এই পূর্ণতার মূলে আছে নতুন ভাবাদর্শের প্রভাব, চণ্ডীর প্রসাদ। পুরানো আদর্শের দেবতা শিব ধনপতিকে এই পূর্ণতা দিতে পারলো না, কিন্তু শ্রীমন্ত তা সহজেই ভোগ করল। সুতরাং এর মধ্যেই ভাষা পেল শিবের চলে যাওয়ার এবং চণ্ডীর আগমনের কাহিনী। ব্রাহ্মণ্য-মানসের ঔদাসীন্যের ঊর্ধ্বে প্রাণধর্মী লৌকিক জীবনাদর্শের বিজয়-কাহিনী।

আর এমনি ধরণের আদর্শ চরিত্র এঁকেই মানুষ প্রতিদিনকার খণ্ডতাকে পূর্ণতা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, এবং এমনি ধরণের পূর্ণ ও সার্থক জীবনের আবির্ভাবের আশা করেছে।

তিন

তাই এখানকার আবহাওয়া ও ভাবাকাশ সম্পূর্ণ মানবিক। চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ তাঁদের সমকালীন সমাজ জীবনের সংগে অন্তরঙ্গভাবে মিশেছিলেন, স্থানে-কালে ধরা সমাজ সম্পর্কের মধ্যে তাঁরা বিচরণ করেছেন; তাই একে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জানার, ব্যক্তিগত পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বোঝার অবকাশ তাঁদের হয়েছিল। আর সমাজকে জানার সংগে সংগে তাঁরা জেনেছিলেন সমাজের অন্তর্গত মানুষকেও, তার আশা আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছা ও স্বপ্নকে। তাই সমাজের ধারা ও মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্যেকার ফাঁককে

বুঝে তাঁরা সেই ফাঁককে ভরে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ; অন্তত ফাঁক ভরে দিতে পারবে যে ঐতিহ্য তাকে জেনেছিলেন, এবং কাব্যে রূপ দিয়েছিলেন। মুকুন্দরাম কলিকালের (যে কাল নিঃসন্দেহে তার সমসাময়িক) বর্ণনায় বলেছেন

মহা ঘোর কলিকাল, নীচ হবে মহীপাল,
সর্ব্বভোগ নীচের সাধন।
সঙ্গ দোষে পাবে দুঃখ, ধর্ম্মপথ পরাঙ্মুখ,
কলিকালে বেদের নিন্দন ॥

গুরু নিন্দা করি দ্বিজ, পরিহরি ধর্ম্ম নিজ
সবে হবে শূদ্রের সমান।
বাড়িবেক কাম কোপ, অনুমোদন ধর্ম্ম লোপ
টুটিবেক জপ তপ দান ॥

নহিবে ব্রাহ্মণ ভব্য, লাহা লোহা লোণ গব্য
বিক্রয়ে সঞ্চিব বহু ধন।
অধার্মিক হবে নর দু-তিন জাতিতে ঘর,
যার ধন সেই কুলজন ॥

দরিদ্র হইবে বৈশ্য, ব্রাহ্মণ শূদ্রের শিষ্য,
ভিক্ষাজীবী হবে সব লোক।
দুর্ভিক্ষ বিষম ব্যাধি, অকাল মরণ আদি
পীড়ার অধিক হবে শোক ॥

দিয়া অনেকের দুখ, করিবে আপন সুখ,
স্থাপ্য ধন করিবেক চুরি ॥ ইত্যাদি

এই সর্বাঙ্গীণ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অধঃপতনের মধ্যে কোন কল্যাণধর্মী মানুষই স্বস্তি বোধ করতে পারে না, সৃষ্টির প্রেরণা যার মধ্যে আছে সে এই সম্পর্কের মধ্যে নিজেকে কোনভাবেই প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। তাকে অবস্থান্তরে যাওয়ার সাধনা ও সংগ্রাম করতেই হয়। সমাজের সংগে ব্যক্তি সত্তার যে

বিরোধ তা দুটো ধারায়ই অভিব্যক্ত হতে পারে; এক পরিদৃশ্যমান বাইরের জগৎকে এবং সমাজকে সম্পূর্ণ অস্বীকার এবং তার স্পর্শ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া; দুই এই প্রত্যক্ষ জগৎ ও সমাজকে স্বীকার করে তাকেই রূপান্তরিত করার কর্মে আত্মনিয়োগ করা। ব্যক্তি যেখানে অশক্ত অক্ষম দুর্বল, সেক্ষেত্রে প্রথম মনোভাব দেখা দিতে পারে, আর ব্যক্তি সেখানে অপরিসীম শক্তিতে শক্তিমান, যেখানে সে নিজের মধ্যে এবং তারই চারিপাশে বিচরণশীল মানুষের মধ্যে অখণ্ড অযুত শক্তি আবিষ্কার করে, তখন সে নিজেকে বাইরের স্পর্শ থেকে সরিয়ে আনে না নিজেকেই বাইরে প্রসারিত করে, সৃষ্টি করে। লৌকিক মানস এই জাগতিক সম্পর্কের মধ্যেই নিজেকে উপলব্ধি করতে চায়; তাই শ্রীমন্তর মত সে বাইরে প্রসারিত করে নিজেকে। শ্রীমন্তর কাহিনীর মাধ্যমে কবি তাঁর মানবিক আদর্শ এবং মানবিকতাকেই প্রকাশ করেছেন।

সাধারণভাবে মঙ্গলকাব্যে এবং বিশেষ করে কবিকঙ্কণ চণ্ডীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এর মাধ্যমে লৌকিক জীবন নিজেকে সাহিত্যের জগতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কাব্যের এবং কাহিনীর বাইরের কাঠামোটা নিঃসন্দেহে পৌরাণিক এবং দেব-দেবী সম্পর্কিত, কিন্তু এর ভেতরকার মূল কথা ও সত্তা হলো একান্তভাবেই জাগতিক ও সেজন্যই মানবিক। সাধারণ মানুষের ঘরকন্নার কথা দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখের কথা তাই অনায়াসে সেখানে আশ্রয় লাভ করেছে। কবি তাঁর সমসাময়িক সমাজ-জীবন সম্পর্কে কতখানি সচেতন ছিলেন তাঁর জীবন বোধ কতখানি বলিষ্ঠ ও ব্যাপক ছিল এ তার নিদর্শন। আর সেইজন্যই এর সত্যকে বিচার করতে হয় তার নিজেরই মানদণ্ডে, অন্য কোন পারমার্থিক অথবা অলৌকিক সত্যের দৃষ্টিতে নয়। কবির চোখে ধরা-পড়া সেকালের জীবন দেখতে পাচ্ছি সর্বতোভাবে অলৌকিক শক্তির উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে সেকালের মানুষের নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেনি, তাই কবি সমস্ত দেবদেবীর কৃপা প্রার্থনা করে পুস্তক রচনায় হাত দিয়েছেন এবং অত্যন্ত যত্নের সংগে উল্লেখ করেছেন যে, স্বপ্নাদিষ্ট হয়েই তিনি এ পথে অগ্রসর হয়েছেন। এর সংগে মিশে আছে দারিদ্র এবং দারিদ্রের জন্যে মানবিক সম্পর্কের অবনতি। কর্মভোলা শিব স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে শশুরালয়ে কালাতিপাত করছেন, কিন্তু দরিদ্র শ্বশুর শাশুড়ীর পক্ষে অনির্দিষ্টকালের জন্য মেয়ে-জামাই-নাতি নাতনির ভরণপোষণ করা সম্ভব নয়।

তাই মায়েতে মেয়েতে মনোমালিন্য ঝগড়া ইত্যাদি। এমনি অসহায় পরিবেশের মধ্যে মানুষ তার প্রতিকূল শক্তিকে জয় করার জন্য তার চেয়েও অসহায় পন্থা অবলম্বন করেছে; যেমন, লহনা খুল্লনাকে অপদস্ত করার জন্য এবং স্বামীর হৃদয় জয় করার জন্য নানারকম তুকতাকের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এই পরিবেশের মধ্যে কবি যেন অবাক বিস্ময়ে তার সমকালীন মানুষকে দেখছেন; আর তার সমাজকে সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণীর সামাজিক আচরণকে কলমের আঁচড়ে সজীব করে তুলছেন। জীবনকে সামগ্রিক ভাবে বিস্ময়ে ও সহৃদয়তার চোখে দেখেছেন বলেই তাঁর বর্ণনায় কোথায় ঝাঁঝ নেই; সমস্তই সরস সুন্দর ও নির্মল; কোথায়ও বিদ্রূপের পরিচয় থাকলেও তাতে বিশেষ তাপ নেই ইংগিতে তার আভাষ দেওয়া আছে মাত্র। দুএকটি নিদর্শন থেকে তার সৃষ্টির সজীবতা বোঝা যাবে। গুজরাটে মুসলমানদের আগমন সম্পর্কে কবি বলছেন

পিরের মুরিদ হৈয়া ঘরে ঘরে করে দোয়া
গ্রামে গ্রামে করে অধিষ্ঠান।
দিনে নানা ভেক ধরে সেখ হৈয়া কেহ ফিরে
কালা পাগ মাথায় নিশান॥
পাইয়া উত্তম ধাম বসিলা সয়ের নাম
ভূঞ্জিয়া কাপড়ে মুছে হাত।
সুরাদী লোয়ানী পাণী কুড়ানী বিট্টালি ভূণী
পাঠান বসিলা নানা জাত॥

আর ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে বলছেন—

সুখে গুজরাট পুরে নগরিয়া শ্রাদ্ধ করে
গ্রাম জাতি করে অধিষ্ঠান।
সাজ করি দ্বিজ কয় কাহন দক্ষিণা হয়
হাতে কুশে দক্ষিণা শারণ॥
গালি দিয়া লণ্ডেভণ্ডে ঘটক ব্রাহ্মণ দণ্ডে
কয়াজি করিয়া বিচার।
যে নাহি গৌরব করে সভাতে বিড়ম্বে তারে
জাবত না পায় পুরস্কার॥

এই বর্ণনার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে সহানুভূতি নেই, আবার তেমনি সহানুভূতির অভাবও নেই; তার একমাত্র কারণ যে, এই বর্ণনার পেছনে ক্রিয়াশীল কবি-মন ছিল নিরপেক্ষ, সহজ, নির্মল। চোখের দৃষ্টিতে দেখা বাইরের এই নিখুঁত চিত্রের পাশাপাশি আবার হৃদয় দিয়ে অনুভব করা ভাবও চিত্ররূপে প্রকাশিত হয়েছে; নীচের এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে কবি নিজেকে রসের ভিতর দিয়ে প্রসারিত করেছেন কতখানি :

কোকিল হে ডাক সুললিত রা।
মধু স্বরে দিবা নিশ, নিত্য উগারহ বিষ,
বিরহিজনের পোড়ে গা ॥
নন্দন কাননে বাস, সুখে রহ বারমাস,
কামের প্রধান সেনাপতি।
কে তোমারে বলে ভাল, ভিতরে বাহিরে কাল,
বধ কৈলে অনাথা যুবতী ॥

জাতি অনুরোধে গাও, না চিনিস্ বাপ মাও,
কাল সাপ কালিয়া-বরণ।
সদাগর আছে যথা, কেন নাহি যাও তথা,
এই বনে ডাক অকারণ ॥

মানুষকে এবং তার জীবনকে অত্যন্ত কাছে থেকে এবং সমগ্রভাবে দেখেছেন বলেই কবি জীবনের সমস্ত দিক, সমস্ত ভাব, সমস্ত অবলম্বন, সমস্ত আশ্রয়কে ভাষায় সজীব করতে পেরেছেন। মঙ্গলকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এবং অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের ন্যায় কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে মানুষের ঘরের কথা, এমন কি তার রসুই ঘরের কথাও স্থানলাভ করেছে। আর একথা শুধু লৌকিক জীবন বর্ণনার মধ্যেই স্থান পায়নি, দেবদেবীর জীবনের মধ্যেও সমভাবে বর্তমান; তাই লৌকিক জীবনের পটভূমিতে আছে যে অলৌকিক পরিবেশ, পার্থিব মানুষের পেছনে আছে যে অপার্থিব দেব-দেবীর রাজত্ব, তাও সুনিশ্চিতভাবে মানবিক রসে, ভাবনা-চিন্তায়, ভোগ-তৃপ্তিতে সিক্তি। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীও স্থানেকালে ধরা মানুষেরই মত বিচরণ করছেন, বিভিন্নতা শুধুমাত্র নামে। যেমন,

আজি গণেশের মাতা রান্ধ মোর মত।
সিমে নিমে বাগ্যনে রান্ধিয়া দিবে তিত॥
সুকতা শীতের কালে বড়ই মধুর।
কুমড়া বাগ্যন দিয়া রান্ধিবে প্রচুর॥
কড়ই করিয়া রান্ধ শরশার শাক।
কটু তৈলে বাথুয়া কর দৃঢ় পাক॥
ঘৃতে ভাজি দুগ্ধ-গুড়ে ফেল ফুলবড়ি।
চড়ীচড়ী করি রান্ধ পলতার কড়ি॥
রান্ধিবো ছোলার সুপ দিবে তথি খণ্ড।
আলস্য তেজিয়া জাল দিবে দুই দণ্ড॥
নটিয়া কাঁঠালবিচি সারী গোটা দশ।
ঘনকাঠে দিয়া তথি দিবে আদারস॥
ঘৃতে জিরা সম্ভলনে রান্ধ ভাল ঘণ্ট।
তবে সে উদর মোর পুরিব আকণ্ঠ॥ ইত্যাদি

একথা মানুষেরই কথা; নির্দিষ্ট সমাজে বিচরণশীল মানুষের কথা। মানুষের কথাই দেবতার উক্তিতে রূপ পেয়েছে। তেমনিভাবে, মানুষের শক্তিই অতিরঞ্জিত ও সংগঠিত রূপ নিয়ে চণ্ডীর শক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। চণ্ডী—যিনি অপরিসীম শক্তির আধার, অনন্ত সম্ভাবনার প্রতীক এবং সীমাহীন চাওয়া ও পাওয়ার উৎস—তাঁর পরিকল্পনা চলনবলন ইত্যাদিও সমগ্রভাবেই মানবিক। নারীরূপে ফুল্লরার নিকট তিনি আত্মপরিচয়ে বলছেন,

ইলাব্রত দেশে বসি জাতে গ ব্রাহ্মণী।
শিশুকাল হৈতে আমি ভ্রমি একাকীনী॥
বন্দ্যবংশে জন্ম স্বামী বাপারা ঘোষাল।
সাতে শতাগৃহে বাস বিষম জঞ্জাল॥

ঠিক তেমনি তিনি মানবীরূপে খুল্লনার সংগে সাক্ষাৎ করছেন এবং তার দৈনন্দিন জীবনের হাসিকান্না ব্যথাঅশ্রু কাহিনীর সঙ্গে নিজেকে জড়িত করছেন, তার সংগে ঘরোয়া রসালাপেও ব্যাপৃত হচ্ছেন; শ্রীমন্তর বিপদে তিনি জরতীরূপে মশানে উপস্থিত হচ্ছেন, এবং পরে নিজের সমস্ত

সঙ্গিনীকে নিয়ে সিংহলরাজের বিরুদ্ধে স্বয়ং যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছেন। অর্থাৎ সর্বত্রই তার আচরণ মানবিক; "ক্রোধেতে হয় প্রলয় সমান", এমন শক্তির অধিকারী হ'লে মানুষ যা করত চণ্ডী তা-ই করছেন—সমস্ত অবাঞ্ছিত বিপদ ও অকল্যাণকে দূর করে কল্যাণকে প্রতিষ্ঠিত করছেন। মধ্যযুগের বিস্তৃত বিচলিত সমাজ পরিবেশ সমস্ত ধ্বংসপ্রবণ না ধর্মী প্রভাবের স্পর্শ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য এবং সেই পরিবেশে নিজের অকুতোভয় সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মানুষ এই সীমাহীন শক্তির কামনা করেছে এবং এই কামনাই বাস্তব মূর্তি ধারণ করে চণ্ডীতে ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। আর সেই ব্যঞ্জনার মধ্যে আমরা লৌকিক জীবনের স্পন্দন অনুভব করছি।

চার

কিন্তু, অষ্টাদশ শতকে রচিত ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল সাধারণভাবে বাংলা মঙ্গলকাব্যের বিস্তৃত সমাবেশের অন্তর্গত হ'লেও এ'তে লোক-জীবনের স্পন্দন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ভারতচন্দ্রের কবি-কর্মের আসর ছিল রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজদরবার, কবি স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেছিলেন একটি রাজ পরিবারে। দরবারী জীবন দেশের বৃহত্তর লোক-জীবন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ভিন্ন জাতের। এখানে ছলাকলা, বুদ্ধির কৌশল, রুচির বৈদগ্ধ, বাচনভঙ্গীর চাতুর্য, রূপসজ্জার পরিপাটি। জীবনের সহজ তাগিদ, বাঁচার অনাবিল প্রেরণা ও প্রকাশের সরল অভিব্যক্তি এখানে বাসর সাজায় না। ভারতচন্দ্র এই সামন্ত, নাগরিক জীবনের কবি তারই চাহিদা, রুচি ও মানসজীবনের স্বাক্ষর তাঁর কাব্যে। চণ্ডীমঙ্গলের লোক-কাহিনীর কোন চিহ্নও তাই অন্নদামঙ্গলে বর্তমান নাই।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের ন্যায় ভারতচন্দ্রের অন্নদা ও অপরিমেয় শক্তিরূপিণী। তাঁর "কৃপার বলে বোবা কথা কয়"; আর তিনি

অচক্ষু সর্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান
অপদ সর্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি মুখ বিনা বেদ পড়ি
সবে দেন কুমতি সুমতি॥

বিনা চন্দ্রানলরবি প্রকাশি আপন ছবি
অন্ধকার প্রকাশ করিলা।......ইত্যাদি।

তাঁর নিকট মানুষেরও সেই একই প্রার্থনা, "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে"; সেই একই ঐহিক সুখসমৃদ্ধি ভোগবিলাস দুঃখমোচন নির্ভয় নিষ্কলুষ জীবনযাত্রার প্রার্থনা। কিন্তু, সেসব কাহিনী, ঘটনা ও চরিত্রের মাধ্যমে কবি অন্নদামঙ্গল কীর্তন করেছেন, এবং তাঁর কালাতীত মহিমা লোক সমাজে প্রচার করেছেন, তা যেন সেই কালে বিচরণশীল মানুষের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি নয় তাঁর পাত্র-পাত্রী; যেন সাধারণ মানুষের হর্ষ বিষাদ আনন্দ বেদনার সহজ স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তিতে নির্মিত হয়নি; আমরা যেন তাদের বাস্তব অথবা সত্য বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত। এরা প্রবহমান জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন, বিদগ্ধ কবির শব্দালঙ্কার ও শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশের বাহন মাত্র। মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য কবির মধ্যে অকল্যাণ থেকে মুক্তিলাভের এবং কল্যাণময় নবজীবন সৃষ্টির যে একটা ভাবময় রূপ অভিব্যক্ত ও ক্রিয়াশীল দেখতে পাই, তা ভারতচন্দ্রে একান্ত অভাব। তিনি যেন সেই বিচলিত জীবন প্রবাহে অবগাহন করেননি; আর সেজন্যই সেই জীবনকে ভালবেসে তারই অভিব্যক্তির অপরিহার্য অঙ্গ রূপে সেই ধারায় নিশ্চিত গতি সঞ্চারের কোন প্রয়াস বা আকৃতি ভারতচন্দ্রের কবি মানসকে চিন্তিত করেনি। জীবনে দুঃখ আছে, আর্তি আছে; কিন্তু, ভারতচন্দ্রের কানে যেন তার পুরোপুরি সংবাদ পৌঁছয়নি। তিনি রাজসভার শব্দ ও ছন্দের ঘটা, অনুপ্রাস ব্যাজস্তুতির সমারোহে আচ্ছন্ন। কিন্তু এই শব্দমুখর পরিবেশের অন্তরালে যেন সজীব প্রাণটি নেই, যে প্রাণ জীবনকে ভালবাসে, মানুষকে ভালবাসে, স্থিরনিশ্চিত বিশ্বাসে মানুষের গৌরবময় ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি করার কর্মে আত্মনিয়োগ করে। ভারতচন্দ্র বিদগ্ধ নাগরিক রুচির পরিতৃপ্তি সাধন করেছেন, কাল-বিধৃত জীবনকে সৃষ্টি করেননি।

অর্থাৎ, ভারতচন্দ্রের কাব্যে যুগ সমাপ্তি ও অন্যতর আদর্শের লক্ষণ সুস্পষ্ট।

পদ্মাপুরাণ কাহিনী—গ

বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলোর মধ্যে সম্ভবত পদ্মাপুরাণ অথবা মনসামঙ্গল কাব্যগুলো প্রাচীনতম ; আর অন্যদিকে এই কাহিনী সমাজ ইতিহাসের অতি আদিযুগের স্মৃতিবহ। সর্প পূজার যা বিবিধ নিসর্গ পূজারই একটি প্রকাশ কাহিনী আমাদের সুদূর অতীতে টেনে নিয়ে যায়, যেখানে দেখতে পাই মানুষ শুধু তার অস্তিত্বের জন্যই পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত এবং এই সংগ্রামে তার সমরোপকরণের অপ্রাচুর্য এবং দুর্বলতার জন্য সে অন্যবিধ উপায়ে প্রতিপক্ষের কৃপাদৃষ্টি লাভের চেষ্টা করছে। সমাজ সংগঠন যেখানে একান্তই দুর্বল এবং সমাজের মানস জীবনও বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করেনি, এমনি কালে এবং সমাজে নিসর্গ পূজার প্রচলন এবং দীর্ঘকাল চলে আসা সম্ভব ; বাংলার বিশেষ করে পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার ভৌগোলিক পরিবেশ যেখানে যে কোন অসতর্ক মুহূর্তে সর্পাঘাতের আক্রমণ আশঙ্কা বর্তমান, সেখানে এই বিশেষ নিসর্গ পূজার প্রসার একান্তই স্বাভাবিক। আর এই ধরণের বিপদাশঙ্কা যে মানুষ কেবল হিংস্র জন্তু জানোয়ারের কাছ থেকেই করেছে তা নয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট এবং জলপোকার কাছ থেকেও করেছে। তার একটি চিত্র আছে নারায়ণ দেবের "পদ্মাপুরাণ"-এ। চাঁদের বাণিজ্য যাত্রার বিবরণে কবি বলছেন

নানা দহ বাহিয়া জায় আনন্দিত মন।
জোকাদহে পড়ে গিয়া নাএর পাটন ॥
বড় প্রচণ্ড জোক ঢেকি হেন গাও।
সাত পাচ জোকে ধরি রাখে চান্দের নাও ॥

গুণের সাগর চান্দো জানে নানাগুণ।
ডিঙ্গাত করি আসিয়াছে লক্ষ টাকার চুণ

ডুলাই সহিত চান্দো যুক্তি করিয়া।
গোলা করি চুণ নিঞা দিলেক ঢালিয়া॥
চুণ পাইয়া ভিজা জোকে এড়িল তখন।
রক্ত উঠি মরে জোক হাসে পাইকগণ॥ ইত্যাদি

এই চিত্রের ভিতর দিয়ে কথা বলছে যেন একটি আদি অসহায় মানব মন, যে সবেমাত্র নিজের পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে শিখছে। বাংলায় নিসর্গ পূজার উদ্ভব ও প্রসার বাংলার আদি সুতরাং আর্যেতর সমাজে, পরবর্তীকালে সাংস্কৃতিক সংযোগ বিয়োগের যুগে আর্য-ভাবধারায় সর্প পূজা কিঞ্চিৎ স্বীকৃতি লাভ করে থাকবে। মধ্যযুগে বহিরাগত আর্য ভাবধারা ও সমাজ চিন্তাকে আত্মসাৎ ও উপপ্লাবিত করে যখন বাংলার নিজস্ব লৌকিক জীবন ও ধ্যানধারণা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছিল, তখন এই নিসর্গ-পূজাই নতুন অর্থে ও নতুন কলেবরে আত্মপ্রকাশ করে। লোক-জীবনের প্রাণধর্মী সৃষ্টিধর্মী শক্তির সংগে এই সর্প শক্তি একীভূত হয়ে যায়, এবং শিবের বিরুদ্ধে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার ও স্বীকৃতির সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সামাজিক উচ্চ বর্ণের ভাব ও ভাবনার বিরুদ্ধে সামাজিক নিম্ন বর্ণের ভাব-ভাবনার সংগ্রামের কাহিনীই পুনরাবৃত্ত হয়। এদিক থেকে শিবের বিরুদ্ধে চণ্ডীর সংগ্রামকাহিনী এবং শিব প্রভাবের বিরুদ্ধে পদ্মারসংগ্রাম কাহিনীর অন্তর্নিহিত সত্তা এক ও অভিন্ন। তবে ব্রাহ্মণ্যসমাজে পদ্মার স্বীকৃতি লাভে বিলম্ব হয়েছে বলে মনে হয়। নারায়ণ দেবের চাঁদ ক্রোধে বলছে "চণ্ডির ইঙ্গিত পাইয়া কাটিমু পদ্মারে।" আর বিজয় গুপ্তের চাঁদও বলছে,

যেই হাতে পুজি আমি শঙ্কর ভবানী।
সেই হাতে পূজা খাইতে চাহ দুষ্ট কানী॥

দূরে যাও লুব্ধজাতি না বলিস আর।
এত দেব মধ্যে করিস্ ধামনা ভাণ্ডার॥ ইত্যাদি

পদ্মার এই বিলম্বে স্বীকৃতি লাভের মধ্যে উচ্চ ও নিম্ন বর্ণের সামাজিক ও ভাবধারাগত সংগ্রামের দীর্ঘ স্থায়িত্বের ইঙ্গিত বর্তমান রয়েছে বলে মনে হয়। দীর্ঘকাল ধরে এই সংগ্রাম চলতে থাকার ফলে এর রূপগত বৈশিষ্ট্যও পরিবর্তিত হয় এবং সমাজের সর্বাংশে তা বিস্তৃতিও লাভ করে।

শিব প্রভাবের বিরুদ্ধে চণ্ডীর সংগ্রামের পরিধি থেকে তাই পদ্মার সংগ্রামের পরিধি বিস্তৃততর। চণ্ডীমঙ্গলে দেখতে পাই, আর্য-সমাজ বহির্ভূত শক্তির প্রভাব আর্যসংস্কার আশ্রিত পরিবারে প্রবেশলাভ করেছে—ধনপতির দ্বিতীয় পত্নী খুল্লনাকে আশ্রয় করে চণ্ডী তাঁর প্রভাব বিস্তার করছেন এবং শেষ পর্য্যন্ত স্ত্রী খুল্লনা এবং পুত্র শ্রীমন্তের প্রভাবেই ধনপতি চণ্ডীর মাহাত্ম্য ও চণ্ডীপূজায় স্বীকৃত হয়। কিন্তু পদ্মাপুরাণে দেখতে পাই, এই প্রভাব শুধুমাত্র স্বতন্ত্রভাবে পরিবারের সীমানায়ই আবদ্ধ নয় তা সমাজের সর্বস্তরে সমস্ত গণ্ডীর মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে। পদ্মাকে স্বীকার না করা এবং তাঁর পুজায় সম্মত না হওয়ায় চাঁদ সদাগরের জীবনে যে সর্বনাশা দুর্যোগ নেমে এসেছে, পদ্মাকে স্বীকার করে সে দুর্যোগ থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য—

ব্রাহ্মণে হাতে ধরে সুদ্রে ধরে পায়।
পাত্রগণে চান্দের আগে কহিআ বোজায়॥
একদিন পুজ সাধু জয় বিসহরি।
ধনে পুত্রে ঘরে নেহ চম্পক অধিকারী॥
প্রজাগণের বচন সুনিআ চন্দ্রধর।
গদগদ করি বোলে প্রজার গোচর॥
পদ্মা পুজিবারে জেন চান্দ সদাগরে।
চিত্তে সাত পাচ করে মুখে নাহি সরে॥ (নারায়ণদেবের গ্রন্থ)

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, পদ্মা পূজার আবেদনটা এখানে ব্যাপক এবং সামাজিক। এবং অনেকটা এই সামাজিক দাবীর সমবেত আবেদনের প্রভাবেই চাঁদ সদাগর পদ্মা পূজার সম্মতি দান করেন। উপরন্তু বিপুলার প্রভাব তো আছেই। সমাজের সর্বাংশ যে দেবতাকে স্বীকার করে নিয়েছে, সমাজের বিধায়কের পক্ষে তখন সেই শক্তিকে স্বীকার না করার পক্ষে আর কোন যুক্তি বা অর্থ থাকে না। এই নিরঙ্কুশ স্বীকৃতির মাধ্যমে অনার্য প্রাণধর্মী দেবতা ও ভাবনাকল্পনার নিশ্চিত বিজয় ঘোষিত হচ্ছে। পদ্মাপুরাণ কাহিনী হিসেবে প্রাচীনতম কিন্তু দেবতা হিসেবে ব্রাহ্মণ্য সমাজে স্বকৃতির বিচারে নবীন। তা থেকেই প্রমাণিত হয়, কত সুদীর্ঘকাল ধরে এই স্বীকৃতির সংগ্রাম চলেছিল। স্বীকৃতি লাভে বিলম্ব হয়েছে সত্য, কিন্তু যখন তা এসেছে, পরিপূর্ণভাবেই এসেছে।

চণ্ডীর মতই পদ্মাকে স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। মধ্যযুগের বাংলার নিরন্তর ভাঙ্গায় বিপর্যস্ত হাহাকার শুষ্ক আবহাওয়ার কথা যদি মনে রাখি, তাহলে সে পরিবেশে যে দেবতা অকুণ্ঠ চিত্তে শুধু দিতে জানেন তাঁর প্রাধান্যে বিন্দুমাত্রও বিস্মিত হই না। চণ্ডীর মতই পদ্মার দেওয়ার ক্ষমতা অপরিসীম, করুণা অপরিমেয়, দাক্ষিণ্য নির্বিচার। তাই "দুঃখ মাত্র ধন" জনসাধারণ চণ্ডীর মত পদ্মাকেও আশ্রয় করেছে, এবং করে' তাদের দুঃখভরা বর্তমান থেকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতে মুক্তি লাভের কল্পনা করেছে। আর শুধু আশাই নয়; বর্তমানের মধ্যেও যে অপূর্ণতা ও অভাবের স্বাক্ষর রয়েছে, তার পূর্ণতা ও বিলোপও আশা করেছে তারা। বাস্তবের মধ্যে নিবিষ্ট তাদের মন পরিপূর্ণ বিশ্বাসেই আশা করেছে যে পদ্মার প্রসাদে।

......হবে তার সর্বত্র কল্যাণ ॥
অপুত্রার পুত্র হবে নির্ধনের ধন।
রোগীর রোগ দূর হয় বন্দী বিমোচন ॥
নারী যার ঘরে নাহি নারী হয় ঘরে।
মনের অভিষ্ট সিদ্ধ হয় মোর বরে ॥ (মনসামঙ্গল—বিজয়গুপ্ত)

শক্তির প্রাধান্যই এইখানে আর শিবের ব্যর্থতা; তাই শক্তির নিকট শিবের পরাভবও তাই স্বাভাবিক। আর এই জয়পরাজয়ের মধ্যে নিহিত আছে যারা বাস্তব সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ জীবনকে অস্বীকার করতে চায় তাদের উপর যারা স্বীকার করে জীবনকে সৃষ্টি করতে চায় তাদের বিজয়।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলোর মত লৌকিক গুণই মনসামঙ্গল কাহিনীগুলার প্রধানগুণ। কাহিনীরচয়িতা কবিদের একান্ত বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টি তাঁদের চারিপাশে বিস্তৃত জীবনপ্রবাহের উপর নিবদ্ধ; সেই কালে সেই স্থানে যা সত্য যা ঘটে চলেছে তা-ই কাহিনীর মধ্য দিয়ে এমন কি পদ্মার জন্ম, চণ্ডীর সংগে পদ্মার কলহ, শিবের সংগে চণ্ডীর কলহ, ইত্যাদি সমস্ত কাহিনীর মধ্য দিয়েই। রূপায়িত হয়েছে। তাই গ্রন্থে চিত্রিত দেবদেবীর চরিত্রও পুরোপুরিভাবেই মানবিক, স্থানকাল-বিধৃত মানুষের মত। সেদিক থেকে কাহিনীর বর্ণনা এবং চরিত্র চিত্রণ নিখুঁত অনবদ্য। সেকালের সামাজিক আচার-আচরণ বলন-চলন ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে ভাবাকাশ পর্যন্ত অর্থাৎ সমাজ-সংস্কৃতির একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র এই কাহিনী থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। আর

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এই জীবন ও সংস্কৃতি নাগর-জীবন বা নাগর-সংস্কৃতি নয় ; নগরের হৃদয়হীন পরিবেশে যে কৃত্রিম জীবন, সংস্কৃতি ও আচার-আচরণ গড়ে ওঠে, তার স্পর্শ থেকে এই জীবন ও সংস্কৃতি মুক্ত নগরের বাইরে সহজভাবে যে জীবন নিজেকে সৃষ্টি করে চলেছে নিজেরই সত্তা ও প্রকৃতির একান্ত তাগিদে, মঙ্গলাকাব্যগুলিতে সেই জীবনেরই স্বাক্ষর। তাই যা এখানে ঘটছে, যে সুর এখানে বেজে উঠছে তা অঙ্গাঙ্গীভাবে জীবনের সংগেই বাঁধা, জীবনের স্বরূপ হিসেবেই তার অভিব্যক্তি। তাই এই চিত্রগুলো এত বাস্তব ও সজীব ও প্রাণবন্ত।) কয়েকটি উদাহরণে তার প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে ; শিবের প্রতি ক্রুদ্ধ চণ্ডী বলছেন,

প্রেতগণে শ্মশানে থাকে মাথায় থাকে নারী।
সবে বলে পাগল পাগল কত সইতে পারি ॥
নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে পরাণে চমক লাগে।
চরিয়া বেড়ায় দুষ্ট বলদ, তাহারে খাউক বাঘে ॥
আগুণ লাগুক কান্দের ঝুলি ত্রিশূল নিউষ চোরে।
গলার সাপ গরুড়ে খাউক যেন ভাণ্ডিলা মোরে ॥
ছিঁড়িয়া পড়ুক হাড়ের মালা পড়িয়া ভাঙ্গুক লাউ।
কপালে দ্বিতীয়ার চন্দ্র তারে গিলুক রাউ ॥

(বিজয়গুপ্ত মনসামঙ্গল)

এর থেকে সত্য সজীব বর্ণনা আর কিছু হ'তে পারত না। এমনি ধরণের অসংখ্য বর্ণনা ও চিত্র এই কাব্য-কাহিনীগুলোর মধ্যে ছড়ানো রয়েছে। লক্ষীন্দরের বিবাহবাসরে মেয়েরা তাকে দেখতে এসেছে ; বিজয়গুপ্ত অত্যন্ত সরসভাবে তাদের বর্ণনা দিচ্ছেন,

কামবাণে বিকল আইও মুখে নাহি বাণী।
নিকটে থাকিয়া কেহ করে কাণাকাণি ॥
....
আর এক আইও আইল তার নাম রুই।
মস্তকে আছয়ে তার চুল গাছ দুই ॥
আর এক আইও বলে তার নাম পাই।
[illegible]

....

আর এক আইও আইল তার নাম রাধা।
সেও বলে তার স্বামী পোষণীয়া গাধা॥ ইত্যাদি

এইসব সজীব বর্ণনা এবং আদিরসাত্মক নর নারীর যৌন আচার সম্পর্কিত বাক্য যা গ্রাম্য রসিকতার প্রাণ এবং যা গ্রামের অলস মুহূর্তগুলিকে বাঁচিয়ে রাখে, তা অপ্রতুলভাবেই মনসা-মঙ্গল কাহিনীগুলোতে আশ্রয়লাভ করেছে। আর এ শুধু আশ্রয়লাভের কথা নয়, এসব যে কাহিনীতে বর্ণিত জীবনেরই অংগ, তারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই জীবনের মতই সত্য তাদের অধিকার ও স্বীকৃতি। জীবনের এই সাধারণ চিত্রের মধ্যে এবং বর্ণনার আকস্মিক ফাঁকে ফাঁকে এমনি ধরণের উক্তি যথা "কুশকাটা বামনা কিশের পাড়ে ডাক" (বিজয় গুপ্ত) "নৈবদ্য লুটিয়া খায় সোল স গাবরে" (নারায়ণ দেব) ইত্যাদি যেন প্রত্যক্ষভাবে সেই সময়ে চলতে-থাকা জীবনের মাঝখানে টেনে নিয়ে যায় আমাদের, এবং সেই সৃষ্টিশীল জীবনেরই অংশীদাররূপে যেন আমরা তা ভোগ করি। এখানে সমস্তই আমাদের পরিচিত, সকলেই আমাদের জানাশোনা ও দেখার মধ্যে; এবং সমগ্রভাবে এই জীবনটাও যেন আমাদেরই বৃহত্তর জীবন। কেবলমাত্র সত্য ও প্রবাহিত-হ'তে-থাকা জীবনই আমাদের উপর একটা দাবী করতে পারে এবং স্বীকৃতিও আদায় করতে পারে।

তেমনি, মনসার চরিত্রও আমাদের চেনা; অর্থাৎ, তাঁর আচরণ বলনচলন সাজসজ্জা রাগবিরাগ ইত্যাদি সমস্তই সম্পূর্ণ মানবিক, তৎকালীন সমাজ-অন্তর্ভুক্ত মানুষের। একদিকে তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী, তাঁর ক্রূরতা, জিঘাংসা অতুলনীয়। স্বার্থসিদ্ধির জন্য অত্যন্ত হীন উপায়ে আহার্যের সঙ্গে বিষ মিশ্রিত করে তিনি চাঁদের ছয়টি শিশুপুত্রের প্রাণ বিনষ্ট করেছিলেন। কিন্তু এতখানি শক্তির অধিকারিণী হ'লেও তাঁকে একান্ত মানবিক গুণের উপরই সর্বদা নির্ভর করতে হয়, ঘোরাফেরা করতে হয় মানবিক সম্পর্কের মধ্যেই। সামাজিক স্বীকৃতি লাভের জন্য কর জোড়ে চাঁদ সদাগরের নিকট প্রার্থনা জানাতে হয়—

চান্দর কোপ দেখি পদ্মার ভয় অতিশয়।
যোড় হাতে কহে দেবী করিয়া বিনয়॥

যাত্রাকালে দেব পূজ ফুলে আর ধূপেতে।
তেকারণে আসিলাম তোমার পূজা খাইতে॥
মোর ভয়ে কোপ এড় সাধুর কুমার।
মোর তরে ফুল জল দেও একবার॥

কিন্তু শঙ্করের প্রসাদ-প্রাপ্ত চাঁদ ব্রাহ্মণ্যসমাজ বহির্ভূত লোক-দেবতাকে স্বীকার করবেন কি করে। "দুষ্ট কাণী"কে তাই ভৎর্সনা করে তিনি পূজা প্রত্যাখ্যান করেন। শুধু তাই নয়, পদ্মাকে প্রহার করতে উদ্যত হন। আর অলৌকিক হয়েও পদ্মাকে নিতান্ত ক্ষুদ্র লৌকিক চাঁদের ধমকে থরথর করে কাঁপতে হয়, চাঁদের ভয়ে পিঠে ফুল ফেলে ছুটে পালাতে হয়।

গর্জ্জে গর্জ্জে চান্দ হেতাল লইয়া লাফে।
কলার বাকল হেন পদ্মার প্রাণ কাঁপে॥
দন্তে দন্তে দশনে করে কড়মড়।
প্রাণ লইয়া মনসা উঠিয়া দিল রড়॥
ত্রাসে যায় পদ্মাবতী আলুথালু চুলি।
পাছে পাছে ধায় চান্দ ধর ধর বলি॥

ইহাই অসম শক্তিধারিণী পদ্মাবতীর প্রকৃত পরিচয়। সুতরাং, দেখা যায়, পদ্মা অমানুষিক শক্তি ধারণ করলেও, তাঁর সৃষ্টি ও ধ্বংসের ক্ষমতাকে কোন সীমার মধ্যে ধরা না গেলেও, যে ভিত্তিকে আশ্রয় করে কাহিনী বিবর্তিত হয়েছে, তা মানুষেরই কামনায়-কল্পনায় মাখা শক্তি, শুধু অতিরঞ্জিত। এই শক্তিকে মানুষ কামনা করেছে। কেন না, বহু অকল্যাণকে তার জয় করতে হবে, বহু না-পাওয়াকে পেতে হ'বে, বহু চাওয়াকে তার পূর্ণতায় ভরে দিতে হবে। পারমার্থিক চাওয়া নয়, এই পৃথিবীতে থেকেই জীবনকে সৃষ্টি ও সুখী করার যে অদম্য তাগিদ আছে মানুষের প্রাণে, সেই তাগিদ অর্থাৎ ধনধান্য ঐশ্বর্য ও দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভের কামনাই তাকে ঐ অপরিমেয় শক্তির সন্ধানে উতলা করেছে। না-পাওয়ার যে বেদনা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে একটা করুণ রাগে আপ্লুত করে রেখেছে, মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলোর গ্রাম্য রসিকতা ও বলিষ্ঠ জীবনবোধের ফাঁকে ফাঁকে তার স্বাক্ষরও রয়েছে। বিবাহের পূর্বে বেহুলা দুঃখ করে বলেছে,

আইজ বিফল হইল ইরূপ জৌবন।
বিপদ কালে পদ্মা না দেয় দরশন॥
শূন্য হৈল ঘর শূন্য হৈল বাস।
বাহুড়িয়া না জাইব জীবন নইরাস॥
না দেখিম বাপ ভাই অন্ধকার রাতি।
অগ্নি কুণ্ডে প্রবেসিব গলায় দিয়া কাতি॥

(নারায়ণ দেবের গ্রন্থ)

আর লক্ষীন্দরের মৃত্যুর পর বেহুলা বিলাপ করে বলছে,

জে বিধি লিখিয়াছে অভাগীর কলেবর।
মহা সাঁপ দিব আজি বিধাতা উপর॥
সাপ দিয়া বিধাতারে করো ভষ্মরাসি।
বিধাতারে কি বলিব মুঞি কর্ম্ম দুসি॥ (ঐ)

এই যে নিরন্তর অভাব যা জীবনকে সর্বদা ঘিরে রেখেছে এবং জীবন-ভরানো পূর্ণ আনন্দের মাঝখানে যা অকস্মাৎ কালো ঝড়ের মত নেমে আসে, তার স্পর্শ থেকে মুক্তিলাভের জন্যই তো মানুষের সংগ্রাম ও আকৃতি। কিন্তু মানুষের যে সহজ শক্তি তা দিয়ে সে এই অকল্যাণকে দূর করতে পারে না; তাই প্রয়োজন তার সীমাহীন শক্তির, অপর্যাপ্ত আত্মবিশ্বাস ও অপরিমেয় সৃষ্টি-দক্ষতা। সেই শক্তিরই দেহ-রূপ পদ্মা ও চণ্ডী প্রভৃতি দেবতা। নিঃসন্দেহ যে, এই দেহ-রূপ মানুষেরই ভাবনা-কল্পনায় রচিত হয়েছে, তাই পদ্মা-চণ্ডীর আচরণও মানবিক। অলৌকিক শক্তির অধিকারীরূপে কল্পিত দেবদেবীকে এই যে মানব-সীমায় নামিয়ে আনা, সমাজ-সম্পর্কধৃত মানুষের আচরণের মধ্যে সৃষ্টি করা, তার তাৎপর্য এখানেই যে, মানুষের আত্মজ্ঞানের বাহন কাব্য পৌরাণিক ভাবাকাশ থেকে লৌকিক আকাশে ধীরে ধীরে নেমে আসছিল; কাব্য এবং লৌকিক জীবন ক্রমে পৌরাণিক ও অলৌকিক শক্তির কাল্পনিক প্রভাব থেকে মুক্ত হ'য়ে সহজ রূপ গ্রহণ করছিল। জীবনটা স্বর্গীয় না হয়ে পার্থিব হয়ে উঠছিল এবং কাব্যও স্বর্গকে রূপ না দিয়ে পৃথিবীকে সৃষ্টি করে চলছিল।

বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গলের আরও একটি বর্ণনার ভিতরে আমরা লোক-জীবন ও লোক-মানসের সংগে পরিচিত হই। "লক্ষীন্দর জীয়ান" প্রসঙ্গে তিনি পদ্মার বিষ দূরীকরণ ক্রিয়া বর্ণনায় বলছেন,

ও বিষ নাইরে।
লখাইর শরীরে বিষ নাইরে॥ (ধুয়া)
রক্ত পড়ে পুঁয পড়ে পানী।
ওলা কালকূট বিষ আঙ্গের কাহিনী॥
গাঙ্গের কিনারা দিয়া বাহিয়া গেছে লতা।
পদ্মাবতী মৎস্য মারে বাজে ধরে নেতা॥
কূলে থাকি ধোপাঝী হাসি গড়ি যায়।
ধনন্তরির আজ্ঞায় বিষ ঘা মুখে আয়॥
ক্ষীর সিন্ধুজলে আছে ডোমুনীর ঘর।
শিবের স্মরণে বিষ ঘা মুখে মর॥
কাকা বলে কাকী লো হের দেখ রঙ্গ।
শিবেরা বাপে ঝী দোঁহে যায় সঙ্গ॥
ইহা শুনীয়া কাঁকর হইয়া গেল বিষ।
ক্ষয় যা ভস্ম যা কালকূট বিষ॥
[ও বিষ নাইরে।
লখাইর শরীরে বিষ নাইরে॥]

এই কয়েকটি লাইন নিশ্চিতরূপে আদিযুগের ম্যাজিকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, এবং সে যুগের সাধারণ জীবনের সংগে মধ্যযুগীয় বাংলার সাধারণ জীবনের যোগসূত্র স্থাপন করে। প্রাচীন কালের মানুষ বৃষ্টি কামনা ক'রে কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের অভিনয় করে আকাশের বৃষ্টিকে মাটির বুকে আহ্বান করতো; মাটীতে লুকানো ফসলকে ফলানোর জন্য কৃত্রিম ফসল ফলানোর অভিনয় করতো;—তার মূল উদ্দেশ্য একটা সহানুভূতিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে তাদের আগমনকে সহজ সুগম করা। উপরের ক'টি লাইন ঐসব কর্মের সমশ্রেণীর না হলেও তাদের স্মৃতিবহ। বিষ নেই বিষ নেই বলে গানের সুরে এমন একটা ভাবময় সংবেদনশীল আবহাওয়া রচনা করা, যাতে এই পরিবেশের প্রভাবে বিষ আপনা থেকেই নিজেকে সরিয়ে দেয়, আপনা থেকেই

নিজেকে ক্ষয় করে দেয়। অকল্যাণকে দূর করার এই কার্যক্রম থেকে এটাও নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানুষ তখনও যথেষ্ট শক্তিমান হয়নি, বা প্রয়োজনীয় সমরোপকরণও তার আহরিত হয়নি এবং জীবন ও পৃথিবী সম্পর্কে তার চিন্তাও বেশীদূর অগ্রসর হয়নি। এই ইংগিত যথার্থ এবং সত্য; তাই সুপ্রাচীন কাল থেকে সুরু করে বহু যুগ পার হয়ে তা আমাদের কালের মানুষের মধ্যেও এই আচরণের পরিচয় পাওয়া যায়।

সুতরাং সর্বদিক থেকেই—কাহিনীর দিক থেকে, পাত্রপাত্রীর আচরণের দিক থেকে, সমাজ সংস্কৃতির দিক থেকে—এই কাব্য লৌকিক জীবনের উপরই প্রতিষ্ঠিত, জীবনের রং-এ আঁকা।

কিন্তু এসব দিক ছাড়াও একটা বিস্ময়কর মানবিক দিক আছে মনসা মঙ্গল কাব্যের, সেটা চাঁদ সদাগর চরিত্র। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মনসামঙ্গল গতি-হারিয়ে ফেলা শৈব প্রভাবের বিরুদ্ধে সৃষ্টিধর্মী শক্তির (পদ্মার) সংগ্রাম ও স্বীকৃতি লাভের কাহিনী নিয়ে লেখা। চাঁদ শিবের অনুরাগী ভক্ত, এবং সমাজে শৈব-প্রভাবের ধারক; সেক্ষেত্রে, শৈবপ্রভাবের বিলোপ এবং শক্তি-প্রভাবের উদ্ভব যে কাব্যের উপজীব্য, সেখানে চাঁদ সদাগরকে বিশেষ কোন শ্রেষ্ঠত্ব বা মহিমায় পরিমণ্ডিত না করলেও চলতে পারত; বরং চাঁদকে নিন্দিত করে চিত্রিত করাই স্বাভাবিক। কিন্তু মনসামঙ্গল কাব্যগুলোতে আমরা যে চাঁদের সংগে পরিচিত হই, সে কোনদিক থেকেই ক্ষুদ্র, হীন, নিন্দিত, অশক্ত নয়; বরং অতুলনীয় সংগ্রাম, দৃঢ়চিত্ততা ও সহনশীলতায় মহীয়ান; কোন বিপর্যয়ই তাকে নোয়াতে পারেনি, কোন পরীক্ষাই তাকে ভাঙেনি, ভেঙেছে সর্বশেষে স্নেহপ্রীতি ভালবাসার দাবী। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, চাঁদের বিরুদ্ধবাদী শক্তিকে যেখানে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, সেখানে সামাজিক প্রয়োজনহীন ভাবাদর্শের ধারক চাঁদকে এতবড় ও মহীয়ান করে চিত্রিত করা হলো কেন? এবং তার তাৎপর্যই বা কি? মনসামঙ্গল কাব্যের কবিদের সম্পর্কে অবশ্য বলা যেতে পারে যে, তাঁরা পক্ষপাতদুষ্ট নন; সামাজিক ও ভাবের ক্ষেত্রে তাঁরা দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবধারা ও শক্তির বিরোধ ও সংগ্রাম লক্ষ্য করেছেন, নিজেদের চারিদিকের আবহাওয়ায় সেই বিরোধের তরঙ্গ অনুভব করেছেন, এবং অভিজ্ঞতা-লব্ধ এই সত্যকেই তাঁরা রূপায়িত করেছেন। সম্ভবত তাই; এবং সেক্ষেত্রেও এটা অনুমান করা যেতে

পারে যে, সামাজিক কর্তৃত্ব ও প্রভাব হারিয়ে-ফেলা সামাজিক শক্তির পরাজয়ের দিনে সেই শক্তির প্রতি প্রাধান্য-লাভ করতে-থাকা সামাজিক শক্তির অবজ্ঞা, নিন্দা উপহাস ও অশ্রদ্ধার মনোভাবও বাস্তব সত্যেরই অপরিহার্য অঙ্গ। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে নিন্দিত চাঁদের পরিচয় থাকা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা প্রসূতই হোক অথবা ভাবনা কল্পনার বর্ণে রঙীনই হোক, কবি-কর্মের মাধ্যমে যে চাঁদ রূপায়িত হয়েছে, সে আমাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার অধিকারী। তাই এই প্রশ্নের উত্তর অন্যত্র সন্ধান করতে হবে।

কবি-কর্ম একটা অখণ্ড মানস-পরিমণ্ডলের ফসল; বহু বিচিত্র উৎস থেকে রস আহরণ করে এই পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। পৌরাণিক ভাবাদর্শকে উপেক্ষা করে লৌকিক জীবনাদর্শ সে যুগে প্রাধান্যলাভ করছিল; সামাজিক ক্ষেত্রে সামাজিক নিম্নবর্ণগুলো সমাজ-বিধায়কদের কাছ থেকে নিজেদের স্বীকৃতি আদায় করছিল। এবং এই সব কর্মের ভিতর লৌকিক জীবন নিজেকে সৃষ্টি করছিল। এই সংগ্রামের ভেতর দিয়ে মানুষ তার অন্তর্নিহিত অপরিমেয় শক্তির সন্ধান পেয়ে থাকবে, এবং সেই শক্তি দিয়েই সে জানতে চায় তার পরিবেশকে; আর সেই শক্তির সাহায্যেই সে মুক্তি লাভ করে পরিবেশের অকল্যাণকর প্রভাব থেকে। পৌরাণিক এবং সামাজিক উচ্চবর্ণের বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম যেমন তার মানস-পরিমণ্ডলের অঙ্গীভূত, তেমনি কাল্পনিক দেবদেবী ও শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তার মানবিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করাও সম্ভবত সেই মানস পরিবেশেরই অঙ্গ। কবি সম্ভবত সে যুগের মানুষের সংগ্রামের এই ব্যাপক রূপটাকে উপলব্ধি করেছেন; বিভিন্ন ভাবাদর্শের সংঘাতকে তিনি যদি দেখে থাকেন তাঁর চোখের দৃষ্টিতে, মানুষের মহিমাকে তিনি দেখেছেন অন্তর দিয়ে। তাই অন্তহীন যাঁর দেওয়ার ক্ষমতা সেই দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়েও কবি মানুষকে ভোলেননি, তার শ্রেষ্ঠতাকে অশ্রদ্ধা করেননি। অন্যের কৃপা গ্রহণের মধ্যে মানুষের মহিমা নেই, মহিমা তার সংগ্রামে, প্রতিকূল পরিবেশকে জয় করে নিজেকে সৃষ্টি করার মধ্যে। তাই যদিও চাঁদের পরাজয় একটা নিশ্চিত সত্য, তথাপি পদ্মার বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম মহিমময়; কারণ, অনাত্মীয় পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মানুষ প্রকাশ করতে চাইছে নিজেকে। আর এর মাধ্যমেই ভাষা পেয়েছে কবি-মনের সমস্ত সঞ্চিত মানবিকতা-বোধ, মানুষের সংগ্রামের

গৌরব, তার সৃষ্টি-কর্মের শ্রেষ্ঠতা। সার্থক কবি-দৃষ্টিতে তাই চাঁদ সদাগর চরিত্র এ থেকে ব্যতিক্রম হতে পারতো না বলেই মনে হয়।

আর, সম্ভবত এমনি কর্মের ভেতর দিয়ে মানুষ বিরুদ্ধাচরণ করতে শিখেছে তার দেবতারও।

এই কাহিনীই সমগ্র পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতি বৎসর, বিশেষত বর্ষার আগমনে যখন সর্প-অত্যাচার বিশেষ বৃদ্ধি পায়, তখন পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার প্রতিটি গ্রামে প্রতিটি পরিবারে মনসা পূজা অনুষ্ঠিত হ'তো, আর প্রায় প্রতিটি ঘরেই শ্রদ্ধা, ভয় ও শুভ ফলের কামনায় মনসার গুণ ও কাহিনী কীর্তিত হ'তো। অনেক সময় দিবারাত্র এবং পালা করে এই কাহিনী পাঠ করা হ'তো। তখনকার বাংলায় বৈজ্ঞানিক বিধিসম্মত জাতি বাংলাদেশে গড়ে ওঠেনি, তথাপি যে ভাবে পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ কাহিনী বিস্তৃতি ও সমাদর লাভ করেছিল, যেভাবে তা মানুষের মনকে প্রভাবিত করেছিল, যেভাবে এই কাহিনীকে আশ্রয় করে বাংলার প্রাক-আর্য লোক-সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা ব্রাহ্মণ্য সমাজে নিশ্চিত স্থায়ী-স্বীকৃতি অর্জন করেছিল, তাতে ঐ অঞ্চলে এই কাহিনী জাতীয় সাহিত্যের মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ কাহিনীকে আশ্রয় করে ঐ অঞ্চলের লোক-জীবনের আশা-আকূতি ব্যর্থতা সাথকতা আর ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সার্থকভাবে রূপায়িত হ'য়ে উঠেছে। এই কাহিনীই সেই কালের সেই সমাজের সাধারণ মানুষের মানস-জীবনের প্রতিচ্ছবি, তার জীবন-কাব্য।

ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত কাণা হরিদত্ত থেকে আরম্ভ করে নারায়ণদেব, বিজয় গুপ্ত, দ্বিজ বংশীদাস, ক্ষেমানন্দ, জগজীবন ঘোষাল, ষষ্ঠিবর দত্ত, জীবন মৈত্র, বিষ্ণু পাল, বাণেশ্বর রায় প্রভৃতি অসংখ্য কবি এই কাব্য সৃষ্টিতে হাত লাগিয়েছেন (উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্তও বিবিধ কবি এই কাহিনী নবভাবে রচনা করেছেন)। বাস্তব জীবনের স্থির সত্য আবেদন ও সৃষ্টির আকূতিতে বহু কবি-মন অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠেছে। তাঁদের রচিত কাহিনীর মধ্যে সুরের ওঠা-নামা, ঘটনার ব্যতিক্রম, প্রকাশের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকা স্বাভাবিক, এবং তা আছেও। কিন্তু, এই ব্যতিক্রম এবং পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ, কাব্যের আবেদন এক এবং অভিন্ন, ইহাদের মূল সুর এক গ্রন্থিতে বাঁধা। বিভিন্ন কবি-মন ও

কল্পনাকে আশ্রয় করে একটি প্রবহমান বিরাট জীবন যেন একই কথা বলতে চেয়েছে, একই সত্যকে প্রকাশিত করেছে।

ব্রাহ্মণ্য সমাজের বাইরে এই কাহিনী সর্বপ্রথম অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল, তা নিঃসন্দেহ। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলা পরিবেশে দেখতে পাই, ব্রাহ্মণ্যসমাজের অন্তর্গত সর্বোচ্চ বর্ণের কবিরাও এই কাহিনীকে নিজস্ব করে নিয়েছেন, এবং একে উপজীব্য করে তাঁদের বিচিত্র কবি-কল্পনার স্ফূর্তির অবকাশ খুঁজেছেন। সুতরাং, এই পর্বে প্রাক্-আর্য বাংলার লোক-জীবন, লোক-মানস ও সংস্কৃতি যে নিশ্চিত বিজয়ে ব্রাহ্মণ্য সমাজের অন্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছে, তাও নিঃসন্দেহ।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলির মত ধর্মমঙ্গলও আর্যেতর সংস্কৃতির স্মৃতিবহ। ধর্মপূজা সম্পর্কে 'শূন্যপুরাণ'-এর ভূমিকায় বলা হয়েছে, "ত্রিপুররাজ ডোম-রমণীকে শক্তিরূপে গ্রহণ করিয়া ডোমরাজা বা ডোম আচার্য্য নামে পরিচিত হন। তাঁহার অপর নাম হয় ডোম-পা। তিব্বতী ডোম-পা শব্দের অর্থ ডোমনীর পতি। এই ডোম-পা তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ হইয়া ধর্ম্মপূজা প্রচার করেন—তাঁহারই দ্বারা ধর্ম্মপূজা ত্রিপুর হইতে বঙ্গে রাঢ়ে প্রচারিত হয়।.........এইজন্য বোধ হয় ধর্ম্মপূজকদের ডোম-পণ্ডিত বলে। যাত্রাসিদ্ধি রায়ের পদ্ধতিতে দেখা যায়, রামাই পণ্ডিতের পুত্র ধর্ম্মদাস পিতার শাপে ডোমের পুরোহিত হন।—

ধর্ম্মদাস বলে গোসাঞি করি নিবেদন।
কি রূপেতে বংশ মোর হইবে এখন॥
এত শুনি ক্রোধে বলে রামাই পণ্ডিত।
কলিকালে হ'বে তুমি ডোমের পুরোহিত॥" (১)

ধর্মপূজার প্রচার-প্রচলন সম্পর্কে এ মত সর্বজনগ্রাহ্য নয়। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের সিদ্ধান্ত, ধর্মপূজা পশ্চিম বাংলার অনার্য-অধ্যুষিত রাঢ় অঞ্চলেই মূলত উদ্ভূত হয়, এবং কালক্রমে রাঢ় ও তৎ-সংলগ্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। রাঢ় সুদীর্ঘকাল ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব প্রতিরোধ করে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিল; মহাবীর এখানে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হয়েছিলেন। ধর্ম-পরিকল্পনা ধর্মপূজা ও কাহিনীর অন্তরালে সেই আলোক-স্পর্শহীন আদি মনের স্বাক্ষর বর্তমান, ব্রাহ্মণ্য সংস্কার-সংস্কৃতি কর্তৃক নিন্দিত অশোভন অমার্জিত আচার-আচরণ বিধি-ব্যবহার ইত্যাদিরই স্বীকৃতি।

১ শূন্যপুরাণ; বসুমতী সংস্করণ, পৃ ১১৭-১১৮

অবশ্য, সাংস্কৃতিক সংযোগ-বিয়োগের ফলে এই অনার্য-মানসও আর্য ভাবধারা কর্তৃক প্রভাবিত হয়; তাই দেখা যায়, কোন কোন অঞ্চলে ধর্মঠাকুর বিষ্ণুরূপে পূজিত, কূর্মরূপে চিহ্নিত। কিন্তু, পরবর্তীকালের এই ব্রাহ্মণ্য প্রভাব সত্ত্বেও ডোম, চাড়াল, ধোপা, বারুই, শুড়ি প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায়ই ধর্মঠাকুরের প্রকৃত পূজারী। ধর্মপূজক রাঢ়বাসীরা ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিতে সর্বথা ঘৃণ্য এবং নিন্দনীয়ই ছিল। কবি মুকুন্দরাম ষোড়শ শতকে বলছেন, "অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়। কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়॥" "ব্যাধ গোহিংসক রাঢ় চৌদিকে পশুর হাড়।" ইত্যাদি।

এই 'চোয়াড়'-রাই তাদের জ্ঞানচক্ষুহীন ধ্যানধারণা ও মানস দিয়ে গড়েছে ধর্মঠাকুরের ভাবরূপ, এবং তারই উদ্দেশে দিয়েছে নৈবেদ্য। ধর্ম-ঠাকুরের রূপ প্রকৃতি এবং নৈবেদ্যাদিতে অনার্য মননশীলতার ছাপ সুস্পষ্ট। ধর্মঠাকুরের কোন মূর্তি নেই; এক খণ্ড পাথরই ঠাকুররূপে পূজিত। কোন কোন মন্দিরে তিনি অবস্থান করেন আচ্ছাদিতভাবে, বাইরে থেকে কেউ তাঁকে দেখতে পায় না। কোন কোন স্থানে এই পাথরের গায়ে টুকরো টুকরো চাঁচ বা পিতলের পেরেক বসানো। এসব নাকি ধর্ম-ঠাকুরের চক্ষু। কোন ভক্ত চক্ষুরোগ মুক্ত হ'য়ে দেবতার সন্তুষ্টির জন্য এসব ঠাকুরকে উপহার দেয়। আবার মনস্কামনা সিদ্ধ হ'লে কেউ কেউ উপহার দেন মাটির ঘোড়া। বিশ্বাস, ঠাকুর এই মাটির ঘোড়ায় চড়ে তার আহ্বানে সাড়া দিতে আসবেন। (২)

তাছাড়া ধর্মপূজার সঙ্গে যে আচার পদ্ধতি, বিধিবিধান প্রকরণ অর্থাৎ যে সংস্কার ও মানস জড়িত তা নিঃসন্দেহে আর্যেতর সংস্কৃতির স্মারক। মদ, মাংস, পিষ্টক ইত্যাদি ধর্মপূজার নৈবেদ্য। রূপরাম চক্রবর্তী লিখেছেন,

> তবে আত্ম পূজা দিল আশোয়া চণ্ডাল।
> মদের পুষ্করিণী দিল পিষ্টের জাঙ্গাল॥
> বুনিল সিজন ধান হইল অঙ্কুর।
> ধূসদত্ত বণিক পূজিত উবৎপুর॥

---

২ আশুতোষ ভট্টাচার্য-কৃত বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস; পৃ ৪৭৫ ও ৪৮২।

ধর্মের গাজনে কোন কোন স্থানে ধর্মকে মদে স্নান করানোর ব্যবস্থা আছে, এবং পূজায় হাঁস, ছাগ, শূকর ইত্যাদি বলি দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে। অর্থাৎ, মাটীর পৃথিবীতে বিচরণশীল মানুষের যেসব আহার্য ও পানীয়ে পরিতৃপ্তি, দেবতার জন্যও তারই পর্যাপ্ত ব্যবস্থা; সেই খাদ্য পানীয়ে তাঁরও অবশ্যম্ভাবী পরিতৃপ্তি।

কিন্তু, এই দেবতার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য মানুষকে অসাধ্যসাধন করতে হয়; কৃচ্ছ্র সাধনা দ্বারা অমানুষিকভাবে নিজেকে নির্যাতন করতে শিখতে হয়। আর এই নির্যাতনের কোন যুক্তিবহ পর্যায় নেই, এ ভয়াবহ এবং আত্মবিধ্বংসী, অপৌরুষেয় ও অশ্রদ্ধেয়। পুত্রবর-প্রার্থী রাণী রঞ্জাবতীর কৃচ্ছ্র সাধনের দুটো চিত্র থেকে এর ভয়াবহতা অনুমান করা যাবে;

গলায় জিজির বান্ধা দুই পায়ে বেড়ি।
লোহার শিকল কড়ে যায় গুড়ি গুড়ি॥
হরি বলে সন্ন্যাসী ভকিতা দুই ভাগে।
আগুনে চলিয়া যায় পুত্রবর মাগে॥
মরমে বিকল হয়্যা বলে ঘন ঘন।
এক পুত্রবর মাগি প্রভু নিরঞ্জন॥
এত বলি আগুন উপরে আইসে যায়।
তথাপি চাঁপাই তীরে বর নাহি পায়॥

তাতেও পুত্রবর না পেয়ে রাণী শালে ভর দিলেন অবশেষে;

শালের উপরে ভর দিলা দড়বড়ি।
ঝুপ কর‍্যা ঝাঁপ দিল শাল হৈল ভেড়ি॥
বুকেতে বাজিল শাল পৃষ্ঠে হৈল পার।
খানি খানি হৈল রাণী রক্ষা নাহি আর॥
নাকে মুখে রুধির ভাসিল চারি ভাগে।
মরিতে মরিতে মনে পুত্রবর মাগে॥
সর্ব্বতনু বিন্ধিল রক্তের কুলকুলি।
সামুলা আমিনী দেই জয় হুলাহুলি॥

এমনি ধরণের সীমাহীন দুঃসহ আত্ম-নির্যাতনের পথেই ধর্ম-ঠাকুরের প্রীতি উৎপাদন করতে হয়, এবং এই প্রীতি-উৎপাদনের পথেই সিদ্ধ হয় মানুষের মনস্কামনা।

এই সাধনা নিঃসন্দেহে মানুষের পক্ষে—বিশেষ করে আত্মসচেতন ও আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ মানুষের পক্ষে—অবমাননাকর, এবং অবমাননাকর বলেই সম্ভবত ব্রাহ্মণ্য সংস্কার সংস্কৃতি আশ্রয়ী ও ব্রাহ্মণ্য চিন্তাধারায় বিশ্বাসী মানুষের পক্ষে ধর্মপূজা এবং ধর্মপূজা সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করা ছিল নিন্দনীয়। ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়ে ধর্মপূজা করলে অথবা ধর্মের জয়গান করলে হয়তো সমাজে পতিত হ'তে হ'তো, এইরূপ একটি ইংগিত মানিক গাঙ্গুলীর রচনায় আছে,

জাতি যায় তবে প্রভু যদি করি গান॥
অচিরাৎ অখ্যাতি হ'বেক দেশে দেশে।
স্বপক্ষের সন্তোষ বিপক্ষ পাছে হাঁসে॥

ঘনরামও লিখেছেন,

শুনি অসম্ভব ভাষে লোকে পাছে উপহাসে,
তায় তুমি আপনি প্রমাণ।

সীতারাম দাসও তাই দুঃখ করেছেন

নম ধর্ম্মঠাকুর অধর্ম্ম কর দূর।
আমার কপাল দোষে বিধাতা নিষ্ঠুর॥
ওহে [প্রভু তোর] দয়া বুঝা নাই গেল।
তুমি কি করিবে আমার কপালে আছিল॥
কপালের লেখা কভু না হয় খণ্ডন।
[জামকুড়ির বনে] দেখা দিল নিরঞ্জন॥ (৩)

কিন্তু সমাজে পতিত এবং নানাভাবে নিগৃহীত হওয়ার আশংকা সত্বেও ব্রাহ্মণ্য সমাজসংস্থায় অধিষ্ঠিত কবি ধর্মমঙ্গল রচনা করেছেন, এবং ধর্মঠাকুরের নিকট আত্মনিবেদন করেছেন। কেন এমন হলো, অথবা কিভাবে ব্রাহ্মণ্য চিন্তা ও সংস্কৃতি-আশ্রয়ী কবিগণ এই অনার্য দেবতার প্রতি আকৃষ্ট

৩ এ লাইন কয়টি সুকুমার সেনের "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" গ্রন্থে উদ্ধৃত; পৃ ৬৮১।

হ'লেন, সে সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেওয়া একান্তই স্বাভাবিক। এই প্রশ্নের উত্তরও কষ্টসাধ্য নহে। বাংলা মঙ্গলকাব্যসমূহের ভিতর দিয়ে, এবং আর্যধর্মী দেবতাদের ওপর অনার্যের প্রাণধর্মী শক্তি ও দেবতার বিজয়ের মাধ্যমে বাংলার ব্রাহ্মণেতর জনসমষ্টির অভ্যুদয় হয়ে চলছিল, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ওপর লৌকিক সংস্কার-সংস্কৃতির বিজয় ঘোষিত হচ্ছিল। অবনমিতের জীবন-দর্শন সমাজ-সত্য রূপে ব্যবহারিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলছিল। ব্রাহ্মণ্য সংস্কার-আশ্রয়ী কবিদের ধর্মঠাকুরের জয়গান ও ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনার ভিতর দিয়ে সেই ইতিহাসই অভিব্যক্ত হয়েছে। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, অনার্য লৌকিক দেবতার শক্তিকে অর্থাৎ লৌকিক ভাবধারা ও জীবনবোধকে ব্রাহ্মণ্য সমাজকে স্বীকার করে নিতে হয়েছে, আর সংগে সংগে লৌকিক জীবনও প্রাধান্য অর্জন করেছে। ধর্ম-মঙ্গল কাহিনীর মধ্যেও তার স্বাক্ষর রয়েছে।

রূপরামের ধর্মমঙ্গলে দেখতে পাচ্ছি, হনুমান ধর্মঠাকুরকে বলছেন যে, চারিযুগে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচলিত ছিল; বিভিন্ন ব্যক্তি নানাভাবে তাঁর পূজা করেছে। কিন্তু,

তথাপি তোমার পূজা না ছিল ভুবনে ॥
পশ্চিম-উদয় হইলে পরিপূর্ণ হয়।
তেকারণে তব প্রজা সর্ব্ব ঠাঞী রয় ॥

সম্ভবত ধর্মপূজা নির্দিষ্ট অঞ্চল ছাড়া খুব ব্যাপকতা অর্জন করেনি, ইহাই কবি বলতে চেয়েছেন। এই ধর্মপূজাকে পৃথিবীতে সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলার জন্যই ইন্দ্রের নর্তকী জাম্বুবতী পৃথিবীতে রঞ্জাবতী নামে অবতীর্ণ হয়, এবং শালে ভর দিয়ে ধর্মঠাকুরের আশীষে লাউসেনকে পুত্ররূপে লাভ করে। এই লাউসেনকে কেন্দ্র করে একদিকে লৌকিক জীবন এবং অন্যদিকে অনার্য দেবতার পরিমিতিহীন শক্তি ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। লাউসেন শাপভ্রষ্ট দেবতা, পৃথিবীতে ধর্মঠাকুরের মহিমা প্রচারের জন্য তার আগমন, সুতরাং সর্বসময়েই ধর্মঠাকুরের শুভ কৃপাদৃষ্টি তার উপর বর্ষিত; লাউসেন সমস্ত দিক থেকে—রূপে বিদ্যায় চরিত্রে—একজন পরিপূর্ণ মানব। অপরিসীম তার শারীরিক সামর্থ্য, বুদ্ধি ও সর্বকার্যে পারদর্শিতা। ছদ্মবেশী হনুমান তাঁকে মল্লবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছে, দেবী ছদ্মবেশে তাকে পরীক্ষা করতে এসে সন্তুষ্ট হয়

জয়থড়্গ উপহার দিয়ে যান এবং স্বয়ং ব্রহ্মা সেই খড়্গের ফলা নির্মাণ করে দেন। এমনিভাবে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়ে লাউসেন একাকী মহামদ প্রেরিত আটজন মল্লকে পরাস্ত করে; বাঘ কুম্ভীর ইত্যাদি হত্যা করছে; একটি হাতী বধ করে পুনরায় তাকে বাঁচিয়ে তুলছে, একটি গাছ ধ্বংস করে তাকে পুনরুজ্জীবিত করছে; পরাক্রমশালী শত্রুপক্ষকে অনায়াসে পরাজিত করছে. কামরূপের রাজাকে পরাজিত করছে, সিমূলের রাজার লৌহ গণ্ডারের মুণ্ডচ্ছেদ করছে, ঢেকুরের ইছাই ঘোষকে হত্যা করছে, এবং সর্বশেষে কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা ধর্মঠাকুরের বরে পশ্চিমদিকে সূর্যোদয় করাতে সমর্থ হয়েছে। অর্থাৎ যতো রকমের সম্ভব এবং অসম্ভব কর্ম মানুষের কল্পনায় ধরা দেয়, লাউসেন তার সমস্ত কিছুকে বাস্তব কর্মের মধ্যে অত্যন্ত সার্থকভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম, সীমাহীন শক্তিকে পৃথিবীর ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে সৃষ্টি করতে সমর্থ। কারণ যে দেবতার সে নির্বাচিত প্রতিভূ, তাঁর ক্ষমতার কোন পরিমাপ নেই, সৃষ্টি ও ধ্বংস এই উভয়বিধ কর্মে তিনি বে-হিসেবী, আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও তিনি অবিসংবাদী নির্মাতা। সুতরাং দেবতার গুণ সর্বাংশে তাঁর প্রতিভূতে বর্তাবে, তা নিঃসন্দেহ। এদিক থেকে ধর্মমঙ্গল এবং অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলির পটভূমি এক। তাই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রীমন্তর ন্যায় ধর্মমঙ্গল কাব্যের লাউসেনের মধ্যেও সমকালীন মানুষ তার খণ্ডিত ও সীমাবদ্ধ শক্তি সামর্থকে বহুগুণ পরিবর্ধিত ও বিস্তৃত করে এক অখণ্ড ও সীমাহীন শক্তির কল্পনা করেছে, যে শক্তি অক্লেশে সংসারে অবাঞ্ছিত আপৎকে, অশ্রদ্ধেয় অকল্যাণকে দূর এবং অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করে ভরে দিতে পারে।

তেমনি, অপরদিকে, লাউসেনকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণ্য সমাজ-সংস্থার বাইরে অধিষ্ঠিত বর্ণেরা প্রতিষ্ঠা অর্জন করছে, দেখতে পাই। লাউসেন গৌড়েশ্বরের নিকট থেকে ময়না তালুক ইজারা পেয়েছিল। গৌড়ে প্রত্যাবর্তন কালে তার সংগে কালু ডোম, তার পত্নী লখাই ও তাদের পুত্র-অনুচরাদির সংগে পরিচয় হয়। লাউসেনের অনুরোধে এরা ময়নায় বসবাস করতে থাকে। কালু ডোম লাউসেনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রিয় পার্ষদে পরিণত হয় এবং নানা সময়ে অসামান্য শক্তি সামর্থের পরিচয় দেয়। কিন্তু, তার পত্নী লখাই একটা অনন্য-সাধারণ মহিমায় মণ্ডিত হয়ে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। লাউসেন যখন পশ্চিমে সূর্যোদয় সম্ভব করার জন্য ধর্মঠাকুরের সাধনায় ব্যস্ত, তখন মহামদ ময়না অধিকার

করার জন্ত সসৈন্তে যাত্রা করে। মহামদ লোভ দেখিয়ে কালুকে নিশ্চেষ্ট করে রাখে, তখন লখাই একাই যুদ্ধ করে মহামদের সৈন্তদলকে প্রতিরোধ করে। মন্ত্রবলে মহামদ ময়নার সমস্ত লোককে নিদ্রাভিভূত করে ময়না অধিকারে উদ্যত হয়; তখন লখাই তার পুত্রকে যুদ্ধে পাঠায়, সে নিহত হয়; পরে বহুবিধ অনুরোধ উপরোধ করে স্বামী কালুকে যুদ্ধে পাঠায়, এবং মৃত পুত্রের শোক বুকে নয়ে যুদ্ধের ফলাফলের প্রতীক্ষা করতে থাকে; কিন্তু কালুও যুদ্ধে নিহত হয়। লাউসেনের প্রতি অমলিন আনুগত্যে লখাই-চরিত্র হয়ে উঠেছে ভাস্বর।

এমনি আরেকটি চরিত্র হরিহর বাইতি। হরিহর বাইতি ছিল লাউসেনের পশ্চিমে সূর্যোদয় সাধনের সাক্ষী। মহামদ তাকে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার জন্ত প্রলোভন দেখায়, কিন্তু হরিহর অটল, স্থির। সে মিথ্যা অভিযোগে শূলে প্রাণ-ত্যাগ করলো, কিন্তু মিথ্যা সাক্ষী দিলো না। কবির অন্তর্নিহিত সমবেদনা এই চরিত্রের সংগে মিশে একে করে তুলেছে অপরূপ, এবং নমস্ত। ব্রাহ্মণ্য সমাজের নিকট নিন্দিত ও ঘৃণিত এইসব চরিত্রের এমনি মাধুর্য ও মহানুভবতা বিস্ময়কর, কিন্তু এর তাৎপর্য স্পষ্ট। মনে হয়, এই স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে ঐসব বর্ণাশ্রম বহির্ভূত সম্প্রদায় ও ঘৃণিত বর্ণসমূহের অন্তর্নিহিত মানবতাই অমলিনভাবে নিজেকে ঘোষণা করেছে, এবং সহজ অধিকারের বলেই তার যে মর্যাদা প্রাপ্য, সে তা নিশ্চিতরূপে আদায় করে নিয়েছে। ব্রাহ্মণ্য সমাজ-সংস্কার দুরতিক্রম্য দেওয়াল ভেদ করে বাংলার আর্যেতর লৌকিক জীবন এমন ভাবে জেগে উঠেছে যে তাকে কোনক্রমেই অস্বীকার করা যাচ্ছে না, তার বিভিন্ন ঐশ্বর্যে মণ্ডিত নিজস্ব জগত ইতিমধ্যেই সৃষ্টি হয়ে চলেছে। তারই স্বীকৃতি সম্ভবত লখাই ও হরিহর বাইতি চরিত্র।

এই সাধারণ মানুষ তাদের বস্তুনিষ্ঠ ও প্রাণধর্মী জীবনদৃষ্টি নিয়ে নিজেদের জীবনকে সৃষ্টি করার প্রয়াস পাচ্ছিল। ধর্মমঙ্গল কাব্যের উৎসভূমি রাঢ় চিরকালই বীরের আবাসভূমি। এ অঞ্চলের অনার্য অধিবাসীরা অপার্থিব অলৌকিক শক্তির উপর নির্ভরশীল নয়, মনস্কাম সিদ্ধির জন্ত তারা চিরকালই নির্ভর করেছে আত্মশক্তির উপর। এই আত্মশক্তি বা পুরুষকারই দৈবের উপর জয়ী হয়েছে। প্রতিকূল ঘটনা বৈচিত্র্যের তুলনায় তাদের প্রয়াস যে প্রায়শঃই অক্ষমতায় পর্যবসিত হচ্ছিল, তাও অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু তা সত্বেও, জীবনকে কোন বিশেষ কালের অক্ষমতার মধ্যে সীমিত করা যায় না,—তা' আপনারই প্রেরণায়

প্রবাহিত হতে থাকে। ধর্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যেও সেই প্রবাহেরই লীলা। সেই প্রেরণারই অভিব্যক্তি।

মঙ্গলকাব্যের সাধারণ পরিস্থিতি নানাদিক থেকেই অরাজক, জীবনের পরিপন্থী; ইতিপূর্বে তা আলোচিত হয়েছে। এই অরাজক পরিস্থিতির স্বাক্ষর ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যেও বর্তমান। ধর্মমঙ্গল কাব্যের অনেক কবি ব্যক্তিগত জীবনের অশেষ দুঃখ যন্ত্রণায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে গৃহত্যাগী হয়েছিলেন; কিন্তু তাঁদের একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়াও দেশের সাধারণ অবস্থার পরিচয় তাঁদের কাব্যে রয়েছে। রূপরামের কাব্যের একস্থানে আছে,

ধান-কাপাস বিনা মোর গ্রহ হল্য টুট।
চালু কলাই দেশের বান্দরে করে লুট॥
বিয়োগে বিপাকে দুঃখ সর্ব্বনাশ হল্য।
অন্ন বিনা অকালে জুওান বেটা মৈল॥ (অন্ত ঢেকুর পালা)

এই সত্য-চিত্রের আরেকটা দিকের পরিচয় পাই রামদাস আদকের গ্রন্থে; কবি বলছেন,

দেশে খাজনার তরে পলাইয়া যাই।
বিদেশে ধরিয়া বুঝি লইল সিপাই॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় হায় ফেটে যায় বুক।
ভাগ্যহীন জনার জনমে নাই সুখ॥
সম্মুখে সিপাই শোভে শমন সমান।
হায় বুঝি বিদেশে বিপত্তো যায় প্রাণ॥ (৪)

এই পরিবেশকেই সেকালের মানুষ জয় করতে চেয়েছিল, আর সেজন্যই ধর্মঠাকুরের তপস্যা ও পূজা। অর্থাৎ, জীবনে যত কিছু দুঃখ বঞ্চনা আছে, এবং আছে না-পাওয়ার বেদনা, তা দূর করে পূর্ণতায় আপ্লুত হতে হ'লে যে শক্তি সামর্থ ও গুণের প্রয়োজন, সেকালের মানুষ সেই সমস্ত গুণ ধর্মঠাকুরের মধ্যে আরোপ করে তার আরাধনা করেছে। তাঁর কাছ থেকে পরিপূর্ণভাবে পেতে চেয়েছে, পাওয়ার আনন্দে জীবনকে সুন্দর করতে চেয়েছে। সবকিছুকে পরিপূর্ণভাবে পাওয়া একমাত্র ধর্মঠাকুরের প্রীতি উৎপাদনেই সম্ভব; কেন না,

---

৪ সুকুমার সেনের "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস" গ্রন্থে উদ্ধৃত; পৃ, ৬৮৩।

ভক্তদের দৃষ্টিতে তিনি শুধুমাত্র আদি দেবতা নন, তিনি সব কিছুর মূলে, তাঁরই ইচ্ছায় সমস্ত ঘটনা বা দুর্ঘটনা, কল্যাণ বা অকল্যাণ সাধিত হয়। রূপরাম বলেন,

কলিযুগে বিষম ধর্ম্মের মায়াবাজি।
কেহ বা ফকির হল্য কেহ মর্দ্দ গাজি॥
কেহ কর্ণ দাতা কেহ ভিক্ষা মাগি খায়।
এ সব ধর্ম্মের লীলা বলা নাঞী যায়॥

তাই ধর্মের পূজা। কারণ, যিনি দুঃখ দিতে পারেন, দুঃখ হরণের অধিকার তাঁরই; যিনি অকল্যাণ সাধন করতে পারেন, কল্যাণ সাধনের উপায়ও তাঁরই জানা থাকে; যিনি বঞ্চিত করতে পারেন, তিনিই পরিপূর্ণভাবে দিতে পারেন। আর যিনি দিতে পারেন, তাঁর ধ্যানও মঙ্গল, মঙ্গলগাঁথা শ্রবণও কল্যাণপ্রসূ। 'শূণ্যপুরাণ' বলেন,

ধর্ম্মর চরণ-পদ্ম ভাবি এক মনে।
সুনিলে সম্পদ হঅ পাপ বিমোচনে॥
ধর্ম্মর চরণে ভে পণ্ডিত রামে গান।
ভক্ত লএকে ধর্ম্ম করিব কল্যাণ॥

আর একনিষ্ঠভাবে ধর্মের পূজা করলে এবং তপস্যা দ্বারা তাঁর প্রীতি উৎপাদন করলে ধর্মঠাকুর প্রত্যেকের মনোবাসনা পূর্ণ করেন; তাই এই মনোবাসনা ব্যক্ত করেই তাঁর পূজা করতে হয়।

পুত পরিবার কেহ চাহএ ধন জন।
আনন্দে দিলেন বর দেব নিরঞ্জন॥
আঁধা বাঁঝা রোগী কুড়ী চান করেন জলে।
অবিস্‌স তাহার কাজ সিদ্ধ হএ ফলে॥
মহাপাপী বিনাসন করএ মুক্তা চানে।
রামাই পণ্ডিত কহএ আগম পুরানে॥ (শূন্য-পুরাণ)

এই কথাই শ্যাম পণ্ডিত আরও সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন,

অধনীর ধন হয় বন্ধ্যা পুত্রবান্।

অন্ধজনা যদি পূজে পায় চক্ষুদান॥
কুব্জা খোড়া কুষ্ঠী-ব্যাধি ধর্ম্ম-সেবা করে।
কন্দর্প সমান হয় নিরঞ্জনের বরে॥
অহঙ্কারে ধর্ম্মঘট লঙ্ঘে যে [ই] জন॥
অষ্টাঙ্গে ধবল হয়ে বংশের নিধন॥
বারমতী করিয়া যেবা ধর্ম্মসেবা করে।
পুনরপি গতায়াত না করে সংসারে॥
যত দেখি নদনদী সমুদ্রকে যায়।
নিরঞ্জন পূজা কৈলে সর্ব্বদেবে পায়॥
রহিলা গোলকধাম ধবল আসনে।
হরি হরি বল সকল বন্ধুজনে॥ (৫) ইত্যাদি

লক্ষ্য করার বিষয়, এখানে যে কামনা ও তার সিদ্ধি অভিব্যক্ত হয়েছে তা একদিকে কত তুচ্ছ ও সামান্য, আর অন্যদিকে তা মানুষের জীবনের কতখানি! একদিকে তা কত অকিঞ্চিৎকর, এবং অন্যদিকে জীবনের পক্ষে বাঁচার পক্ষে তা কত অপরিহার্য! মানুষের এই কামনা কতখানি বস্তু ও সত্যনিষ্ঠ! বুঝতে কষ্ট হয় না যে, মানুষ এইসব কামনার ভিতর দিয়ে জীবনকেই ভোগ করতে চেয়েছে, জীবনকেই সৃষ্টি করতে চেয়েছে। ধর্মঠাকুর মানুষের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে তার জীবনকে সৃষ্টি করতে সহায়তা করেন; আপদে-বিপদে তাকে রক্ষা করেন, শান্তি ও নিরাপত্তার পথে তাকে নিয়ে চলেন। ধর্মমঙ্গল কাহিনীতে আছে, মহামদ শিশু লাউসেনকে অপহরণ করে নিয়ে গেলে ধর্মঠাকুর রাণী রঞ্জাবতীর পুত্রশোক অপনোদনের জন্য কর্পূরবিন্দু থেকে একটি শিশু সৃষ্টি করে রাণীকে দিলেন। আর ঠাকুরের অনুচর হনুমান চিলরূপে দস্যুদের নিকট থেকে লাউসেনকে ছিনিয়ে এনে রঞ্জাবতীকে দান করেন। ইহাই ধর্মঠাকুরের স্বরূপ।

অনাবৃষ্টির কালে মানুষ তাই সুবৃষ্টির আশায় ধর্মঠাকুরের পূজা করে; চক্ষুপীড়ায় বা কুষ্ঠরোগে অস্থির রোগী ধর্মঠাকুরের নামে মানসিক করে, মৃতবৎসা মা সন্তান নাশ বন্ধ করার জন্য তাঁর পূজো দেন। আর নিঃসন্তান বধূরা তাঁর নিকট কামনা করেন পুত্রকন্যা। রাঢ় ও তৎসংলগ্ন এলাকায় পুত্রকন্যার

৫ সুকুমার সেনের "বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস" গ্রন্থে উদ্ধৃত; পৃঃ ৬৭২

আকাঙ্ক্ষায় ধর্মঠাকুরের পূজা ও মানসিক কত ব্যাপকতা বিস্তৃতি অর্জন করেছিল, এই চিত্রটি থেকে তা বোঝা যাবে। "বর্দ্ধমান জেলায় আসানসোলের নিকটবর্তী ডোমরা নামক গ্রামে এক অতি প্রাচীন ধর্ম্মমন্দির আছে; প্রতি বৎসর ধর্ম্ম ঠাকুরের বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনায় নিম্ন জাতির শত শত বন্ধ্যা নারী এখানে আসিয়া সমবেত হয়। এই উপলক্ষে মন্দিরের সংলগ্ন একটি বাঁধে ধর্ম্মঠাকুরকে স্নান করান হয়। এই স্নান ব্যপদেশে নিমজ্জিত ধর্ম্মশিলাকে যে মুহূর্তে জল হইতে উপরে তোলা হয়, সেই মুহূর্তে ধর্ম্মশিলার গাত্রচ্যুত প্রথম জলবিন্দু কোন বন্ধ্যা নারী মস্তকে ধারণ করিতে পারে, তবে সে নিশ্চিতই এক বৎসরের মধ্যে পুত্র সন্তান লাভ করিবে বলিয়া প্রবল বিশ্বাস করা হয়। এইজন্য বাঁধের জলে পুরোহিত যখন ধর্ম্মশিলাটি লইয়া অবতরণ করে, তখন শত শত বন্ধ্যানারী সেই জলবিন্দুর প্রত্যাশায় নিজেরাও জলে অবতরণ করে এবং সেই 'অমোঘ' জলবিন্দু যাহাতে প্রত্যেকেই লাভ করিতে পারে, সেইজন্য পুরোহিতকে নানারূপ অনুনয় বিনয় করিতে থাকে।" (৬)

মানুষের দীনতম আকাঙ্ক্ষা থেকে আরম্ভ করে তার অতি দুরন্ত দুরাশাকেও তিনি সফল করেন। তাই মানুষ তাঁর পূজা করে, আর তাই সর্বদাই কোন না কোন অভিলাষ বা কামনা করে তাঁর পূজা করতে হয়। কামনা-বিহীন পূজায় তিনি সন্তুষ্ট হন না, বরং রুষ্ট হন এবং পূজারীর শাস্তিবিধান করেন। 'শূন্য-পুরাণ' বলেন

নিষ্ফলে জে দেখে ঘর অপুত্র* জন্মান্তর
পাপ বিনে পুন্য নাহি তার।
একথা শুনিল জেই ভাল মন্দ জানে সেই
ফল হাতে উচিত তাহার॥

এই উচিত ফলদাতা ধর্ম্মঠাকুরকেই বাংলার আর্যেতর জনসমষ্টি বা তার একাংশ পূজো করেছে। মনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা তিনি পূরণ করেন বলেই মানুষ তাঁকে কল্পনা করেছে সমস্ত দেবতার দেবতারূপে, যাঁর পরিতৃপ্তি ও প্রীতিতে সমস্ত দেবতারই পরিতৃপ্তি ও প্রীতি। সেই তীর্থে এসে মিলিত হয়েছে সমস্ত তীর্থ, সেই এক দেবতার সিংহাসন তলে এসে সম্মিলিত হয়েছেন সমস্ত দেবতা।

৬ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস; পৃঃ ৫০২

তাই লৌকিক মানস তাঁকে চিত্রিত করেছে সমস্ত ন্যায় ও পবিত্রতার প্রতীকরূপে, সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডার ও কল্যাণের আকররূপে। রূপরাম ধর্মের বন্দনায় বলেছেন

ধবল অঙ্গের জ্যোতি ধবল আসনে স্থিতি
ধবল বরণে বাড়ি ঘর।
ধবল ভূষণ শোভা অনুপম মুনিলোভা
আলো কৈলে পরম সুন্দর॥
কে জানে তোমার ভেদ ব্রহ্ম সনাতন বেদ
পাণ্ডব বংশের যদুমণি।
তুমি জল তুমি স্থল অপরঞ্চ বুদ্ধিবল
যোগরূপে জন্মিলা আপনি॥

এমনিভাবে লাউসেনের অলৌকিক শৌর্যবীর্য ও অসম্ভব-সাধন, ধর্মঠাকুরের অপরিমিত কৃপা ও মনোবাঞ্ছা পূরণ, এবং তাঁর মধ্যে সমস্ত কল্যাণ ন্যায় ও পবিত্রতার আবাস স্থল কল্পনা করে সেকালের মানুষ তাদের মানস-জগতের একটি সুসংহত চিত্ররূপে অঙ্কন করেছে, বাস্তব জীবনের অকল্যাণ অশান্তি অপূর্ণতাকে অধ্যাসের কল্যাণ শান্তি ও পূর্ণতা দ্বারা পূরণ করেছে। আর এই কর্মের ভিতর দিয়ে তারা প্রকাশ করেছে মাটির স্পর্শে গড়া এক মনকে, একটি জীবনকে, যা মাটির আবেষ্টনীর মধ্যেই নিজেকে সৃষ্টি করতে চায়, প্রকাশ করতে চায়, বাস্তব সম্পর্কের মধ্যেই বেঁচে থাকতে চায়। অর্থাৎ, এইসব সৃষ্টি কর্মের মাধ্যমে বাংলার আর্যেতর জনসমষ্টির প্রাণ-ধর্মী জীবনদর্শনই অভিব্যক্ত হয়েছে। এই অভিব্যক্তিকে সফল সার্থক করে তুলেছেন পশ্চিম বাংলার অসংখ্য কবি। ময়ূরভট্ট থেকে সুরু করে মানিকরাম, রূপরাম, ঘনরাম, গোবিন্দরাম, শ্যাম পণ্ডিত, সীতারাম, রামদাস, সহদেব প্রভৃতি বহু কবি ধর্মঠাকুরকে সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে গেঁথে দিয়েছিলেন। আর এমনি করে রাঢ় অঞ্চলে ধর্মমঙ্গল কাহিনী অর্জন করেছিল জাতীয় সাহিত্যের মর্যাদা।

তাছাড়া, বাংলার মধ্যযুগের অরাজক পরিবেশে সাংস্কৃতিক বিরোধ যেমন ছিল, তেমনি এই বিরোধকে অতিক্রম করে বা জয় করে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের প্রচেষ্টাও লোক-মানসে জাগ্রত ছিল। জ্ঞাতে হোক অজ্ঞাতে

হোক, সে যুগের সৃষ্টি-কর্মে বিভিন্ন ধর্মমত ও জীবন-সৃষ্টির আপাত বিরোধিতার ভিতর থেকে একটা নিশ্চিত ঐক্যের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনায়ও মঙ্গলকাব্যের ভাবাকাশের এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ব্যতিক্রম দেখা যায়নি ; 'বসুমতী' সংস্করণ "শূন্য-পুরাণ"-এর ভূমিকায় বলা হয়েছে, "ধর্ম্মপুরাণের দেবতাখণ্ডের দর্শন শাস্ত্র আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, এই ধর্ম্মশাস্ত্র গৌতমীয় শূন্যবাদ, সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি, বেদান্তের মায়াবাদ প্রভৃতি সকল দর্শনের তত্ত্ব সমূহের সমন্বয়ের চেষ্টায় এক অতি প্রত্যক্ষ দর্শনের সৃষ্টি করিয়া তাহার সহিত লৌকিক হিন্দু অনুষ্ঠানগু'ল মিশাইয়া ফেলিয়াছে, বজ্রযান, সহজযান, যোগী ও নাথ সম্প্রদায়ের ধর্মের সহিত এই ধর্মের এককালে জ্ঞাতিত্ব বা সংস্পর্শ ছিল, তাহার আভাস সৃষ্টিখণ্ডীয় আখ্যান ও প্রহেলিকা হইতে পাওয়া যায়। শূন্যবাদের মূল ঋগ্‌বেদের নাসদীয় সূক্তে পাওয়া যায়। সৃষ্টিখণ্ডেও দেখি, 'কিছু-না' হইতে 'কিছু'র উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে। সাধারণ ভাষায় বলিতে গেলে প্রাচীন সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতির উপরে আধুনিক সাংখ্য বা বেদান্তের পরমাত্মা বা ইচ্ছাশক্তিমান্ ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছে। এই ইচ্ছাশক্তিমান্ ঈশ্বরই ধর্মঠাকুর।" শ্যাম পণ্ডিত লিখেছেন 'নিরঞ্জন পূজা কৈলে সর্ব্বদেবে পায়', একথাটা শুধু কবির সরল বিশ্বাসের দিক থেকেই নয়, ধর্মঠাকুরের সত্তার দিক থেকেও সত্য। কারণ সাংস্কৃতিক সংযোগ বিয়োগের ফলে অনার্য চিন্তা, মনন ও অধ্যাসের সংগে যখন ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন চিন্তাধারা ও আদর্শ মিলিত হ'লো তখন থেকে সমস্ত ধর্মমতের সার সঙ্কলনে অথবা সংমিশ্রণেই ধর্মঠাকুর পরিকল্পিত হয়েছেন। এইভাবে সমস্ত ধর্মমতকে গ্রহণ করে একটা সংশ্লেষে উপনীত হওয়া অথবা সকলকে স্বীকার করে নিয়ে একটা উদার মানস-পরিমণ্ডল গঠন করার মধ্যেই মঙ্গলকাব্যের যুগের স্বকীয় বিশিষ্টতা নিহিত। সেদিক থেকে সমস্ত মঙ্গলকাব্যের সুর এক। তাই দেখতে পাওয়া যায়, বিভিন্ন কবি ধর্মমঙ্গল রচনা করার পূর্বে গণেশ থেকে আরম্ভ করে অজস্র দেবতা ও উপদেবতার প্রীতি উৎপাদন ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করছেন ; বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে বন্দনা করছেন, দিগ্‌-মণ্ডলকে বন্দনা করছেন, ব্রাহ্মণ বন্দনা ও চৈতন্য-দেবকে বন্দনা করছেন। আর শুধু তাই নয়, মুসলমান ফকির কাজীরাও

বাদ যান নি ; কবি তাঁদেরও শুভেচ্ছা প্রার্থনা করে কর্মে আত্মনিয়োগ করছেন। রূপরামের কাব্যে আছে,

বন্দিব বড়খাঁ গাজী রিসিবাটী গাঁ।
নিজ বাটী বন্দিব পেঁড়োর শুভি খাঁ॥
ত্রিপর্ণীর ঘাটে বন্দো দফর খাঁ গাজী।
তাহার মোকামে বন্দো ষোল শয় কাজী॥

সেকালের মানুষ এমনিভাবে সমস্ত দেবতার মধ্যে, সমস্ত শক্তির মধ্যে, সমস্ত মানুষের মধ্যে, সমস্ত সম্প্রদায় ও বর্ণের মধ্যে ঐক্যসূত্র বন্ধন করে নিজেদের ভাবমুক্তি অর্জন করেছে। আর শুধু ভাব-মুক্তি নয়, ব্যবহারিক জীবনেও তারা এই ঐক্যের প্রীতিবন্ধন-অনুমোদিত আচরণ অনুসরণ করার চেষ্টা করেছে। আর এই ভাব ও প্রত্যক্ষ কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে সেকালের ভাবাকাশের উপযোগী এক অভিনব মানবতা, যা উদার নির্মল ও সৃষ্টিশীল। এই মানবতা ভেদবিচার করতে জানে না, অপরকে দূরে সরিয়ে রাখতে জানে না, অপরের মানবতা ও মহানুভবতার নিকট স্বেচ্ছায় নতি স্বীকার করে। রূপরাম লিখেছেন,

বৈষ্ণব হয় যদি জাতি অবসান।
অবধোত সন্ন্যাসী নহে তাহার সমান॥
বৈষ্ণব হয় যদি জাতিয়ে যবন।
যুগে যুগে হই তার দাসীর নন্দন॥

এটা শুধুমাত্র বিনয় নয় ; একথা কবির বাস্তব জীবন-অভিজ্ঞতা লব্ধ সত্য কথা। আর একথা শুধু কবি রূপরাম সম্পর্কেই সত্য নয়, সে যুগের সমস্ত মঙ্গল-কাব্য রচয়িতার পক্ষেই সত্য ; শুধু ধর্মমঙ্গল সম্পর্কে সত্য নয়, সমস্ত মঙ্গলকাব্য সম্পর্কেই সত্য ; আর সাধারণভাবে সেকালের সমস্ত মানুষের পক্ষেই সত্য।

কারণ, সকলকে স্বীকার করে নিয়ে যে ঐক্যভাব দেখা দেয়, সেই ভাব ও ভাব-সঞ্জাত প্রীতিই ছিল সেকালের সামাজিক আচরণের মূল প্রেরণা। সমস্ত ভেদবিচারের বিরুদ্ধে লোক-মানসের এই প্রীতিই ছিল একমাত্র প্রতিবাদ।

বিবিধ—৬

পূর্ব আলোচিত তিনটি সুপ্রসিদ্ধ মঙ্গলকাব্য ও কাহিনী ছাড়াও আরও কয়েকটি কাহিনী ও কাব্য সেকালে প্রচলিত ছিল—যথা, কালিকা-মঙ্গল, ষষ্ঠী-মঙ্গল, শীতলা-মঙ্গল, সারদা-মঙ্গল, সূর্য-মঙ্গল, রায়-মঙ্গল ইত্যাদি। এইসব কাব্য-কাহিনী তুলনায় অপ্রসিদ্ধ, আর গণ-মানসে এদের ব্যাপ্তি বা অধিকারও ততটা প্রতিষ্ঠিত নয়; অথবা পূর্বোক্ত তিনটি কাহিনীর মাধ্যমে বাংলার প্রাক্-ব্রাহ্মণ্য চিন্তা, মনন ও সংস্কৃতির নব জাগরণের যে কাকলি শোনা যায়, এইসব অর্বাচীন কাব্যে ঐ সুর তেমন প্রকট নয়, কোথায়ও বা তা একান্তই অনুপস্থিত। একমাত্র কালিকা মঙ্গল ছাড়া এই শ্রেণীর আর কোন কাব্য উল্লেখযোগ্য কোন কবি-মনকে কাব্য সৃষ্টির অনুপ্রাণনায় উদ্বুদ্ধও করতে পারেনি। তাই এখানে যেন সামগ্রিক চেতনার অভাব, খণ্ড ভাবের অভিব্যক্তি।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এইসব কাব্যের মাধ্যমেও লোক-মানসের সেই নিরাপদ সুস্থ সুখী জীবনযাপনের আকুতি, উপস্থিত আপদত্রাণের আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত হয়েছে। এখানেও একই গরজ ও আত্যন্তিক কামনার প্রকাশ। বসন্ত রোগের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার অস্ত্র জানা ছিল না মানুষের, রোগের আক্রমণে সে হয়েছে ম্রিয়মাণ; উদ্ধারলাভের আশায় কল্পনা করেছে শীতলা দেবীর, যাঁর অন্ধ ক্রোধ থেকে ঐ রোগের জন্ম; তাঁর সন্তোষ বিধানের জন্ম করেছে পূজা পার্বণ, দেবী যদি প্রসন্ন হয়ে অসহায় মানব শিশুকে রোগ শোকে বিব্রত না করেন। শিশু মৃত্যুর দুঃখে কাতর হয়ে সে পরিকল্পনা করেছে ষষ্ঠী দেবীর, দিয়েছে তাঁর পূজা; দেবী যদি কৃপা করে জীবন ও পৃথিবীর আনন্দ স্বরূপ শিশুপুত্র বা কন্যাকে কেড়ে না নেন। বনপশু বাঘের উপদ্রবে শঙ্কিত হয়ে সৃষ্টি করেছে কাল্পনিক ব্যাঘ্র-দেবতা, আর তেমনি অসহায় হৃদয়ের অঞ্জলি দিয়ে করেছে তার পূজা; রায় মঙ্গলে গেয়েছে তার প্রশস্তি।

কালিকা দেবী শক্তি দেবতা চণ্ডীরই রূপভেদ। কিন্তু চণ্ডী মঙ্গলের মত কালিকা মঙ্গলে দেবীর মাহাত্ম্য বা পূজা স্বীকৃতির কোন কাহিনী বা পরিকল্পনা নেই। বিদ্যা ও সুন্দরের গুপ্ত প্রণয়ের কাহিনীই কালিকা মঙ্গলের উপজীব্য। দেবী কালিকা প্রেমিক প্রেমিকার মিলনপথের সমস্ত কণ্টক ও বিঘ্ন ইত্যাদি অপসারিত করে দিচ্ছেন, অন্যান্য বিপদ ও মৃত্যুর হাত থেকে তাদের রক্ষা করছেন। বহু কবি এই কাহিনীকে রূপদান করেছেন, আর তাঁদের অধিকাংশ রচনার মাধ্যমেই সেকালের অধঃপতিত মানস পরিবেশের স্বাক্ষর নিশ্চিতরূপে চিহ্নিত হয়ে আছে।

বিদ্যালাভের আশায় গুণকীর্তন করেছে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সারদা বা সরস্বতীর। আর সূর্য-ব্রতের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার কুমারী মেয়েরা প্রার্থনা করেছে উপযুক্ত বর, সুখী এবং পুত্রকন্যার হাসিতে উজ্জ্বল বিবাহিত জীবন। তেমনিভাবে পার্থিব ভাবনা কামনার রসে সৃষ্টি করেছে অন্যান্য কাব্য কাহিনী।

এইসব কাব্য ব্যাপ্তি, গুরুত্ব ও গুণবিচারে তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও এগুলির মধ্যে মঙ্গল কাব্যের মূল সুরটি বর্তমান। এগুলিও বাংলার লোক-মানসের বিচিত্র ভাব ও রূপব্যঞ্জনার অন্তর্গত।

মধুময় বৈষ্ণব-পৃথিবী

শ্রীকৃষ্ণবিজয় : কালান্তরের
পূর্বাভাষ ;
রূপান্তরের প্রথম পর্যায় :
বড়ু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ,
রূপান্তরের দ্বিতীয় পর্যায় :
চৈতন্যচরিত্র ও চৈতন্যবাদ ;
চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্য ;
সহজিয়া বৈষ্ণব সাহিত্য ;
পরিশিষ্ট : বাংলার বাউল

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় : কালান্তরের পূর্বাভাষ—ক

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ, চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতকের প্রথমাংশ গভীর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নৈরাশ্য ও অস্থিরতার ভেতর দিয়ে কেটেছে। এই অস্থিরতা শুধু মাত্র রাষ্ট্রের উত্থান বা পতন, বিশেষ কোন নৃপতির জীবনাবসান অথবা রাজ্যাভিষেকের কাহিনীতেই সীমাবদ্ধ নয়; এই অস্থিরতা সামাজিক ভাবাদর্শের রূপান্তর, ধর্মীয় আদর্শের পরিবর্তন, নীতিবোধের ব্যতিক্রমের মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে। কেন না মুসলমান অভিযানকারীরা শুধু তাদের সংঘবদ্ধ সামরিক শক্তি ও উন্নতধরণের সমর-নৈপুণ্য নিয়েই এদেশে আসে নি। তারা নতুন সমাজআদর্শ ও ধর্মের বাণীকেও (এই আদর্শ তাদের হাতে ও আমলে এর মৌলিক রূপ থেকে বহুলাংশে বিচ্যুত হয়ে থাকলেও) বহন করে এনেছে। তাই এই যুগে সংঘাতটা শুধু সামাজিক শক্তির নয়, ভাবাদর্শেরও। এই সংঘাতে বাঙ্গালীর সনাতন চিন্তাধারা ও আদর্শ, তার মন ও মানস নানা ভাবে আহত হয়েছে, তার আদর্শ ও অবলম্বন অভিযানকারীর হাতে নির্মমভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে; কিন্তু অভিযানকারীরা তার জন্মে কোন সৃষ্টিশীল আদর্শ সুদূর প্রান্ত থেকে নিয়ে এসেছে তা অনুসন্ধান করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি, কিন্তু সত্যই মুসলমান অভিযানকারীর ঝলসিত তরবারির পশ্চাতে অর্থবহ মানবিক সত্য ও আদর্শ লুকায়িত ছিল, এবং তা সঙ্গোপনে বাঙ্গালীর মন, মানস ও চরিত্রকে এক স্বভাব থেকে স্বভাবান্তরের পথে প্রবাহিত করে দিচ্ছিল। ভাবাদর্শের সংঘাত থেকে রূপান্তরিত নতুন বাঙ্গালী চরিত্র ও ভাবাদর্শ পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে ও ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু এই সমন্বয় সাধনের পূর্বে বিপরিতধর্মী আদর্শের ঘাত-প্রতিঘাতে বাঙ্গালী জীবন যে ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল, তা' সহজেই অনুমান করা চলে।

হিন্দুশাসনের অবসানের মুখেই বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ধ্বংসের প্রান্তসীমায় পৌছেছিল। এই পচনশীল আদর্শকে স্পর্দ্ধা করে দাঁড়াল যে নতুন ইসলামিক আদর্শ, ভারতে আগমনের পূর্বেই সে আদর্শও তার আদি গতিশীলতা ও সুস্থ সমাজবোধ হারিয়ে ফেলেছিল। সুতরাং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য লাভের জন্য এই দুই আদর্শের সংগ্রামটা নিতান্তই ধ্বংসপ্রবণ হলো, আর রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সাধারণ মানুষের জীবনের মূল্য ও মর্যাদা কোন কালেই দেয় না, ধ্বংসের তরঙ্গে তার সব কিছুকে বিসর্জন দেওয়ার আহ্বানই জানায়। এই পরিবেশে জীবনের অনিশ্চয়তা পূর্বকালের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে, জাগতিক ঘটনাকে মনে হয়েছে পূর্ব থেকেও ভয়াবহ, আর সংসারকে মনে হয়েছে অন্তহীন দুঃখের লীলাভূমি। এই দুঃখের স্পর্শ থেকে পরিত্রাণ লাভের প্রেরণাও তার সমভাবে দেখা দিয়েছে, মেঘের আড়ালে লুকানো সূর্যকে সে প্রতীক্ষা করছে প্রতিক্ষণ। এই নৈরাশ্য ও আশার দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে সে একটা স্থিতিশীল যুগোপযোগী সমন্বয়ে উপনীত হয়েছিল।

এই সমন্বয় সাধিত হওয়ার ঠিক অব্যবহিত পূর্বকালীন সামাজিক ও ভাবপরিমণ্ডলে মালাধর বসু তাঁর "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য-প্রচার এই গ্রন্থ রচনার মূল অনুপ্রেরণা হয়ে থাকলেও, কবির ভাবাকাশ আশ্চর্যভাবে তাঁর সমকালীন সামাজিক ভাবাকাশের লক্ষণাক্রান্ত। শ্রীকৃষ্ণ-মাহাত্ম্য যেন কবির সমকালীন ভাবাকাশের তরঙ্গে অবগাহন করে সজীব এবং প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। সুতরাং তাঁর গ্রন্থকে যুগসংক্রান্তির স্মারক রূপেই গ্রহণ করা যেতে পারে। এই যুগসংক্রান্তির স্মৃতিতে কবি নিঃসন্দেহ, মানব ইতিহাসের সত্যভ্রষ্ট ঘোর দুর্দিন কলিকাল বহুদিন পূর্বেই সূচিত হয়েছে। সেই দুর্দিনই বর্তমানে সুপরিব্যাপ্ত। কলি যুগে সামাজিক অবস্থা কিরূপ হবে, কবি তার বর্ণনায় বলেছেন—

"কলিকাল পূর্ত্যাসন্ন প্রেবেস করএ।
বল বুদ্ধি তেজ সত্ব সভাকার ক্ষএ॥
অল্পসত্ব হব লোক অল্পবুদ্ধি বল।
একপুয়া হব ধর্ম্ম অধর্ম্ম প্রবল॥
সত্য জজ্ঞ তপোদান চারিপোয়া ধর্ম্ম।
সকল ছাড়িয়া লোক করিব কুকর্ম্ম॥

ব্রাহ্মণ ছাড়িব বেদ অধর্ম্ম আচার।
অমর্য্যাদা হব লোক করিব অবেভার ॥
বাপে না মানিব পুত্র নিন্দিব জ্যেষ্ঠ ভাই।
ব্রহ্ম না জপিব বিপ্র করিব বড়াঞি ॥
ভার্য্যা না মানিব স্বামি করিব দুরাচার।
পরপুরুস লইয়া করিব ঘরদ্বার ॥
পৃথুবি সঙ্কোচ হব অধর্ম্ম আপার।
নিচ জনের ঘরে হব লক্ষ্মীর অবতার ॥
সাধুজনের দুঃখ হব নিচ পাবে সুখ।
দুঃখ ভাবি হব লোক ধর্ম্মেতে বৈমুখ ॥" ইত্যাদি

(পৃঃ ৬৫৮-৫৯, খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত গ্রন্থ) ॥

ঠিক এমনি একটা অবস্থা যে তাঁর সমকালীন সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছে, তার স্বল্প স্বীকৃতিও গ্রন্থে রয়েছে। যথা

"দুই দিগে বন বাড়ি পথ আৎসাদিল।
বেদ না জানিঞা জেন দিজ নষ্ট হৈল ॥
মেঘের সঙ্গে বিজুলি আকাসেত জাএ।
নিদ্ধন পুরুসে জেন কামিনি না ভাএ ॥"

(ঐ ; পৃঃ ১১৪)

এইরূপ এক সমাজে যেখানে সুস্থ, সৃষ্টিশীল, কল্যাণ-ধর্মী সমাজ-আদর্শ বিলুপ্ত হয়েছে, যেখানে নীতিবোধ অনুপস্থিত, সত্য ধর্ম যেখানে লাঞ্ছিত, অনাচার ব্যভিচার যেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ন্যায়বিচারের আদর্শ যেখানে অর্থহীন, এইরূপ সমাজে সৃষ্টিশীল আদর্শের স্বীকৃতি অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য ; সরল অনাড়ম্বর মধুর জীবন যাপনের আশাও এখানে বৃথা। সুতরাং সহজভাবেই জীবনকে সংসারকে অস্বীকার করার প্রেরণা দেখা দেয়। কবি বলছেন,—

বিসম সমএ হৈল পাপ ব্যবহার।
সভে হল স্বর্গপুরি ছাড়িয়া সংসার ॥ (পৃঃ ৬৬৩)

কবির সংসার-অভিজ্ঞতা অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক। জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও আশা প্রতিদিন মানুষকে তার সম্মুখে প্রসারিত সংসারের দিকে টেনে আনছে ; কিন্তু সাংসারিক নিয়ম ও সামাজিক বিধিব্যবস্থার নিকট পরাভূত

হয়ে তার আশা যে প্রতিনিয়ত তার মর্মবেদনায় আঘাত করছে, কবি তা অনুভব করেছেন। এবং এই চেতনাও তাঁর আছে যে, মানুষের শক্তির চেয়ে মানুষেরই সংঘবদ্ধ কেন্দ্রীভূত শক্তি—সমাজ শক্তি—অত্যন্ত বেশী প্রবল, এবং তুলনায় অমোঘ। এই শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যক্তিগত মানুষের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তাই পরাজয়কে নিশ্চিত জেনে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার চেয়ে যার জন্যে দুঃখ, যার জন্যে ব্যর্থতা, তার মূলোৎপাটনই সহজসাধ্য। তা হ'লেই ব্যর্থতার দৈন্যে মুহ্যমান হ'তে হবে না। কবি লিখছেন—

সম্পদ ক্ষেনেক সবে বিপদ বিস্তর।
ধন উপার্জন হেতু দুঃখ নিরন্তর॥
ধনবানজন চিত্ত কভু স্থির নহে।
অগ্নি পানি চোর দৈন্য শুনে রাজ ভএ॥
জথা তথা থাকে সেই ধনকে চিন্তএ।
ধন সোকে দুঃখ পায়্যা পরান হারাএ॥
ধন তেজি জেই থাকে সেই বড় বির।
নাহি চিন্তা নাহি ভয় নির্ভয় সরির॥

....

জত জত মোহ কবি তত সোক বাড়ে।
পুত্র সোকে ধন সোকে লোক প্রাণ ছাড়ে॥
মোহ হৈতে আপনার বুদ্ধি বল ক্ষয়।
আপনাকে ধিক কহো কার মিত্র নয়॥
গৃহ পুত্র কলত্র বিসয় মোহ জাল।
ইহাতে মজিলে সোক বাড়এ বিসাল॥
মনে গুনি জাগহ তেজহ মায়া বন্ধ।
পাইবে পরম ব্রহ্ম অতুল আনন্দ॥ (ঐ: ৬২৬)

কিন্তু এই যে অস্বীকারের প্রেরণা, তা প্রকৃত অস্বীকার নয়। কারণ, এই অস্বীকারের মাধ্যমে তিনি এর থেকে বড়, এর থেকে মহত্তর ও কল্যাণধর্মী একটা কিছুকে স্বীকার করতে চাইছেন; একটা মহৎ আদর্শকে অবলম্বন করতে

চাইছেন। এই যে বিসর্জন, তার ভিতর দিয়েও তিনি একটা মহত্তর আদর্শের প্রতিষ্ঠাকে আবাহন জানাচ্ছেন।

'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে' মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণের বীরত্ব এবং ঐশ্বর্য বর্ণনা করেছেন। সমস্ত রকমের সম্ভাব্য অসম্ভাব্য বিপদকে তিনি অনায়াসে জয় করছেন, অক্লেশে অপরিমেয় শক্তিধর প্রতিপক্ষকে পরাভূত করছেন। অবশ্য ভাগবতকে অবলম্বন করেই মালাধর তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ভাগবতে বর্ণিত এই সব চিত্তাকর্ষক কাহিনীর উপর ভাগবত-যুগের সমাজ-পরিবেশের প্রতিফলন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীকৃষ্ণ যে সব শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন, এবং সংগ্রামে জয়ী হয়েছেন, তা থেকে জানা যায় যে, মানুষ কতকগুলো প্রাকৃতিক ঘটনা যথা দাবানল, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি ইত্যাদির রক্তচক্ষুর বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বোধ করছিল না, কতকগুলো হিংস্র বন্য জন্তু জানোয়ার তার অস্তিত্বকে বিঘ্ন-সঙ্কুল করে তুলছিল, তার উপর ছিল গোষ্ঠীপতির অত্যাচার উৎপীড়ন। এই সম্মিলিত অভিযানের সম্মুখে তাকে অসমর্থিতভাবে নিঃসঙ্গ সংগ্রাম করতে হচ্ছে। এই সংগ্রামে পরাভূত না হওয়ার সংকল্প থেকেই সে কামনা করেছে অপরিমেয় শক্তি-সামর্থ্য, কামনা করেছে সীমাহীন বল-বীর্য-বুদ্ধি ও উদ্ভাবনী প্রতিভা, যার সাহায্যে সে অনায়াসে অতিক্রম করবে সমস্ত অনাত্মীয় প্রতিরোধ, জয় করবে নৈসর্গিক শক্তির খেলাকে, আর প্রতিষ্ঠিত করবে নিজের স্বরূপকে। অর্থাৎ মানুষ তার ক্ষুদ্র শক্তিকে সহস্রগুণ স্ফীত করে সেই অসম্ভব শক্তির অধিকারী হতে চেয়েছে। শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের মাধ্যমে তার এই কামনাই ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। সেই সীমাহীন শক্তির অধিকারী শ্রীকৃষ্ণ দাবানল গ্রাস করছেন, গিরি গোবর্দ্ধন ধারণ করে কুপিত ইন্দ্রের আক্রমণ—অবিশ্রান্ত বর্ষণ—থেকে গোকুল রক্ষা করছেন; দুগ্ধ-শিশু হয়েও বৎসাসুর, বকাসুর, অঘাসুর ইত্যাদি অগণিত হিংস্র জানোয়ারকে হত্যা করছেন, কালীয় দমন করছেন; আর সর্বোপরি, গোষ্ঠীপতিকে হত্যা করে গোষ্ঠীপতির অত্যাচার থেকে সমস্ত জনসমষ্টিকে রক্ষা করছেন। নানাভাবে উৎপীড়িত ও অসহায় মানুষ তার নিজের উপর দেবত্ব আরোপ করে সমস্ত প্রতিকূল পরিবেশের উপর আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কল্পনা করেছে। এবং পরিবেশের উপর আত্মকর্তৃত্ব স্থাপনের হৃদয়-রস-রঞ্জিত চিত্র এঁকে মানুষ বাস্তব পৃথিবীতে সেই শক্তির অথবা সেই শক্তির আধার পুরুষের আবির্ভাব সহজ সুগম করেছে। তার জীবনযুদ্ধে এবং

জীবনকে সৃষ্টি করার কার্যে এই কল্পনার ও চিত্রের অবদান যৎসামান্য নয়।

যে কোন সমাজ ও সংস্কৃতি-সঙ্কটের যুগে অস্বীকৃত বঞ্চিত মানুষের মনে এই ভাগবত কাহিনীর নিঃসন্দেহ প্রভাব অনুভূত হবে। মালাধর বসুর সমকালীন ভাবমণ্ডলেও তার আঘাত অনুভূত হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য সমাজ সংস্থায় সাধারণ মানুষের জীবনের পর্যাপ্ত স্বীকৃতি ছিল না; তাকে উচ্ছেদ করে যে মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো তাতেও সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হয় নি। বরং রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব কোলাহলের ভিতর দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবন ক্রমাগত বঞ্চনা, উৎপীড়ন ও অবজ্ঞার সম্মুখীন হয়েছে। এই বিশৃঙ্খল প্রতিকূল পরিবেশকে পরাভূত করার জন্য এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য শক্তির কামনা ও সাধনা অপরিহার্য। ভাগবত যুগের সঙ্গে মালাধর যুগের মানস পরিমণ্ডলের ঐক্য এই দিক থেকেই। শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের কাহিনী এবং শ্রীকৃষ্ণের বীরত্ব ও ঐশ্বর্য সমকালীন মানুষের শক্তির কামনাকেই চরিতার্থ করেছে, ভাবের ক্ষেত্রে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে বাস্তব সমাজে ক্রিয়াশীল মানুষকে শক্তি ও সান্ত্বনা দিয়েছে। কংসের স্থলে যদি মালাধর বসুর সমসাময়িক কোন রাজাকে বসানো যায়, এবং শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য প্রেরিত বিভিন্ন অসুরকে যদি প্রজার অত্যাচারের অংশীদার বিভিন্ন রাজকর্মচারী বলে গণ্য করি, তা হলে এই পৌরাণিক কাহিনীও রীতিমত বাস্তব ও সজীব হয়ে ওঠে। শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের কাহিনী অনুরূপ কোন ভাব-সংশ্লেষের সাহায্যেই মালাধর বসুর যুগমানস অধিকার করে থাকবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সজ্ঞান ক্রিয়াই হোক অথবা অবচেতন প্রক্রিয়াই হোক, শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের মাধ্যমে মালাধর জীবনের উপলব্ধি কামনা করেছেন; জীবনের যে দিকটা অস্বীকৃতি ও বঞ্চনার গহ্বরে ডুবে আছে, তাকেই প্রত্যক্ষ বাস্তব সম্পর্কের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। অন্তত তাঁর কামনাই তাই। সে-জন্যই বলা যায়, তার অস্বীকৃতি স্বীকৃতিরই অপর দিক; ত্যাগের প্রেরণাও ভোগের প্রেরণাসঞ্জাত। শ্রীকৃষ্ণ, যিনি বিষয় পথ ছেড়ে ধর্ম আচরণের উপদেশ দিচ্ছেন, তাঁকেই দেখছি পরম ভোগীরূপে; যিনি ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে ব্রহ্ম চেতনায় নিমগ্ন হওয়ার উপদেশ দিয়ে বলেছেন—

স্রবনেতে না সুনে নয়ানে না দেখে।
নাসিকা নালএ গন্ধ জিহ্বা নাহি ভখে॥
পরস না লএ চর্ম্ম সর্ব্ব সমান।
সরূপে লভিল স্বরূপ পাইল ব্রহ্মজ্ঞান॥

(ঐ ; পৃঃ ৬৩২)

তিনি ইন্দ্রিয় সুখকর কার্যে আত্মনিয়োগ করতে কুন্ঠিত নন। মালাধর শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা জীবনের যে চিত্র এঁকেছেন, তাও অনুরূপ ইন্দ্রিয়সুখকর। যথা,—

নানা সুখে বাড়ে গোসাঞের বংস তোথা।
সর্গে হৈতে পারিজাত আরোপিল জোথা॥
দেব দানবের রাজ্যে জত রত্ন ছিল।
সকল আনিঞা গোসাঞি দ্বারকা পুরিল॥
অকালে মরন নাহি চিন্তা ভয় সোক।
গোবিন্দ চরন সেবি আছে সব লোক॥
দ্বারিকার মহিমা কহিব কোন জন।
অবতার কৈল তথা দেব নারায়ন॥
গোসাঞের পুত্র পৌত্র জতেক কুমারে।
কোন জন আছে তারে গনিবারে পারে॥
কুমার পড়াইতে আইলা যতেক ব্রাহ্মণ।
তিন কোটি আসি লক্ষ তাহার গনন॥ ইত্যাদি

(ঐ , পৃ : ৬৩৭)

শুধু তাই নয়, মালাধর কৃষ্ণচরিতের 'আলাপে' যে মোক্ষ লাভের কল্পনা করেন, তাও চাওয়ার আকৃতিতে, ভোগের আনন্দে রঙীন। তিনি বলছেন—

ধন-ধান্যে পুত্রে পৌত্রে বাড়িবেক লোক।
ইহা জেই সুনে নাহি পাএ কোন সোক॥
নিতি নিতি শুনিলে বাড়ে জাএ সর্গস্থল।
সকল সম্পদে তার জাএ সর্ব্বকাল॥
শ্রীকৃষ্ণ বিজয় পুথি থাকে যার ঘরে।
অকালে মরন তার নহে কোন কালে॥ (ঐ ; পৃঃ ৬৬৬-৬৭)

এই কামনা ও চিত্রের সংগে কবির—

> গৃহপুত্র কলত্রাদি দেহ বিসর্জ্জন।
> জলের বিম্বক হেন কেহ স্থির নহে ॥
> পথিকে পথিকে জেন পথে পরিচয় ॥ (ঐ ; পৃঃ ৬২০)

এই উক্তি নিতান্তই বেমানান। কবির একান্ত পার্থিব মন এই পৃথিবীর বুকেই সুখ-স্বচ্ছন্দে আনন্দে বিচরণের প্রয়াসী, কিন্তু এই সামান্য ব্যবস্থায় তার কোন আশা চরিতার্থ হয় না বলেই তার দুঃখ, আর এই দুঃখ থেকেই তাঁর পরিহার প্রবৃত্তির উদ্‌ভব। কিন্তু এই পরিহার চেতনা থেকে তাঁর জীবনের চেতনা, বাঁচার সহজ আনন্দ ও ভোগের আকাঙ্ক্ষা বহুগুণে প্রবল ও সজীব। তাই গ্রন্থের পাতায় পাতায় সে নিজেকে প্রকাশ করে চলেছে। কবি জীবনকে অস্বীকার করতে চাইলেও জীবন কবিকে অস্বীকার করেনি। তাই কবির ভাবাকাশ নিতান্তই বস্তুধর্মী। বলা বাহুল্য, এই বস্তুধর্মিতা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি-মানসের অঙ্গীভূত নয়।

মূল ভাগবতে তৎকালীন ব্রাহ্মণ্য সংস্কার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে একটা মূলগত প্রতিবাদের সুর অনায়াসলক্ষ্য। তাই ভাগবতকার ঈশ্বরের আরাধনায় কিরাত, পুলিন্দ, পুক্কস, যবন প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মতে ম্লেচ্ছ জাতিরও অধিকার ঘোষণা করেছেন। সামাজিক অন্যায়াচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তিনি প্রচার করলেন তাঁর সমদর্শন। শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় একান্তভাবে ভাগবত অবলম্বনে রচিত বলে এই সমদৃষ্টি মালাধর বসুর মধ্যেও সবিশেষ লক্ষ্যণীয়। শ্রীকৃষ্ণের মুখনিসৃত উক্তি, যথা—

> সভাকার এক আত্মা ভিন্ন' না মানিহ।
> পর আত্মাএ নিজ আত্মাএ বেথা নাহি দিহ ॥
> (পৃঃ ৬২৭)

এবং

> সর্ব্বভূতে হের আমি দেখাল্য তোমারে।
> ভূতে দয়া জেই করে সেই ত আমারে ॥
> ভূত হিংসা জেই করে সেই আমার বৈরি।
> অহিংসা পরম ধর্ম্ম থাকহ আচরি ॥
> (পৃঃ ৬২১)

ইত্যাদির ভিতর দিয়েই যে এই সমদৃষ্টি অভিব্যক্তি লাভ করেছে, তা নয়, গ্রন্থের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বহু কাহিনীকে অবলম্বন করে এই ভাব প্রকাশ পেয়েছে। "যেমন পৃথুবির ভার হর মারিয়া অসুরে", "ধর্ম্ম হিংসা জেই করে অকালে সেই মরে" ইত্যাদি। এই সব উক্তি থেকে নিশ্চিতরূপে অনুমান করা যায়, বিভিন্ন ধর্মমতের সংঘাতে এবং সমাজ আদর্শের ঘাত-প্রতিঘাতের তরঙ্গে সমাজ-মানস কোন দিকে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করেছে ; বোঝা যায়, মালাধর বসু এবং তাঁর সমকালের সামাজিক মানুষ কোন সৃষ্টিধর্মী আদর্শের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। এই আদর্শ বিশেষ কোন ব্যক্তি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে না, সকলকেই সমানভাবেই আলিঙ্গন করবে। কাউকে অবহেলা করে নয়, সকলকে সমর্যাদায় স্বীকার করে নিয়েই সে প্রতিষ্ঠিত হবে। এই ভাবে ব্যক্তিক বা গোষ্ঠী সীমানা অতিক্রম করে সর্বত্র প্রসারিত হওয়ার চেতনা মালাধরের মধ্যেও বিরাজমান। সেই উদ্দেশ্যেই তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় রচনা। তিনি বলছেন—

ভাগবত অর্থ জত পয়ারে বাঁধিয়া।
লোক নিস্তারিতে করি পাঁচালি রচিয়া॥

... ...

ভাগবত শুনি আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকীক কহিল লোক সুন মহাসুখে॥ (পৃঃ ৩)

তাঁর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ; সেটা হলো লোকশিক্ষা। তিনি পণ্ডিতের মুখে ভাগবত শ্রবণ করে সর্বসাধারণের জন্য লৌকিকভাবে পয়ারে রচনা করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্যই তাঁকে সংকীর্ণ সীমা লঙ্ঘন করে বহুর সান্নিধ্যে সমগ্রের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছে। অগ্রচারী যুগ ভাবধারার বৈশিষ্ট্যই তাই।

আরও একটি দিক থেকে মালাধর ভবিষ্যতের হয়ে ভূমি প্রস্তুত করেছেন। কান্তাভাবে ঈশ্বরোপাসনা ভক্তিবাদের একটি প্রধান সূত্র। এই কান্তাভাবে উপাসনার চেতনা মালাধারে বর্তমান ছিল। তিনি বলছেন—

এক ভাবে বন্দো হরি জোর করি হাত।
বসুদেব সুত কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ॥ (পৃঃ ১)

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে এই চেতনার লক্ষণ সত্যই বিস্ময়কর। তা ছাড়া ভারতে ইসলামের আবির্ভাবের ফলে ধর্মীয় চিন্তায় যে একেশ্বরবাদ

পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, তার পূর্বাভাসও মালাধর বসুর গ্রন্থে রয়েছে। কৃষ্ণের স্তবে তিনি বলছেন—

তুমি দেব নিরঞ্জন দেব প্রজাপতি।
তুমি দেব মহেশ্বর তুমি উপাপতি॥
তুমি চন্দ্র তুমি স্থর্য্য তুমি তারাগণ।
তুমি দিবা তুমি রাতৃ দণ্ড প্রহর ক্ষণ॥
তুমি জপ তুমি তপ তুমি জজ্ঞদান।
তুমি জোগ তুমি ভোগ পরম গিয়ান॥
শ্রীষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি নারায়ণ।
তোমার নিদ্রা সে নিদ্রা জাগিতে জাগরণ॥

(পৃঃ ৩৩-৩৪)

মালাধর বসু কালান্তরের মুখে বসে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাই কালান্তরে প্রবেশের জন্য ব্যাকুল বিভিন্ন ভাবধারা অলক্ষ্যে তাঁর কল্পনা ও লেখনীকে অবলম্বন করে ব্যঞ্জনা লাভ করে। তাঁর মধ্যে যে চিন্তা ও ভাবের সূচনা তাই পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্য ও বৈষ্ণবগীতি কবিদের মধ্যে পূর্ণতা অর্জন করে। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের গুরুত্ব এইখানে যে, ইহা ধর্মসমন্বয়ের আগমনকে সহজ করেছে।

বড়ু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি—খ

এক

('শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'—এর কবি বড়ু চণ্ডীদাসের ভাবাকাশ সম্পূর্ণ মানবিক।) এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগৎ, বিভিন্ন নিয়মকানুন ও সংস্কারে বাঁধা সমাজ, এবং মানুষের নির্দিষ্ট কর্মসীমার মধ্যে যে কবি বিচরণ করছেন, এবং তাঁর প্রত্যক্ষ বিচরণভূমি থেকে যে কবি তাঁর ভাবজগতের রস আহরণ করছেন, এই চেতনা ও তার স্বাক্ষর কাব্যের প্রতিটি ছত্রে প্রকাশিত। তাই রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলা তাঁর কাব্যের উপজীব্য হলেও এই প্রেম সর্বভাবে অলৌকিক অথবা অতিপ্রাকৃত জগতের স্পর্শবিমুক্ত। এখানে সেখানে কৃষ্ণের জবানিতে তাঁর অলৌকিক ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা, এবং পৃথিবীতে তাঁর আবির্ভাবের অলৌকিক প্রেরণার উল্লেখ রয়েছে সত্য; কিন্তু তাঁর ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা শুধু কথাতেই অভিব্যক্ত হয়েছে, কোন সজীব কর্মের মাধ্যমে নয়। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' এবং বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'—এর মধ্যে ব্যবধান তাই বিরাট। মালাধর কৃষ্ণের অলৌকিক বীরত্ব ও ঐশ্বর্য বর্ণনা করেছেন, তাঁর অচেতন উদ্দেশ্য সম্ভবত ছিল, বাস্তব সমাজে এইরূপ পরিমিতিহীন শক্তিধর ব্যক্তির আগমনের পথ সহজ করা। এই চেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, বস্তুজগৎ অথবা সমাজ-জীবনের গতি ও রূপান্তর এখানে অপার্থিব শক্তির স্বপ্রকাশের উপর নির্ভরশীল; এই শক্তি কৃপা করে সমাজের ভার লাঘব না করলে সমাজ-মানুষের পক্ষে তাকে জয় করা অসম্ভব। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসে (তাঁর কাব্যের যে অংশ আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে

অন্তত) এই চেতনার অভাব। এখানে নিতান্তই একটি পার্থিব প্রেম আপনাকে সৃষ্টি করে চলেছে; এবং প্রয়োজনমত সে প্রচলিত সমাজ-বন্ধন লঙ্ঘন করে চলেছে। এই সৃষ্টি ক্রিয়া কোন বাইরের শক্তির অপেক্ষায় নিশ্চল বসে থাকেনি।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ রাধা এবং কৃষ্ণ বাস্তব সমাজ পরিবেশের মধ্যে সংস্থাপিত হয়েছে, এবং সমাজ-সীমার অন্তর্গত দুইজন স্ত্রী-পুরুষের মতই তাঁদের প্রেম এবং প্রেমবিহ্বল চিত্ত বিকাশলাভ করেছে। সুতরাং সমাজের অঙ্গ হিসেবে তাঁরা উভয়েই সমাজের প্রচলিত বিধিনিষেধ এবং সামাজিক-সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন। অবশ্য এই চেতনা কবির নিজেরই, তাঁর মানস প্রকরণই এই চেতনাকে কাব্যের চরিত্রের উপর প্রয়োগ করেছে। কবির নিজস্ব উক্তি ও ভণিতা, বর্ণনা ও চিত্রের মধ্যেও দেখতে পাই, কবি গভীর ও সুতীক্ষ্ণভাবে তাঁর পারিপার্শ্বিক বস্তু-জগতকে অবলোকন করেছেন, সমাজের গতিধারাকে লক্ষ্য করেছেন, প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্য মানুষের চিত্তে কিভাবে রেখাপাত করে, বিভিন্ন ঋতুর আগমন-নির্গমন কিভাবে আমাদের মনোভূমিতে প্রতিফলিত হয়, কবি তাও অন্তরঙ্গভাবে অনুভব করেছেন। তাঁর মানসপট এই বহুবিধ সূত্র থেকে আহরিত রূপরসে গড়ে উঠেছে; তার এই মানসপটেরই বর্ণচ্ছটায় তিনি সৃষ্টি করেছেন এই প্রেমকাহিনী। কল্পনায়, ভাবে, ঐশ্বর্য ও অভিব্যক্তিতে এই কাহিনী সেজন্যই মানবিক রসে সিঞ্চিত। কবির কল্পনার ও চিত্রণের মানবিকতা নানা দিক থেকে আস্বাদন করা যেতে পারে।

প্রথমত, কবির বস্তুনিষ্ঠ কল্পনা ও মনন। রাধার রূপবর্ণনা করছেন তিনি একান্ত পার্থিব ভোগের দৃষ্টি নিয়ে; এখানে তিনি কোন অতীন্দ্রিয় সুন্দরের অনুসন্ধান করেননি, অথবা অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য দিয়ে রাধা-অঙ্গ গড়ে উঠেছে, তার কোন ইংগিত দেননি; পূর্ণ বিকশিত নারী-দেহ যে বৈশিষ্ট্য নিয়ে পুরুষের কামনায় আঘাত করে, কবি দেখেছেন তাকে এবং বলিষ্ঠ নিপুণ হাতে তিনি এঁকেছেন সে চিত্র। যথা,

নীল জলদ সম কুন্তলভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা॥
শিশত শোভএ তোর কাম সিন্দুর।
প্রভাত সমএ যেন উয়ি গেল সূর॥

ললাটে তিলক যেহ্ন নব শশিকলা।
কুণ্ডলমণ্ডিত চারু শ্রবণযুগলা॥
নাসা তিলফুল তোর আতী অনুপামা।
গণ্ডস্থল শোভিত কমলদল সমা॥
নয়নযুগল শোভে যেহেন খঞ্জনে।
ঈসত কটাক্ষে মোহে মুনিমনে॥
বিম্বফল জিনী তোর আধরের কলা।
মাণিক জিনিআঁ তোর দশন উজলা॥
কণ্ঠ কম্বুসম কুচ কোকযুগলা।
বাহু মৃণাল কর রাতা-উতপলা॥
কনক চম্পকসম শোভে কলেবরা।
মাঝা দেখি সিংহ গেল পর্ব্বতকুহরা॥
নাভি গভীর তোর প্রেয়াগ উপামা।
উরুযুগ রামকদলী তরুসমা॥
মন্থর গমনে যাসি ভাঁগিবার ডরে।
তা দেখিআঁ বনবাস লৈল করীবরে॥
অমরপুরত নাহি হএ হেন রামা।
বিধি কৈল জঙ্গমে কনকপ্রতিমা॥ ইত্যাদি

এই চিত্র নিঃসন্দেহে পার্থিব কামনার রঙে রঞ্জিত; আর এই পার্থিব সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করেই চাঁদ "দুই লাখ" যোজন দূরে পালিয়ে যায়। কবির বস্তু-চেতনা কত গভীর ও ব্যাপক এই চিত্রটিই তার পরিচায়ক। রাধার (অথবা যে বাস্তব নারীকে কেন্দ্র করে কবি রাধার অঙ্গলাবণ্য বর্ণনা করেছেন) অঙ্গাবয়ব ও কান্তি তাঁকে পরিচিত বস্তু ও অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে; তিনি সেইসব বস্তু ও বস্তু-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা-আলোকে বিচার করে রাধার রূপলাবণ্যের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করেছেন। এই রূপ বর্ণনায় কবি যে অত্যন্ত পরিতৃপ্তি লাভ করেছেন তা বুঝতে পারি যখন দেখি তিনি ঘোষণা করছেন যে, কল্পিত ইন্দ্রপুরীতেও এই রূপের তুলনা মিলবে না। এই বাস্তব রূপলাবণ্যে কবি আবিষ্ট হয়েছেন, এবং তাঁর কৃষ্ণও তাই।

কবি শুধু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য রূপ বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হননি ; অথবা রাধাকৃষ্ণকে মানবিক গুণে সমন্বিত করেই কর্তব্য সম্পাদন করেননি। তাদের কামনাকেও মানবিক সম্পদে পরিণত করেছেন , কৃষ্ণ রাধার নিকট যা চাইছেন এবং রাধা কৃষ্ণের কাছে যা চাইছেন, তা ইন্দ্রিয় ভোগলিপ্সার অনুরাগে আপ্লুত। রাধার রূপ চিত্রণের ক্ষেত্রে যেমন, তাঁদের কামনার ক্ষেত্রেও তেমনি কবি কোনরূপ অলৌকিক অথবা পারমার্থিক সুখানুভূতির বা অতীন্দ্রিয় আনন্দের সংকেত দেননি। সবই এখানে জৈব, দৈহিক ব্যাপার, তাই ভিন্ জগতের কোন অযাচিত আগন্তুক বা ভাবের আক্রমণ এখানে নেই। যেমন, রাধার একটি স্বপ্নে

তিঅজ পহর নিশী মোঞেঁ কাহ্নাঞিঁর কৌলে বসী
নেহানিলোঁ তাহার বদনে।
ঈসত বদন করী মন মোর নিল হরী
বেআকুলী ভয়িলোঁ মদনে॥
চউঠ পহরে কাহ্ন করিল অধর পান
মোর ভৈল রতি রস আশে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

এখানে 'স্বর্গীয় প্রেমের' চিহ্ন অনুপস্থিত। সুতীব্র কাম চেতনায় আহত একজন মানবী তাঁরই মত বিহ্বল একজন পুরুষের প্রহর গুণছে। এই আকুতির চেয়ে সত্য আর কিছু হতে পারে না।

ঋতুর আগমন নির্গমন এবং মানব মনে তার প্রভাব সম্পর্কেও চণ্ডীদাস সচেতন। এও তাঁর বস্তু-চেতনার আরেক দিক। বসন্তকাল এসেছে, চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে, প্রিয়তমের স্পর্শে বসন্তের পত্রগুচ্ছের ন্যায় ফুটে ওঠার জন্য মন ব্যাকুল,

মুকুলিল কুঞ্জ নেআলী।
আণিআর বনমালী॥
দক্ষিণ মলয়া বাঅ বহে।
না জানো মো কেহ্ন করে গাএ॥

ঝাঁট করী কাহ্নাঞিঁ আনাওঁ।
রতী-সুখে রজনী পোহাওঁ॥

কিন্তু কৃষ্ণের কোন উদ্দেশ নেই। বসন্ত যে এসেছে সে কি তা টের পায়নি?

যেনা দিগেঁ গেলা চক্রপাণী।
সে দিগেঁ কি বসন্ত না জানী॥

কিন্তু কৃষ্ণ বসন্তকে বিস্মৃত হলেও রাধা হ'তে পারছে না। কেননা,

তিঅজ পহর রাতী কোকিল রএ।
বেআকুলী গোআলিনী মনত গুণএ॥
এভোঁ নাইল সেত নান্দের পুত।
কোকিলের নাদ মোকে যেহ্ন যমদূত॥

আশায় আশায় বসন্ত যাবে; তারপর গ্রীষ্ম পার হয়ে বর্ষা আসবে। কিন্তু তখন

আসাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ।
মদনে কদনে মোর নয়ন ঝুরএ॥
পাখী জাতী নহোঁ বড়ায়ি উড়ী জাওঁ তথাঁ।
মোর প্রাণনাথ কাহ্নাঞিঁ বসে যথাঁ॥
কেমনে বঞ্চিবোঁ রে বরিষা চারি মাষ।
এ ভর যৌবনে কাহ্ন করিলে নিরাস॥
শ্রাবন মাসে ঘন ঘন বরিষে।
সেজাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে॥
কত না সহিব রে কুসুম-শর-জালা।
হেন কালে বড়ায়ি কাহ্ন সমে কর মেলা॥
ভাদর মাঁসে অহোনিশি অন্ধকারে।
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহল।
তাত না দেখিবোঁ যবেঁ কাহ্নাঞিঁর মুখ।
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুট জায়িবে বুক॥
আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী।
মেঘ বহিআঁ গেলেঁ ফুটিবেক কাশী॥

তবেঁ কাহ্ন বিনী হৈব নিফল জীবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী-গণ॥

ভাবের দিক থেকে এই চিত্র অপরূপ। প্রকৃতির লীলা এবং ঋতুর আসা-যাওয়ার সংগে কবির সম্পর্ক কত নিবিড়! তাঁর হৃদয়ের সংযোগ কত ঘনিষ্ঠ! নিরন্তর পরিবর্তনশীল বস্তু-পরিবেশের মধ্যে কবির অধিষ্ঠান, ঋতুর পরিবর্তনে বিভিন্ন বস্তু এক স্বভাব থেকে স্বভাবান্তরে উপনীত হয়, মানুষের মনেও ভাব-ভাবান্তরের খেলা চলে। কবি তা জানেন, এবং এই সজীব পরিবেশের সংগে তাঁর সম্পর্কের কথা তিনি কখনও বিস্মৃত হন না। তাঁর এই সরস বাস্তব কবি-মানসই তাঁর রাধাকৃষ্ণকে সমসাময়িক সমাজ-জীবনের মধ্যে টেনে এনেছে, এবং সর্ববিধ মানবিক গুণে মণ্ডিত করেছে।

তারপর কবির ভাষা সম্পদ। যে সময়ে ন্যায় ও ব্যাকরণের আলোচনায় ও বিতর্কে সংস্কৃতের আসর মুখর ছিল, সে সময়ে চণ্ডীদাস একান্ত লৌকিক অর্থাৎ সর্বসাধারণের ভাষায় কাব্য রচনা করে মানুষের মন জয় করেছেন। আর লোকশিল্পের যা গুণ—অর্থাৎ এখানে পাণ্ডিত্যের কচকচি নেই কিন্তু তা হৃদয়ে দাগ কাটে—এই গুণ চণ্ডীদাসের ভাষায় পূর্ণ মাত্রায় রয়েছে। সরস, সরল, প্রত্যক্ষ এবং অলঙ্কারবর্জিত। কেননা, এ সহজ মানুষেরই প্রাণের কথা; সংবেদী মন এখানে প্রতিসংবেদী মনের জন্যই ভাবের গুচ্ছ সাজিয়ে রেখেছে। সাধারণ জীবনের ভাষায় এবং চিত্রে কবি যে রসের অবতারণা করেছেন, তা অনবদ্য। কংসের সভায় নারদের আগমন বর্ণনায় কবি লিখেছেন,

পাকিল দাড়ী মাথার কেশ।
বামন শরীর মাকড় বেশ॥
নাচএ নারদ ভেকের গতী।
বিকৃত বদন উমত মতী॥
খনে খনে হাসে বিনি কারণে।
খনে হুএ থোড় খনেকেঁ কানে॥
লম্ফ দিআঁ খনে আকাশ ধরে।
ক্ষণেকেঁ ভুমিত রহে চিত্তরে॥

মিলে ঘন ঘন জীহের আগ।
রাঅ কাঢ়ে যেন বোকা ছাগ॥ ইত্যাদি

রাধা কৃষ্ণপ্রেমে আকৃষ্ট হওয়ার পূর্বে রাধাকৃষ্ণের মধ্যে যে কথা কাটা-কাটি ও বিদ্রূপ বিনিময় হয়েছে, তাও অপূর্ব। বড়ু চণ্ডীদাসের রাধা-কৃষ্ণ যে সর্বতোভাবে এই মাটিরই মানুষরূপে পরস্পরকে সৃষ্টি করেছে, তার পরিচয় এখানেও মিলবে। দু-একটা দৃষ্টান্ত থেকে এর মূল সুরটি ধরা যাবে। কৃষ্ণ একস্থানে বলছেন,

ছাওআল না দেখ মোরেঁ মাথে ঘোড়া চুলে।
মুণ্ডেঁ মুণ্ডেঁ ডুসাআঁ মারিবোঁ তোহ্মা ংেলে॥

আরেক স্থানে রাধা কৃষ্ণের সদম্ভ বীরত্বের উত্তরে বলছেন,

বুঝিল কাহ্নাঞিঁ তোমার বিরত
মিছা না করহ দাপে।
আছুক তোহোর কথা হেন করিতেঁ
নারে তোর বাপে॥

প্রাত্যহিক জীবনের এমনি কথোপকথনের অজস্র দৃষ্টান্ত গ্রন্থের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। বিরহখণ্ডে কৃষ্ণ রাধার সমর্পিত যৌবনঁ প্রত্যাখান করে বলছেন, "পোটলী বান্ধিএঁা রাখ নহুলী যৌবন।" অত্যন্ত একটি মোটা কথা অথচ কত গভীর অর্থবহ। কবি তাঁর চারিপাশের প্রবহমান জীবন সম্পর্কে কতখানি সজাগ সতর্ক ছিলেন, এবং প্রচলিত জীবন প্রবাহের মধ্যেই যে তিনি অবগাহন করেছেন, তা নিঃসন্দেহ। বড়ু চণ্ডীদাসের আমলে সংস্কৃত পণ্ডিতগণ দেশজ লৌকিক ভাষার চর্চা বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন, এবং লৌকিক ভাষায় কাব্য রচনার জন্য কৃত্তিবাস প্রভৃতিদের বিদ্রূপ করেছিলেন। কিন্তু সংস্কৃতা-ভিমানী সমাজ-বিধায়কদের এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে যাঁরা লোক-জীবনের ভাষা, ভাব এবং খণ্ড খণ্ড চিত্রকে চিরকালের জন্য সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁরা তাঁদের আমলে কম দুঃসাহসের পরিচয় দেননি। এই দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের মধ্যে চণ্ডীদাস একজন। তাঁর কাব্যের মাধ্যমে বিরাট জনসমষ্টিই যেন তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এই বস্তু-নিষ্ঠারই আরেক দিক রাধার কুল-চেতনা। গ্রন্থের প্রথম দিকে কৃষ্ণ যখন রাধার প্রেম প্রার্থনা করে বার বার বড়ায়িকে পাঠাতে লাগলেন,

এবং সামনাসামনি নিজেও রাধার নিকট সে প্রার্থনা জানালেন, তখন রাধা ঘৃণাভরে সে সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। সমাজধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ তাঁর জীবন ; সুতরাং সমস্ত প্রকারে সমাজধর্মকে সম্মান করে চলাই বিধেয়। রাধা এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ, তাই সমস্ত অনুরোধ আবেদনের বিরুদ্ধে তাঁর উত্তর,

ধিক জাউ নারীর জীবন
দহে পসু তার পতি।
পরপুরুষের নেহাএ যাহার
বিষ্ণুপুরে স্থিতি ॥

তারপর ধীরে ধীরে যখন কৃষ্ণপ্রেম তাঁর অন্তরে দানাবেধে উঠতে আরম্ভ করেছে, তখনও তাঁর কুলভয় কাটেনি ; এবং বড়ায়িও তাঁকে তাঁর কুলের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছে,

একে তুমি কুলনারী কুল আছে তোর বৈরী
আর তাহে বড়ুয়ার বধূ। (১)

এমন কি রাধা যখন একান্তই কৃষ্ণগত প্রাণ, এবং কৃষ্ণের সংগে একাধিকবার তাঁর মিলনও সংসাধিত হয়েছে, তখনও বারবার কুলের বন্ধন অমান্য করার অপরাধ তাঁকে সব সময় পীড়া দিচ্ছে। তিনি বলছেন,

কুলে দিনু তিলাঞ্জলি গুরুদিঠে দিনু বালি,
কানু লাগি এমতি করিনু।
ছাড়িনু গৃহের সাধ কানু কৈল পরিবাদ
তাহার উচিত ফল পাইনু। (২)

অবশ্য পরিপূর্ণ সুখাস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা সার্থক হয়নি বলেই কুলত্যাগের চেতনা বেশী করে তাঁকে পীড়া দিয়েছে। এক্ষেত্রে আক্ষেপ স্বাভাবিক ; কিন্তু কুলচেতনা যে অলক্ষ্যে কাজ করছে তাও অস্বীকার করা যায় না। প্রচলিত বর্ণপ্রথা শাসিত সমাজে বর্ণ উপবর্ণের সামাজিক আচরণ পূর্ব থেকেই নির্ধারিত এবং সীমিত। মনের সহজ স্বচ্ছন্দ বিস্তার এখানে স্বীকৃত নয় ; ঐ বন্ধনীর মধ্যেই তাকে চলাফেরা করতে হ'তো। বাংলায় বিদেশাগত সেন রাজাদের

---

১ চণ্ডীদাস পদাবলী ; হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ; পৃঃ ১

২ ঐ পৃঃ ১৯

আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই ব্রাহ্মণ্য সংস্কার অনুযায়ী দৃঢ়বদ্ধ সুসংহত সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা হয়। কিন্তু মনের স্বাভাবিক গতিধারাকে অস্বীকার করায় এই সমাজ ব্যবস্থা বহুবিধ অনার্য কুশ্রী আচরণকে পরোক্ষে স্বীকার করতে বাধ্য হয়। আর ফলটাও তাই প্রত্যক্ষ মিললো। অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে এই সমাজ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হ'লো। এই ধ্বংসের প্রবাহের মধ্যে মুসলিম চিন্তাধারা মিশ্রিত হওয়ায় ধ্বংসের গতিবেগ সম্ভবত বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই ব্রাহ্মণ্য সংস্কার-সংস্কৃতির ধারকগণ এই ধ্বংসপ্রবাহকে রোধ করার চেষ্টা করেন। চণ্ডীদাসের আমলে এই প্রচেষ্টা একটু অতিমাত্রায়ই হয়ে থাকবে; তাই চণ্ডীদাসের রাধা কুলধর্মের চিন্তায় এত বেশী চিন্তিত।

কিন্তু কুলধর্মের চিন্তায় চিন্তিত হয়ে জীবনকে সঙ্কুচিত করা কি যায়? জীবন যে নিজেকে প্রকাশ করতে চাইছে, চিরন্তন আনন্দের মধ্যে সৃষ্টি করতে চাইছে, প্রিয়তমের সুখস্পর্শে মধুর হয়ে ফুটে উঠতে চাইছে। প্রকাশের সহজ ধর্মই তো এই যে, এ সীমার বন্ধন স্বীকার করে না, সৃষ্টি-পথের কণ্টককে লঙ্ঘন করেই তবে পূর্ণতা অর্জন করে। রাধা তো তাঁর জীবনের পূর্ণতাই কামনা করছেন। সুতরাং সীমার বন্ধন তাঁর মানলে চলবে কেন? অসীমের মধ্যে, বিরাটের মধ্যে, পূর্ণতার মধ্যে মনের যে স্বাভাবিক বিস্তার, তার পথরোধ করলে চলবে কেন? তাই

কহে বড়ু চণ্ডীদাসে, কুল শীল সব ভাসে,
লাগিল কালিয়া-প্রেম-মধু॥

তাই রাধা সমাজ-ধর্মকে অস্বীকার করলেন। কোন অতিপ্রাকৃত শক্তির আবির্ভাবের জন্ম বসে না থেকে অথবা এই জন্মে নয় পরজন্মে প্রেমাস্পদের সংগে মিলিত হবো, এই চিন্তায় মুহ্যমান না হয়ে রাধা বাস্তবসমাজকে এবং সামাজিক সম্পর্ককে রূপায়িত করার কর্মে অগ্রসর হলেন। সৃষ্টির প্রেরণায়, কৃষ্ণের স্পর্শে পূর্ণতালাভের আকাঙ্ক্ষায় তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আর কল্পনায়, ভাবে যে সুন্দর হয়ে মনোজগতে ধরা পড়ল, সেই তো সুন্দর; হৃদয় রসে যে সত্য হয়ে ফুটে উঠল সেই তো সত্য, তার সামাজিক অধিষ্ঠান যা-ই কেন না হোক। তাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, তার সংগে মিলিত হওয়ার আশাই তো মনের স্বাভাবিক ধর্ম। মনের এই ধর্মের সংগে সমাজ-ধর্মের মিল কোথায়? কিন্তু মিল নেই বলে মনকে অস্বীকার করে সমাজ-ধর্মের

নিকট নতি স্বীকার করতে হবে? বড়ু চণ্ডীদাসের রাধা তা করেন নি, তাই তিনি ঘোষণা করছেন

জনম হইতে কুল গেল ধর্ম্ম গেল দূরে।
দিবানিশি মোর মন কাহ্নু লাগি ঝুরে॥
নিষেধিলে নাহি মানে ধরম বিচার।
বুঝিনু নেহার হয় স্বতন্ত্র আচার॥
করমের দোষ এই জনমে কি করে।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীর বরে॥ (৩)

শুধু চণ্ডীদাস ভণিতায় একটি পদে আছে,

চণ্ডীদাস কয় কলঙ্কে কি ভয়
যে জন পিরীতি করে।
পিরীতি লাগিয়া মরয়ে ঝুরিয়া
কি তার আপন পরে॥ (৪)

কবির এই বিদ্রোহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে মুসলিম বিজয়ের একটা অবশ্যম্ভাবী ফল এই হয়েছিল যে, সে আমলে বহির্জগতের সহিত ভারতের হৃত সংযোগ পুনরায় স্থাপিত হয়। দেশবিদেশের বিচিত্র মানুষের সহিত সংমিশ্রণের ফলে ঐ বৈচিত্র্যের মধ্যেও চিন্তায়, ভাবে, কর্মে ও অনুভূতিতে একটা ঐক্যসূত্র ধরা পড়ে। ফলে, চিন্তার দিক থেকে প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্রধর্মিতা শিথিল হতে আরম্ভ করে, এবং মানুষের অন্তর্নিহিত মানবতা পরস্পরের সংগে মিলিত হওয়ার পথ খোঁজে। এইজন্য সে সময়কার অগ্রচারী ভাবধারা ছিল উদার। ভেদবিচারের ব্যবধান ঘুচিয়ে দেবার চেষ্টাও এই থেকে। দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতার একটি পদে আছে

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর॥ (৫)

দেশবিদেশের মানুষ এসে হৃদয়ে কোলাকুলি করতে আরম্ভ করেছে। রাধার কৃষ্ণপ্রেমও অনায়াসে সমস্ত বন্ধন ও সীমা অতিক্রম করে সার্থকতার

---

৩ চণ্ডীদাস পদাবলী; পৃঃ ১৬

৪ ঐ; পৃঃ ১১৭

৫ ঐ; পৃঃ ১৮৭

পথে এগিয়ে যেতে পারে। আর তেমনি অনায়াসে সে সমাজ-ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে। চণ্ডীদাস এবং দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতায় পদ দুটো যদি বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা নাও হয়ে থাকে, তাহলেও "বুঝিনু নেহার হয় স্বতন্ত্র আচার।" এই উক্তির মধ্যেই বিদ্রোহের ভাব আত্মগোপন করে আছে। আর শুধু "নেহার" নয়. মানুষ হিসেবে মানুষের সংগে মানুষের পারস্পরিক আচরণ ব্যবহার প্রচলিত আদর্শ থেকে স্বতন্ত্র কিছু দাবী করে। উপনিষদ-উত্তর হিন্দু সমাজ-সংস্থায় অসাম্যকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল; সেই সমাজ কাঠামোই নানা ভাবে বিকৃত হতে হতে পরিণামে এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে তা সর্ববিধ মানবিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়। চণ্ডীদাসের সমকালীন সমাজের এই দুর্নীতি তাকে পীড়া দিয়েছে; তাই তিনি এবং তাঁরই মত সংবেদনশীল পরবর্তী কালের বৈষ্ণব গীতিকারগণ প্রেম দিয়ে এই অসাম্যের ব্যবধানকে জয় করতে চেয়েছেন। আত্মপর অভিন্ন জ্ঞানে তাঁরা সমাজকে এবং সামাজিক আচরণকে নতুন ভাবে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। তাই "নেহার" ক্ষেত্রে যেমন "এক তনু হৈয়া মোরা রজনী গোঙাই", সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রেও "পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর"। সে যুগে এই পরিপ্রেক্ষিত এবং এই কথা নতুন। কারণ, তত্ত্বের দিকে থেকে সম-দর্শনের আদর্শ বহু পুরাতন হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মানুষ এই কথা বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। তাই এই ভুলে-যাওয়া কথাটাকেই নতুন করে প্রচার করার প্রয়োজন ছিল। সেদিনকার সমাজে সমাজ-ধর্মের উপরে হৃদয়বৃত্তির বিজয় ঘোষণা এবং আত্মপর অভিন্নতার ঘোষণা বিস্ময়কর। তাতে একদিকে কবির মানব-প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জীবন ও মর্যাদা এবং স্বীকৃতি লাভ করেছে। আর যুগের ভাবধারা কোন দিকে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করেছে, এ থেকে তার স্বাক্ষরও মিলবে।

কিন্তু পূর্ণতা লাভের আশায় সমাজ-ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেও একটা অশ্রুভরা বেদনা কাব্যের ভিতর দিয়ে অনুরণিত হয়ে উঠেছে। এই বেদনা হলো, চেয়ে না পাওয়ার বেদনা। ইন্দ্রিয়ের এবং মনের সহজ ধর্ম হ'লো ভোগাকাঙ্ক্ষা; পৃথিবীর যা কিছু দেওয়ার আছে তাকে আস্বাদন করে মন পরিতৃপ্তি লাভ করতে করতে চায়; এই পরিদৃশ্যমান জগতের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় ও সৃষ্টি চায়। কিন্তু সমাজের বিধি-ব্যবস্থাই এমনি যে, মনের এই চাওয়া কখনও পাওয়ার পূর্ণতায় ভরে ওঠে না; আর তা হয় না বলেই তো দুঃখ। বড়ু

চণ্ডীদাস বলেছেন, "আপনা আপনি মঞী বৈরী বাসিয়ে গো ;" (৬) কেন না, আমি চাই বলেই তো না পেয়ে দুঃখিত হই। কিন্তু এই যে চাওয়া, এর মধ্যে দিয়ে তো জীবনই অভিব্যক্তি লাভ করতে চাইছে। আর পাওয়ার আশা যখন ক্রমেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে, এবং প্রতিকারের যখন কোন পন্থাই দেখা যায় না, তখন জীবন হতাশায় ভেংগে পড়ে, এই জাগতিক অস্তিত্বটাকেই মনে হয় অর্থহীন, দুঃসহ। রাধা আক্ষেপ করে বলছেন,

অহোনিশি মো আন না জাণো
এত দুঃখ কহিবোঁ কাএ।

চারিদিগেঁ তরু পুষ্প মুকুলিল
বহে বসন্তের বাএ।
আম্ব-ডালে বসী কুয়িলী কুহলে
লাগে বিষ-বাণ ঘাএ॥
চান্দ সুরুজের ভেদ না জানো
চন্দন শরীর তাএ।
কাহ্ন বিণি মোর এবেঁ এক খন
এক কুল যুগ ভাএ॥

গ্রন্থে রাধা কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পর এবং কৃষ্ণের নিকট থেকে বঞ্চনালাভের পরই এই চেতনা বিকশিত হতে থাকে। পরিশেষে এই বেদনা এমনি এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, মন আপনা থেকেই বলে উঠেছে

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজ মুকুতার হার॥
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ সিসের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর॥

মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর।
যোগিনী রূপ ধরী লইবো দেশান্তর॥

৬ ঐ ; পৃঃ ৭

যবেঁ কাহ্ন না মিলিহে করমের ফলে।
হাতে তুলিআ মো খাইবোঁ গরলে।

ইত্যাদি

না-পাওয়ার দুঃখ জীবনকেও অস্বীকার করতে চলেছে। এই যে দুঃখ তা শুধুমাত্র প্রেমাস্পদের সংগে মিলিত না হতে পারা থেকেই যে আত্মপ্রকাশ করে তা নয়; শ্রীকৃষ্ণকে যদি আনন্দস্বরূপ, কল্যাণস্বরূপ অথবা পরম পুরুষ বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহ'লে তাঁর সংগে একাত্ম না হ'তে পারা থেকেও অনুরূপ দুঃখ এবং জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধা জন্মলাভ করতে পারে। কেন না, বাস্তব জীবনের ব্যর্থতা থেকেই কল্পলোকের আনন্দস্বরূপে ফিরে যাওয়ার চেতনা দেখা দেয়; সংসারের অন্যায় অবিচার অকল্যাণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যই মানুষ কল্যাণ স্বরূপের কল্পনা করে; আর তেমনি সংসারের প্রতিকূল শক্তি সমূহের নিকট পরাভূত হয়েই মানুষ পরম পুরুষের সৃষ্টি করে এবং তাতে মিলিত হয়ে শান্তিলাভের স্বপ্ন দেখে। এই কামনার মধ্যেও চেয়ে না-পাওয়ার বেদন মিশ্রিত। মানুষ সামগ্রিকভাবেই নিজের জীবনকে সৃষ্টি করতে চায়; তাই কোন একটা দিক অপূর্ণ অনাস্বাদিত থাকুক, এটা তার পক্ষে অসহ্য। চোখ তার অসীমের পানে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে কেন, আংশিকভাবেও মানুষ নিজেকে বিকাশ করার সুযোগ ও অধিকার সমাজের কাছ থেকে পায় না। তাই তার ক্ষোভ দুঃখও অপরিসীম। এই দুঃখ শুধু বড়ু চণ্ডীদাসের ভাবজগতের রাধার বিরহের দুঃখবেদনা নয়, এ দুঃখবেদনা সমকালীন বাস্তব জীবনেরও। কবির ভাবাকাশ থেকে সমকালীন বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে।

প্রচলিত বর্ণপ্রথা শাসিত সমাজে সমাজের নিম্ন বর্ণগুলির এবং বর্ণাশ্রমের বাইরের ম্লেচ্ছ পর্যায়ের লোকদের জীবন যে বিন্দুমাত্রও সুখের ছিল না, তা সর্বথা স্বীকৃত। তাই মুসলমান বিজয়ের মধ্যে সমাজের নিম্নস্তরের অনেকেই ব্রাহ্মণ্যসমাজের উৎপীড়ন থেকে মুক্তিলাভের আশা করেছিল; মুসলমান অভিযানকারীদের প্রতি তাদের পরোক্ষ সমর্থনও ছিল সম্ভবত। "ব্রাহ্মণ্য পন্থীদিগের উপর মুসলমান অভিযানকারীদিগের অত্যাচারে যে সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিত বৌদ্ধ অথবা অনার্য্য মতাবলম্বীদিগের স্পষ্ট অথবা উহ্য সহানুভূতি ছিল, তাহা একটি ধর্ম্মপূজাপদ্ধতিতে এবং সহদেব চক্রবর্ত্তীর

ধর্মমঙ্গলে প্রাপ্ত 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' কবিতাটি হইতে জানিতে পারা যায়।" (৭) পূর্ববাংলায় ব্যাপক ধর্মান্তর গ্রহণের একটি কারণ সম্ভবত এখানে নিহিত রয়েছে। কিন্তু ধর্মান্তর গ্রহণ করে সামাজিক অধিকার লাভ করলেও সামগ্রিক-ভাবে জীবনের দৈন্য হাহাকার যে দূর হয়নি তা বলাই বাহুল্য। তাই, যুগযুগ ধরে এই বঞ্চনা ও না-পাওয়ার দুঃখকেই তারা পালন করে এসেছে। বড়ু চণ্ডীদাসের উক্তি

যে ডালে করোঁ মো ভরে সে ডাল ভাঙ্গিঞা পড়ে
নাহি হেন ডাল যাত করোঁ বিসরামে।

—এ কথায় সাধারণ মানুষের জীবনের সত্য পরিচয় দেওয়া চলে। আর শুধু চণ্ডীদাসের সমকালীন মানুষের কেন, আমাদের কালের মানুষেরও এই একই কথা। রাজ্য ভাঙ্গাগড়ার কালে, বিভিন্ন ধর্মমত এবং সাংস্কৃতিক চিন্তা-ধারার সংঘাতের লগ্নে সাধারণ মানুষের অপরিসীম দুঃখবেদনার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত কবির সংবেদনশীল মনে অতিমাত্রায় আঘাত করে থাকবে হয়তো। আর সেই দুঃখানুভূতি কবির মননকে আশ্রয় করে রাধার মর্মবেদনাকে সম্ভবত তীব্রতর করেছে। কারণ, কবির মনোজগৎ এক অখণ্ড ভাবের রাজ্য। বহু উপাদান নিয়ে তা সংগঠিত হয়।

জীবনের এই অসহনীয় দুঃখের ভারে জীবনকে মনে হয় দুর্বিষহ, আর মৃত্যুকে বরণ করার জন্য মন হয় ব্যাকুল। কিন্তু মৃত্যু বরণ করলেই কি আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হবে, চাওয়ার দুঃখ পাওয়ার আনন্দে পরিপ্লুত হ'বে? মরলেই কি ভাল হয়? কৃষ্ণ বিরহ সহ্য করতে না পেরে রাধা বলছেন, মরাই তাঁর পক্ষে ভাল। বড়ু চণ্ডীদাস বলছেন, "এমতি না বল"। কারণ, যদিও জীবন দুঃখতাপে ভরা, সংসার বঞ্চনায় ভরা, সমাজ অকল্যাণের আদর্শে গঠিত, প্রেমাস্পদের সংগে মিলিত হওয়ার পথ কণ্টকিত, এবং যদিও এখানে সৃষ্টির পথ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, তথাপি এই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেই বসবাস করতে হবে, বাঁচতে হবে, এবং সমস্ত প্রতিকূল শক্তিকে পরাভূত করে নিজেকে সৃষ্টির পথ করে নিতে হবে। সংসারের অবিচার থেকে মুক্তি লাভের পথ সংসার থেকে পলায়ন নয়, সংসারের বুকে থেকে সংগ্রাম করে

৭ সুকুমার সেন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড; পৃ. ৫৮

এই অবিচারকে দূর করা। এর বাইরে কিছু নেই, এখানেই সব সত্য বিরাজমান। কবির কথায়, যদিও

আকাশ জুড়িয়া ফাঁদ, যাইতে পথ নাই।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস মিলিবে এথাই ॥ (৮)

কবির দৃষ্টি একান্তই বাস্তব। তিনি বাস্তব সংসারের মধ্যে, সমাজ-সম্পর্কের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থেকেই নিজের জীবনকে সৃষ্টি করতে চান, জীবনের আনন্দ উপলব্ধি করতে চান। কারণ, এই পৃথিবীই সমস্ত রূপরস আনন্দের আধার। তাই কবি স্বচ্ছন্দে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন যে, রাধার মত সুন্দরী কল্পিত ইন্দ্রপুরীতেও নেই। চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব গীতিকারগণও ঘোষণা করেছিলেন যে, দেবতার সাধ্য নয় মানুষের সমান হওয়া। সুতরাং এই পৃথিবী এবং পৃথিবী আশ্রিত বস্তুসমূহ যদি দেবলোকের চেয়ে সুন্দর, মধুর এবং শ্রেয় হয়ে থাকে, তা হলে দেবতা হয়ে লাভ কি, মানুষরূপেই তা আস্বাদন করা যেতে পারে। সেটাই তো বিধেয়। আর দেহ না থাকলে সুখ-দুঃখানুভূতি, চাওয়া-পাওয়ার চেতনাই বা থাকবে কোথায়? তাই রাধা সখীদের ঘরে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করে যমুনার জলে ডুবে মরার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে কবি বলছেন,

চণ্ডীদাসে বলে কেন কহ হেন কথা।
শরীর ছাড়িলে প্রীতি রহিবেক কোথা ॥ (৯)

পরবর্তীকালে বৈষ্ণবরাও সেজন্য মুক্তি কামনা করেননি। হৃদয়ের প্রেমরস দিয়ে তাঁরা এই জগৎকেই মধুর করতে চেয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর যা পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে, তার নিশ্চিত সুস্পষ্ট চিহ্ন আঁকা রয়েছে বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, কবি একজন বিরাট পুরুষের বিচরণ ভূমি পূর্ব থেকে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। এই ভূমি মানবিক ঐশ্বর্যে পরিমণ্ডিত, এবং মানবিক প্রেম-প্রীতিরসে রঙীন। সমকালীন ব্রাহ্মণ্যচিন্তাধারা যেখানে স্থূল বস্তুজগৎকে অস্বীকার করে এক অতীন্দ্রিয় সত্তায় মিশে যাওয়ার সাধনায় নিমগ্ন ছিল, সেখানে এই স্থূল জগৎকেই সমস্ত সত্যের আশ্রয়স্থল রূপে কল্পনা করে,

৮ চণ্ডীদাস-পদাবলী: পৃঃ ১৫
৯ ঐ; পৃঃ ৩৪

মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই এ কথা প্রচার করে, এবং মানব দেহকেই সুখ-দুঃখ-প্রেম-প্রীতি-আনন্দ আস্বাদনের একমাত্র মাধ্যম বলে স্বীকার করে কবি বস্তু জীবনের জয়গান এবং প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। সনাতন চিন্তাধারার বিরুদ্ধে বড়ু চণ্ডীদাসের এই যে আদর্শগত ও ভাবগত বিদ্রোহ, এর মাধ্যমে মানুষের বাঁচার সহজ ধর্মই নিজেকে ঘোষণা করেছে। মানবজীবনের এই আত্মঘোষণার নিকট দেবতার দেবত্ব নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

আর কবির এই মানবিকতার আদর্শ থেকে এই সংকেতও পাওয়া যাচ্ছে যে, মানুষ নবতর মানবিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য সৃষ্টির জন্য চঞ্চল হয়ে পড়েছে, এবং বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী সংস্কৃতি ও ধর্মচিন্তার ঘাত প্রতিঘাত থেকে বিশেষ মানবিক গুণটি অবলম্বন করে নতুন সমাজ সৃষ্টির প্রচেষ্টায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে।

দুই

বিদ্যাপতিও চণ্ডীদাসের অনুরূপ সাংস্কৃতিক পরিবেশ হ'তে রস আহরণ করেছেন, এবং তাঁর কাব্যের ভাবসম্পদও সেই সংস্কৃতির প্রয়োজন-সম্ভূত। বড়ু চণ্ডীদাসের মত তিনি ধারাবাহিকভাবে কোন পালাগান রচনা করেননি; তাই তাঁর বিভিন্ন সময়ে রচিত খণ্ড খণ্ড গীতি কবিতাগুলি থেকে ভাব-বিবর্তনের একটা নিশ্চিত নির্দেশ দেওয়া কঠিন। তথাপি সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত সংস্করণে বিদ্যাপতির পদগুলিকে ভাবসম্পদের প্রতি লক্ষ্য রেখে যে ভাবে সাজানো হয়েছে, তাতে বিবর্তনের একটা নির্দিষ্ট ছাপ সহজেই ধরা পড়ে। এই বিবর্তন স্থূল দেহসম্ভোগের জগৎ থেকে ভাবের জগতে উপনীত হওয়ার বিবর্তন।

প্রথমতঃ কবি প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-ভোগাস্বাদনের দৃষ্টিতেই তাঁর চারিদিকের বহমান সজীব পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছেন, তাই বড়ু চণ্ডীদাসের মতই কবির কল্পনা, মনন ও দৃষ্টি বস্তুকে আশ্রয় করেই পরিপুষ্টি লাভ করেছে, এবং এই বস্তু-জগৎই কবির সৃষ্টিচঞ্চল মন ও ভাষার মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এক্ষেত্রে কবি-কর্মের পক্ষে যা অপরিহার্য যথা, তাঁর ব্যাপক জীবনবোধ, সজীব সজাগ দৃষ্টি, স্থির নির্ভুল বিষয়-চেতনা এবং

প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যের সংগে ঘনিষ্ঠ সংযোগ, সমস্তই তাঁর মনোজগৎকে আলোকিত করেছে। তাই কবির পক্ষে বিভিন্ন বস্তুকে একত্র সংগ্রথিত করে এবং পরস্পরকে সম্পর্কিত করে মালা গাঁথা সম্ভব হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

পল্লবরাজ চরণ-জুগ সোভিত
গতি গজরাজক ভানে।
কনক-কদলি পর সিংহ সমারল
তাপর মেরু সমানে॥
মেরু উপর তুই কমল ফুলায়ল
নাল বিনা রুচি পাঈ।
মনিময় হার ধার বহু সুরসরি
তেঁ নাহি কমল সুখাঈ॥
অধর বিম্ব সন দসন দাড়িম-বিজু
রবি সসি উগথিক পাসে।
রাহু দূর বস নিয়রো ন আবথি
তেঁ নহি করথি গরাসে॥
সারঙ্গ নয়ন বয়ন পুনি সারঙ্গ
সারঙ্গ তসু সমধানে।
সারঙ্গ উপর উগল দস সারঙ্গ
কেলি করথি মধুপানে॥ (৬২ নং পদ)

[পদযুগলে পল্লবরাজ (কমল) শোভা পাচ্ছে, চলন গজেন্দ্রের ন্যায়, স্বর্ণকদলীর (উরুর) উপর সিংহ (অর্থাৎ সিংহের মত কটি), তার উপর মেরুর (বক্ষঃদেশ) সমান। বক্ষঃ দেশের উপর দুটো পদ্ম ফুটেছে, নাল ছাড়াও তা শোভা পায়। গংগার ধারার ন্যায় মণিময়হার বইছে, তাই পদ্ম শুকোয় না। ঠোঁট বিম্ব সদৃশ, দাড়িম্ব বীজের মত দশন, রবি (সিন্দুরের টিপ?) শশী (মুখ) পাশাপাশি উদিত হয়েছে। রাহু (কেশ) দূরে আছে, কাছে আসে না; তাই গ্রাস করে না। (তার) বচন কোকিলের (কোকিলের স্বরের ন্যায় মধুর), নয়ন হরিণের; তার সন্ধানে (কটাক্ষে) মদন। কপালে দশটি ভ্রমর (চূর্ণকুন্তল?) ক্রীড়াচ্ছলে মধুপান করছে।] কবি রাধার এই রূপ বর্ণনার চিত্রে বহু সূত্র থেকে বাছাই করা সম্পদ আহরণ করেছেন,

এবং বড়ু চণ্ডীদাসের রাধার মত সে ইন্দ্রপুরীতেও দুর্লভ না হলেও, এর সম্পর্কে কৃষ্ণকে বলতে হচ্ছে যে প্রয়াগে একশ যজ্ঞ উদ্‌যাপন করলে তবে এইরূপ রাধা লাভ করা যায় (৩৪ নং পদ. সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ)। অন্যান্য স্থানেও রাধার যে চিত্র আঁকা হয়েছে, তাও অত্যন্ত বস্তু-নিষ্ঠ এবং ভোগের, কামনার রসে সঞ্জীবিত। এই কামনা যে একান্তই পার্থিব তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কবি রাধার বয়ঃসন্ধি বর্ণনায় অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন; সৃষ্টিশীল জীবনের গতি-চাঞ্চল্য, এবং উদ্বেল প্রেরণা এখানে চলচ্চিত্রের ন্যায় কবি মানসে ধরা পড়েছে এবং অত্যন্ত নৈপুণ্যের সহিত কবি তা এঁকেছেন। তাঁর চারিদিকের চঞ্চল জীবন সম্পর্কে কবির দৃষ্টি কতখানি গভীর ছিল, নীচের কয়েকটি লাইন তার পরিচায়ক। যথা

খনে খনে নয়ন কোন অনুসরঈ।
খনে খনে বসনধূলি তনু ভরঈ॥
খনে খনে দসন ছটা ছুট হাস।
খনে খনে অধর আগে করু বাস॥
চউকি চলএ খনে খনে চলু মন্দ।
মনমথ-পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥
হিরদয়-মুকুল হেরি হেরি থোর।
খনে আচর দএ খনে হোয় ভোর॥ ইত্যাদি (৫৪ নং পদ)

[ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণ অনুসরণ করে, কখন কখন বস্ত্র ধূলায় লোটায় এবং দেহে ধূলি মাখায়। ক্ষণে ক্ষণে হেসে দশনের ছটা মুক্ত করে, ক্ষণে মুখে কাপড় দেয়। ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়ে ধীরে ধীরে চলে। (ইহা) মন্মথপাঠের প্রথম পাঠ। হৃদয়ের মুকুল (পয়োধর) একটু একটু দেখে ক্ষণে আঁচলে ঢাকে ক্ষণে ভুলে যায়। ইত্যাদি] অনুরূপ বহু চিত্র এই অংশে রয়েছে। মানব সমাজের বাইরে এবং চারিদিক ঘিরে যে প্রাকৃতিক জগৎ বিস্তৃত রয়েছে, যেখানে আপনা থেকেই সৃষ্টির লীলা চলেছে, সেই সহজ সৃষ্টির প্রেরণায় রাধা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তাঁর চলনবলন-ভঙ্গীতে সেই চাঞ্চল্যই মূর্ত হয়ে উঠেছে। আর কবি বিস্ময়াবিষ্ট চোখে সেই লীলার স্বাদ গ্রহণ করছেন। কি অপরূপ অদ্ভুত আনন্দে গড়া মানুষের দেহ, বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিক্ষণে

উপনীত নারী দেহ্; কি অনাস্বাদিতপূর্ব রসে তা সিঞ্চিত; কি অজানা ইংগিতে তা রূপায়িত হয়ে উঠেছে। কবির সৌন্দর্য ও মাধুর্য-লিপ্সু মন অকৃপণ-ভাবে সেই রস পান করেছে, এবং পুনরায় তা সৃষ্টি করেছে। এই আনন্দ যেন আপনা থেকেই ফুটে উঠেছে, ফুটে ওঠাই এর ধর্ম; কিন্তু তেমনি ক্ষয় পেয়ে যাওয়াটা তার লক্ষ্য নয়। সে অনুক্ষণ তারই মত বিহ্বল অঙ্গ-আনন্দের সংগে মিলিত হতে চায়, এবং মিলিত হয়ে নতুন আনন্দকে সৃষ্টি করতে চায়। ইহাই সৃষ্টির ধর্ম, প্রাণের ধর্ম। কবি তা অনুভব করেছেন, এবং বয়ঃসন্ধিক্ষণে উপনীত রাধা ও কৃষ্ণকেও তিনি সেই সৃষ্টির আবেগে চঞ্চল প্রেমিক-প্রেমিকা রূপেই চিত্রিত করেছেন। আনন্দ আনন্দের সন্ধানে ব্যাকুল; কেননা, "সৌন্দর্য সুখ সম্ভোগের "তরঙ্গলীলা"য় (রবীন্দ্রনাথ) তাদের নেচে উঠতে হবে সৃষ্টিরই একান্ত প্রয়োজনে। রাধাকৃষ্ণে রূপায়িত এই সৃষ্টি চাঞ্চল্য যে বাস্তব পরিবেশের সৃষ্টি কর্মেরই প্রতিরূপ বা একটা অঙ্গ তা বলা নিষ্প্রয়োজন।

স্বাভাবিক প্রাণ ধর্মের অভিব্যক্তি রূপে এই প্রেম পরিকল্পিত হয়েছে বলে কবির দৃষ্টিতে রাধা ও কৃষ্ণ সম্পূর্ণ মানবী ও মানব। রাধা ও কৃষ্ণের পরিবর্তে সেখানে যে কোন নাম বসানো যেতে পারে, এবং তাতে এই প্রেমলীলার কোন রূপান্তরই সাধিত হবে না, বা এর কোন বৈশিষ্ট্যই ক্ষুণ্ণ হবে না। কবি স্বয়ং রাধা ও কৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় এবং প্রেমের মধ্যে কোন অলৌকিক তত্ত্বের সন্ধান করেননি অথবা কোন ইংগিতও করেননি। নিতান্ত স্থূল বাস্তব দৃষ্টিতেই তা দেখেছেন; বিশেষত কবি নিজে যেখানে রাধাকে 'যুবতী' 'বরনারী' 'নাগরী' ইত্যাদি এবং কৃষ্ণকে 'নাগর' বলে সম্বোধন করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করেননি। তাঁর কাছে এঁরা মানব মানবী, এবং তাঁদের প্রেম পার্থিব সম্পদ। শ্রীশ্রীপদকল্পতরু সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় প্রসঙ্গত বলেছেন, "বিদ্যাপতির মৈথিল কাব্যে আদিরসের বর্ণনায় যে স্বাভাবিকতা, আন্তরিকতা ও রসতন্ময়তা দেখা যায়—জয়দেবের অমর কাব্যেও ইহা দুর্লভ।" (১০) কিন্তু এই বর্ণনার আবেদন প্রধানতঃ ইন্দ্রিয়ের সুখস্পর্শের নিকট এবং তার সার্থকতাও দেহ-নির্ভর। প্রসংগত রাধা-কৃষ্ণের মিলনাত্মক ও ভাবোল্লাস অংশের বিভিন্ন পদের উল্লেখ করা যেতে পারে। মিলনের কোন কোন চিত্র এত বেশী রকমের বাস্তব ও দেহসর্বস্ব যে, আধুনিক পাঠক ন্যায়সঙ্গতভাবেই রুচির প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন। সে সব

১০ শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ৫ম খণ্ড; পৃঃ ১৭০

পদ থেকে উদ্ধৃতি না দিয়ে অন্যপদ থেকে কবির মনোভাবের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। যথা

জীবন চাহি জৌবন বড় রঙ্গ।
তবে জৌবন জব সুপুরুখ-সঙ্গ॥
সুপুরুখ-প্রেম কবহু নহি ছাড়।
দিনে দিনে চন্দকলা সম বাঢ়॥
তুহুঁ জৈসে রসবতি কানু রসকন্দ।
বড় পুনে রসবতী মিলে রসবন্ত॥
তুহুঁ জদি কহসি করিএ অনুসঙ্গ।
চৌরি পিরীতি হএ লাখ গুণ রঙ্গ॥ ইত্যাদি (৮২ নং পদ)

[জীবনের চেয়ে যৌবনের রঙ্গ বেশী; সুপুরুষের সংগ হলেই যৌবন সার্থক। সুপুরুষের প্রেম কখনও ছেড়ে যায় না, চন্দ্রকলার মত প্রতিদিন বাড়তে থাকে। তুমি যেমন রসবতী, কৃষ্ণও (তেমনি) রসের আধার, বড় পুণ্যে রসিক-রসবতীর মিলন হয়। তুমি যদি বল (তাহলে তাহার নিকট তোমার কথা) উত্থাপন করি, গুপ্ত প্রেমে লক্ষগুণ রঙ্গ হয়।]

প্রথম মিলনের পর রাধার জবানিতে একটি পদে আছে,

প্রথম সমাগম কে নাহি জান।
সম কএ তৌলল প্রেম পরান॥
কসল কসউটী ন ভেল মলান।
বিনু হুতবহে ভেল বারহ বান॥
বিকলএ গেলিহু রতন অমোল।
চিহ্নিকহু বণিকে ঘটাওল মোল॥
সুলভ ভেল সখি ন রহএ ভার।
কাচ কনক লএ গাঁথ গমার॥
ভনই বিত্তাপতি অসময় বানি।
লাভ লাই গেলাহু মূলহু ভেল হানি॥ (১৯৭ নং পদ)

[প্রথম মিলনের (রূপ) কে না জানে? প্রেম (ও) প্রাণ সমভাবে ওজন করল। কষ্টিপাথরে কষেও মলিন হলো না, বিনা আগুনে বারগুণ মূল্য বৃদ্ধি

গেল। অমূল্য রত্ন বিক্রী করতে গিয়েছিলাম, বণিক (কৃষ্ণ) চিহ্ন (রতিচিহ্ন) দিয়ে মূল্য কমিয়ে দিল। হে সখি, দাম কমল, সুলভ হলাম; মূর্খ কাচ ও সোনা নিয়ে (মালা) গাঁথে। বিদ্যাপতি দুঃসময়ের কথা বলছে, লাভের জন্য গেলাম, দামও কমে গেল।]

এই পদের ভাবটা হালকা, তরল। 'অভিসার,' 'বসন্ত' 'বিরহ' এবং 'ভাবোল্লাস' অংশের কতকগুলি পদ ছাড়া বিদ্যাপতিতে রসঘন নিবিড় ভাবের স্বাক্ষর কম। কবি ব্যক্তিগত জীবনে রাজা শিবসিংহের সভাকবি ছিলেন; রাজা ও রাজ-মহিষী লছিমা দেবীর অনুগ্রহ তিনি লাভ করেছিলেন, এবং তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্য তাঁকে পদ রচনা করতে হতো। রাজপ্রাসাদের সাংস্কৃতিক আবহাওয়া ও রুচিবোধ খুব মার্জিত বা উঁচু স্তরের না হওয়াই স্বাভাবিক, এবং রাজপ্রাসাদের আবহাওয়ায় কবি বিশেষভাবেই প্রভাবিত হয়েছিলেন, তা কল্পনা করাও অসঙ্গত নয়। রাধাকৃষ্ণ মিলনের যেসব চিত্রে শালিনতা রক্ষিত হয়নি অথবা যেসব পদের ভাবসম্পদ অত্যন্ত তরল, সে সব পদ রাজপ্রাসাদকে সম্মুখে রেখে রচিত হয়েছিল কি না তাও বিচার্য। রাজপ্রাসাদের প্রভাবেই হোক, অথবা কবির মনোভূমির বৈশিষ্ট্যের জন্যই হোক, কবির দৃষ্টি যে ইন্দ্রিয় সুখস্পর্শের প্রতি, একান্ত পার্থিব ভোগাস্বাদনের প্রতি সবিশেষ আকৃষ্ট ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তাই সুতীব্র বেদনা অনুভূতি এবং শূন্যতার মধ্যেও ভোগের আকাঙ্ক্ষা উঁকি দেয়, মন সৌন্দর্য-সম্ভোগের আনন্দে নৃত্য করে উঠতে চায়। বিদ্যাপতির পক্ষে বাস্তব আকর্ষণ বিস্মৃত হওয়া একান্তই কঠিন।

বড়ু চণ্ডীদাসের মত বিদ্যাপতিও সাধারণ জীবনের কথা ও চিত্র দিয়ে বহু ক্ষেত্রে ভাব প্রকাশ করেছেন, এবং অনেক পদে সম্পূর্ণ প্রাকৃত পরিবেশের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলাকে সংস্থাপন করেছেন। ফলে, তা অস্বাভাবিক সজীবতা অর্জন করেছে। চণ্ডীদাসের মত তিনিও গতিশীল সমাজ-প্রবাহের মধ্যে বসবাস করেছেন, এবং তাই তাঁর কল্পনাও বাস্তবের কোন না কোন অংশকে অবলম্বন করে বিকাশ লাভ করেছে। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা অপ্রয়োজনীয়; দুএকটি উদাহরণ থেকেই বাস্তব জীবনের সহিত কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। 'কৌতুক' অংশের একটি পদে আছে,

কউড়ি পাঠাওলে পাব নাহি ঘোর।
দীব উধার মাঁগ মতি ভোর॥

বাস না পাবএ মাঁগ উপাতি।
লোভক রাশি পুরুখ থিক জাতি॥
কি কহব আজ কি কৌতুক ভেল।
অপদহি কাহ্নক গৌরব গেল॥
আওল বইসল পাব পোআর।
সেজক কহিনী পুছএ বিচার॥
ওছাওন খঁড়তরি পলিআ চাহ।
আওর কহব কত অহিরিনি-নাহ॥ ইত্যাদি (২১৮ নং পদ)

[দাম পাঠালে ঘোল পায়না, মূর্খ ঘি ধার চায়। থাকবার জায়গা পায়না, খাবার জিনিস চায়; পুরুষরা লোভের রাশি। কি বলব আজকে কি রঙ্গ হলো, অস্থানে কৃষ্ণের গর্ব গেল। এলে, বসার জন্য বিচালি পায়, বিছানার কথা জিগ্যেস করে। বিছানা (যার) জীর্ণ মাদুর, (সে) পালঙ্ক চায়; গোয়ালিনী পতির কথা কি বলব?]

লঘু ভাবপ্রকাশের দিক থেকে পদ সরস। এমনি বর্ণনা অথবা "পীন পয়োধর গোরা। উলটল কনক কটোরা॥" (স্থুল পয়োধর যেন উপুর-করা সোনার বাটির মত), ইত্যাদি ধরণের উপমা রাজ-সভার কবির নিকট সহজে আশা করা যায় না; কিন্তু, তথাপি, রাজসভার কবিই তা ব্যবহার করেছেন, এবং প্রসঙ্গত তাঁর সজীব ও ব্যাপক কবিদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের ছাপ পড়েছে যে সব পদে, সেখানে প্রায়ই রচনা হৃদয়হীন হয়ে পড়েছে; কিন্তু পাণ্ডিত্যের স্পর্শ-বিমুক্ত হয়ে কবি যখন বহমান জীবন থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, তখনই যেন পদের অন্তর্নিহিত সত্তা-রূপান্তরিত হয়ে গেছে। যুগভাবধারাটাই ছিল এমনি; সংস্কৃতের এবং সংস্কৃত-আশ্রয়ী পণ্ডিত সমাজের বিধি নিষেধ লঙ্ঘন করে লৌকিক ভাষা ও ধারণাকল্পনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে রসের ক্ষেত্রে এবং ভাবজীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছিল। তাই বিদ্যাপতি সংস্কৃতে পণ্ডিত হলেও তাঁর কোন সংস্কৃত গ্রন্থ তাঁকে অমর করেনি।

বড়ু চণ্ডীদাসের রাধার ন্যায় বিদ্যাপতির রাধা কুলচেতনায় কাতর নয়। চণ্ডীদাসের বাংলা সমাজ এবং বিদ্যাপতির মৈথিল সমাজ (বিশেষত রাজ-প্রাসাদের আবহাওয়া) ভিন্ন ছিল বলেই সম্ভবত এই প্রভেদ। কিন্তু বিদ্যা-

পতির রাধার কুলভয় যে একেবারেই নেই, তা নয়। 'অভিসারে'র একটি পদে আছে,

অগমনে প্রেম গতানে কুল জাএত
চিন্তা পঙ্ক লাগলি করিনী
মঞে অবলা দস দিস ভমি ঝাখওঁ
জানি ব্যাধ ভয়ে ভীরু হরিণী॥
ইত্যাদি (২৭৯ নং পদ)

[না গেলে প্রেম যায়, গেলে কুল যায় ; হস্তিণী চিন্তা-পঙ্কে নিমজ্জিত হলো। আমি অবলা, ব্যাধের ভয়ে ভীরু হরিণীর মত দশদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি।]

অভিসারের আরও একটি চিত্র এইরূপ,

বিহি মোর বড় মন্দা উগি জনু জাএ চন্দা
সুতি উঠি গগন নিহার॥
পথহু পথিক সঙ্কা পয় পয় ধএ পঙ্কা
কি করতি ও নব তরুণী।
চলএ চাহ ধসি পুনু পড় খসি খসি
জালক ছেকলি হরিণী॥
... .
বিদ্যাপতি ভন কি করত গুরুজন
নীদঁ নিরূপন লাগী।
নয়ন নীর ভরি ধীর ঝপাবএ
রয়নি গমাবএ জাগী॥ (২৮০ নং পদ)

[বিধাতা আমার বড়ই বাম, পাছে চাঁদ উদয় হয়, তাই শুতে যেয়েও ওঠে বার বার আকাশের দিকে তাকায়। পথে পথিকেরও শঙ্কা (অর্থাৎ পথে কারও সংগে দেখা হয়ে যেতে পারে), পদে পদে পাঁক ধরে (বিপদাশঙ্কা) ; নবযুবতী কি করবে? দ্রুত চলতে চায়, (কিন্তু) পুনরায় খসে খসে পড়ে, যেন জালে বাঁধা হরিণী।...বিদ্যাপতি বলছে, কি করবে, গুরুজন নিদ্রিত কিনা তা নিরূপণ করার জন্য অশ্রুঝরা মুখ কাপড়ে ঢেকে জেগে রাত্রি কাটায়।]

এইসব এবং অনুরূপ চিত্র থেকে মনে হয় যে, মিথিলার আকাশেও হৃদয়ের সহজ-স্বাভাবিক অভিব্যক্তির পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল সমাজ-ধর্ম, কুলধর্ম। সেখানেও প্রেমাস্পদের সংগে মিলিত হওয়ার বিঘ্ন অনেক, প্রতিবন্ধক অনেক। কিন্তু বিঘ্ন অনেক হ'লেও প্রেমের ধর্মই এই যে, এ সীমার বন্ধন, সমাজ ধর্মের শাসন মানে না। বন্ধন এবং শাসন অতিক্রম করেই লাভ হয় তার পূর্ণতা। বিদ্যাপতির রাধাও এই পূর্ণতার প্রত্যাশী; সুতরাং প্রেমের প্রতিকূল যে সমাজ-ধর্ম বা সামাজিক আচার, রাধা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে জানে, তার রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করতে জানে, এবং তার সীমা লঙ্ঘন করে প্রেমাস্পদের স্পর্শে নিজের জীবনকে সৃষ্টি করতে জানে। দূতী রাধাকে বলছে,

ধনি ধনি চলু অভিসার।
শুভ দিন আজু রাজপন মনমথ
পাওব কি রীতি বিথার॥
গুরুজন নয়ন অন্ধ করি আওল
বাঁধব তিমির বিসেখ।
তুঅ উর ফুরত বাম কুচ লোচন
বহু মঙ্গল করি লেখ॥
কুলবতি ধরম করম ভয় অব সব
গুরু মন্দির চলু রাখি।
প্রিয়তম সঙ্গ রঙ্গ করু চিরদিন
ফলত মনোরথ সাখি॥

ইত্যাদি (২৩৮ নং পদ)

[ধনি, অভিসারে চল; মন্মথের রাজত্বে আজ শুভদিন রীতি বিস্তার করে পাবে। গুরুজনের চোখ অন্ধ করে বন্ধু বিশেষ আঁধারে এলো; তোর বাম উরু, কুচ, চোখ স্পন্দিত হচ্ছে, অত্যন্ত শুভ চিহ্ন বলে জানবি। কুলবতী সমস্ত ধর্ম কর্ম ভয় গুরু-মন্দিরে (গুরুজনের মন্দিরে) রেখে চল; চিরকাল প্রিয়তমের সংগে রঙ্গ কর; (তোমার) মনস্কামনা-বৃক্ষ সফল হোক।]

সুতরাং রাধা ধর্ম কর্ম ভয় পরিত্যাগ করে প্রিয়তমের সংগে মিলিত হতে চলেছে। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, বিদ্যাপতি রাধাকে বাস্তব সমাজে বিচরণ-

শীল মানবী রূপেই চিত্রিত করেছেন ; হৃদয়-ধর্মের সঙ্গে সমাজধর্মের যখন বিরোধ দেখা দিয়েছে, তখন তিনি হৃদয়ের ধর্মকে অস্বীকার করে সমাজ-ধর্মের নিকট নতি স্বীকার করছেন না। বরং সমাজ-ধর্মকেই অস্বীকার করে, এবং তার বিধিবন্ধনকে লঙ্ঘন ও অতিক্রম করে তিনি হৃদয়-ধর্মের প্রয়োজনে সমাজকেই নতুনভাবে সৃষ্টি করার কর্মে অগ্রসর হয়ে গিয়েছেন। জীবন, বাঁচার ধর্ম যেন, সগৌরবে নিজেকে ঘোষণা করছে। সমাজ-ধর্মের বিরুদ্ধে কবির এই ভাব-বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া না হয়ে পারেনা। বিশেষ করে রাধা যেখানে মানবী, সেখানে বাস্তব সমাজের অন্তর্ভুক্ত যে কোন মানবীই রাধা-অনুসৃত আচরণ অনুকরণ করতে পারে। আর রাধার স্থলে যে কোন মানবীকে বসালে সমস্যাটা একটা বাস্তব ও সত্য রূপ পরিগ্রহ করে, এবং তার সমাধানটাও নিশ্চিত সত্য ভবিষ্যতের ইংগিত দেয়। কবি সচেতনভাবেই এ কয়েকটি লাইন লিখে থাকুন, অথবা কোন উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত না হয়েই লিখে থাকুন, কবি নিজের অজ্ঞাতে যে সমাজের প্রচলিত বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছিলেন, তা নিঃসন্দেহ। আর এই বিদ্রোহের ভিতর দিয়ে তাঁর মানবতাই নতুনভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছে।

কিন্তু এই অভিসার, এই বিদ্রোহ কেন? সমাজ-ধর্মকে ফাঁকি দিয়ে এই অভিসারে যাত্রা করা কেন? না, সৃষ্টির আশায় দেহে যে আনন্দ মূর্ত হয়ে উঠেছে, প্রেমাস্পদের স্পর্শে সেই আনন্দকে তার সার্থক পরিণতিতে নিয়ে যেতে হ'বে। জীবন নতুন জীবনকে, আনন্দ নতুন আনন্দকে, সৃষ্টি করে যাবে, তবেই তো তার সার্থকতা। সৃষ্টির প্রেরণায়ই জীবন মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কিন্তু সৃষ্টির এই আকুতির সম্মাননা তো সমাজ-ধর্মের কাছে নেই ; বিমল মুক্ত সৃষ্টির স্বীকৃতি তো এখানে নেই। তাই সমাজের সহিত সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে ; মনের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয় না, জীবনকে বিকশিত করার অবকাশ মেলে না, প্রেমাস্পদের সংগে স্বচ্ছন্দে বিহার করা যায় না, এবং সৃষ্টির করুণ আকুতি কেঁদে কেঁদে আপনাকে নিঃশেষ করে দেয় ; না-পাওয়ার বেদনায় জীবন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। না-পাওয়ার দুঃখ কি, তা আমরা বড়ু চণ্ডীদাসের আলোচনায় দেখেছি ; সেই অপরিসীম দুঃখবেদনাই অপরূপ মাধুর্যে বিদ্যাপতিতেও অভিব্যক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের একটি গানে আছে 'ভালবেসে দুখ সেও সুখ, সুখ নাই আপনাতে ; মন দাও দাও, সখি,

দাও পরের হাতে।' সৃষ্টির সম্ভাবনাহীন জীবনেও সুখ নেই, পরিতৃপ্তি নেই, সন্তোষ নেই, বাইরের চাকচিক্য তাতে যতই না থাক, পূর্ণতার আশা যে জীবনে নেই, সে জীবন তাই অর্থহীন। রাধার স্বীয় ঐশ্বর্য যতই না কেন থাক, তাঁর নিঃসঙ্গ একলা জীবনে কোন পূর্ণতা নেই, মাধুর্য নেই; কেননা, কৃষ্ণের স্পর্শেই তাঁর সৃষ্টির আকূতি সার্থকতা লাভ করতে পারে। তাই এই পূর্ণতার আধার কৃষ্ণ যখন দূরে চলে গিয়েছে, অথবা তাঁর সংগে মিলনে যখন প্রবল অন্তরায়, তখন মনে হয়,

নয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ হম পাস॥ (৬৬৯ নং পদ)

[(যেদিন কৃষ্ণ চলে গিয়েছে, সেদিন থেকে আমার) চোখের ঘুম মুখের হাসি এবং সুখ প্রিয়তমের সংগে চলে গিয়েছে, এবং (সমস্ত) দুঃখ আমার কাছে (পড়ে রয়েছে)।]

আরও মনে হচ্ছে যে সবই শূন্য;

সূন ভেল মন্দির সূন ভেল নগরী।
সূন ভেল দস দিস সূন ভেল গগরী॥ (৬৩১ নং পদ)

এই বিরাট শূন্যতার অশেষ দুঃখ ও বেদনা নিয়ে "একলি মন্দিরে হাম পিয়া মধুপুর" (শ্রীশ্রীপদকল্পতরুর ১৭৬২ নং পদ)। এই যে শূন্য মন্দিরে একলা বসে থাকা, তাতে পরিতৃপ্তি নেই, আনন্দ নেই। মনে কামনার দীপ নিরন্তর জ্বলছে, হওয়ার আশায় মন উদ্বেলিত হয়ে উঠছে; কিন্তু হওয়ার পথে, সৃষ্টির পথেই প্রবল বিঘ্ন। আর এই বিঘ্নকে সহজে অতিক্রম করা যায় না বলেই তো দুঃখ। এই দুঃখ থেকেই জীবনের আনন্দ বিলুপ্ত হয়, বাঁচার স্বাদ থাকে না, বিষয়ে অনাসক্তি আসে, এবং জীবন বিসর্জনের বৈরাগ্য দেখা দেয়। কিন্তু এই দুঃখই কি শেষ কথা? এই নিরানন্দই কি জীবনের একমাত্র অবলম্বন? এই মৃত্যুই কি উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট? কবি বলছেন, না, কোনটাই জীবনের শেষ কথা নয়। দুঃখ আছে সত্য, নিরানন্দ আছে সত্য, হতাশাও আছে, কিন্তু অসংখ্য পদের ভনিতায় কবি স্থিরবিশ্বাসে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, এসব দুদিনের, প্রিয়-বিচ্ছেদ অল্প কিছুদিনের। এই মেঘ কাটবেই কাটবে, আর মেঘের আড়ালেই তো সূর্য লুকিয়ে থাকে! তাই বিদ্যাপতির রাধা, এবং কবি স্বয়ং সীমাহীন দুঃখ-বিরহের মধ্যেও সৃষ্টির প্রতি,

মিলনের পূর্ণতার প্রতি, বিশ্বাস হারাননি। এই বিশ্বাস হারালে জীবনের প্রতিই বিশ্বাস হারাতে হয়। সুতরাং যদিও "নখর খোয়াওলুঁ দিবস লিখি লিখি। "নয়ন অন্ধাওলুঁ পিয়াপথ পেখি" তথাপি ধৈর্য ধরতে হবে, অটল বিশ্বাসে সৃষ্টির শুভলগ্নের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। একটি চমৎকার পদে কবি বলছেন,

এখন-তখন করি দিবস গমাওল
দিবস-দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরস গমাওল
ছোড়লুঁ জীবন আসা ॥
বরস বরস করি সময় গমাওল
খোয়ালুঁ কানুক আসে।
হিমকর-কিরন নলিনি যদি জারব
কি করক মাধব-মাসে ॥
অঙ্কুর তপন-তাপ জদি জারব
কি করক বারিদ মেহে।
ইহ নবজৌবন বিরহ গমাওল
কি করব সে পিয়া নেহে ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জৌবতি
অব নহি হোই নিরাসে।
সে ব্রজনন্দন হৃদয়-অনন্দন
ঝটিত মিলব তুঅ পাসে ॥ (৭২৯ নং পদ)

[(সে আসবে আশায়) এখন তখন করে দিন কাটালাম; দিন দিন করে মাস গেল, মাস মাস করে বছর পার হয়ে গেল, জীবনের আশা ত্যাগ করেছি। বছর বছর করে সময় কেটে গেল, কৃষ্ণের আশা পরিত্যাগ করেছি। চন্দ্র কিরণ যদি পদ্মকে জ্বালিয়ে দেয়, তাহলে বৈশাখ মাস এসে কি করবে? রোদের তাপে যদি অঙ্কুর পুড়ে যায়, তো জলবর্ষী মেঘ এসে কি করবে? এই নব যৌবন বিরহে কাটালাম, (এর পর) প্রিয়তমের ভালবাসায় কি হবে? বিদ্যাপতি বলছে, সুন্দরী যুবতী শোন, নিরাশ হয়ো না; সেই হৃদয় আনন্দ-কারী ব্রজনন্দন শীঘ্রই তোমার নিকট আসবে।]

এই প্রতীক্ষা নিষ্ফল অথবা নিরর্থক নয়। কারণ, এই সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা, প্রচেষ্টার পরেই পূর্ণতার সাক্ষাৎ মেলে। বহু ত্যাগ, বহু দুঃখ এবং বহু বাধা-বিপত্তি উত্তীর্ণ হয়েই প্রেমাস্পদের সংগে মিলিত হওয়া যায়; জীবনে কল্যাণ-স্বরূপের সাক্ষাৎ লাভ হয়, এবং সৃষ্টির নতুন অঙ্কুর বিকশিত হয়। সুতরাং সৃষ্টি-ধর্মের প্রতি অবিচল বিশ্বাস রেখে স্থির নিশ্চিতভাবে সম্মুখের পানে অগ্রসর হবে। আর অগ্রসর হতে হতে যখন হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার বস্তু হাতে ধরা দেবে, তখন নিমেষে বহু বছরের সহস্র দুঃখ গ্লানি ব্যর্থতা উত্তীর্ণ হওয়া যাবে। প্রথম জীবনের না-পাওয়ার অশ্রু পাওয়ার অক্ষয় হাসিতে উজ্জল হয়ে ফুটে উঠবে। এই পূর্ণতার স্তরে উপনীত হয়ে কবি বলছেন

দারুন বসন্ত জত দুখ দেল।
হরিমুখ হেরইতে সব দূর গেল॥
জতহুঁ আছিল মোর হৃদয়ক সাধ।
সে সব পূরল হরি পরসাদ॥
কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥ ইত্যাদি (৮১১ নং পদ)

[দারুণ বসন্ত যত দুঃখ দিয়েছে, হরিমুখ দর্শনে তা সমস্তই অপনীত হয়েছে। আমার হৃদয়ের যত সাধ ছিল, হরির প্রসাদে সমস্ত পরিপূর্ণ হয়েছে। হে সখি, আজকের আনন্দের সীমার কথা কি বলব (অর্থাৎ, আজকের আনন্দের সীমা নেই), দীর্ঘকাল পরে মাধব আমার গৃহে এসেছেন।]

প্রেমাস্পদের সংগে মিলনে জীবন সার্থক হয়েছে; সৃষ্টির আনন্দ এবার সহস্র পল্লবে নিজেকে প্রকাশ করবে। এই পূর্ণতার আলোক নানাভাবেই তার প্রভাব বিস্তার করবে। রাধার জীবনের সত্তা রূপান্তরিত হয়ে যাবে, নতুন চোখে, নতুন আলোকে সে নিজের দিকে তাকাবে, এবং পরিদৃশ্যমান পৃথিবীকেও সে নতুনভাবেই জানবে; চারিদিকের প্রবহমান জীবনের সংগে নতুন সম্পর্কে নতুন বন্ধনে সে আবদ্ধ হবে। হৃদয়ের অভিলাষ চরিতার্থ হওয়ার পর সে যা ছিল, তা থাকা আর তাঁর পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়; সে নতুন, সে রূপান্তরিত। আর এই রূপান্তরিত নতুন সত্তাই তার চারিদিকের সমাজ জীবনকে ও বিশ্বজগৎকে নতুনভাবে সৃষ্টি করতে অগ্রসর হয়।

দৃষ্টির এই রূপান্তর, এবং দৃষ্টির এই অভিনবত্ব সত্য সত্যই বিদ্যাপতিতে বর্তমান। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, কবি খণ্ড খণ্ড গীতি কবিতা রচনা করেছেন; একই ভাবের বিভিন্ন কবিতা বিভিন্ন সময়ে লেখা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। তাই এই রূপান্তরিত দৃষ্টি অথবা জীবনের প্রতি নতুনভাবে তাকানোর চেতনা এই জীবনের কোন পর্যায়ে তিনি আয়ত্ত করেন, তা নির্ণয় করা সুকঠিন। কিন্তু একটা নতুন সুর, একটা নতুন দৃষ্টি এবং চেতনা যে এখানে অভিব্যক্তি লাভ করেছে, তাও অস্বীকার করার উপায় নেই। আর তা থেকে এটাও প্রমাণিত হবে যে, কবি একান্তভাবেই তাঁর কালবিধৃত সৃষ্টি-ধর্মী জীবন যাপন করেছেন; এবং তাঁর কালকেই নতুনভাবে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।

তিন

কবির এই নতুন সুর ও দৃষ্টির আলোচনার পূর্বে একটা অসঙ্গতির কারণ নির্দেশের চেষ্টা করা যেতে পারে। বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক কবিতা ছাড়াও 'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিনী,' 'শৈব সর্বস্বহার' এবং অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত সংস্করণের মুখবন্ধে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখেছেন, "সাধারণতঃ বিদ্যাপতিকে আমরা বৈষ্ণব বলিয়া জানি। কিন্তু মিথিলায় তিনি শৈব কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমরা বিদ্যাপতির বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে পরিচিত; কিন্তু মিথিলায় তাঁহার রচিত হর-গৌরী পদাবলী সর্ব্বত্র আদৃত। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদের নামাবলীতেও শিবভক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার পিতার নাম গণপতি, পূর্ব্বপুরুষদের নাম—চণ্ডেশ্বর, বীরেশ্বর, ধীরেশ্বর প্রভৃতি। বিদ্যাপতির প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের কথাও শোনা যায়। তাঁহাদের কুলদেবতা বীরেশ্বরী ছিলেন। যেখানে তাঁহার দেহান্ত হয়, সেইখানে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।" এবং "বিদ্যাপতির যে কয়খানি গ্রন্থ আছে সেগুলির মঙ্গলাচরণে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উল্লেখ আছে 'পুরুষ-পরীক্ষা'য় আদ্যাশক্তির, 'লিখনাবলী'তে গণেশের, 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী'তে দুর্গার, 'দান বাক্যাবলী'তে বিষ্ণুর, 'শিবসর্ব্বস্বহারে' শিবের বন্দনা আছে।" (১১)

১১ সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, বিদ্যাপতি; মুখবন্ধ পৃ ১৯—১।০

মিথিলায় প্রচলিত লোকবিশ্বাস এবং কবির পূর্বপুরুষদের নামের উপরই নির্ভর করলে তাঁকে শৈব বলেই গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়, তিনি যদি নিষ্ঠাবান শৈব হবেন, তাহলে বিভিন্ন দেবতার বন্দনা গানই বা তিনি করবেন কেন, আর বৈষ্ণব গীতি কবিতাই বা রচনা করবেন কেন?

আর এই প্রশ্ন শুধু বিদ্যাপতি সম্পর্কেই নয়, বড়ু চণ্ডীদাস সম্পর্কেও। চণ্ডীদাস বাসুলী (চণ্ডী) দেবীর চরণ বন্দনা করে রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন; এবং কোন কোন সমালোচকের ধারণা যে, বাসুলী দেবীর আদেশেই নাকি কবি বৈষ্ণবধর্মে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু সরল ধারণায় সমস্যার সমাধান হয় না, প্রশ্ন প্রশ্নই থেকে যায়। সুতরাং এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কবির কাব্যের পটভূমি এবং যুগ ধর্মের উপরই দৃষ্টি নি-- করা সঙ্গত।

বড়ু চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির যুগ এক কাল থেকে কালান্তরে প্রবেশের যুগসন্ধিক্ষণ, রাষ্ট্রীয় আলোড়ন সবে স্তিমিত হয়ে এসেছে, এবং বাংলা ও বৃহৎ বাংলায় শিল্পোপযোগী শান্ত পরিবেশ সবে সৃষ্টি হতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবনেই হোক, অথবা ভাবজগতে হোক, মুসলিম সংস্কার-সংস্কৃতির সংঘাত তখনও শেষ হয়নি। এই সংঘাতের মধ্য দিয়ে একটা নতুন সংশ্লেষ লোক মানসে উকিঝুঁকি মারছিল মাত্র। বিদ্যাপতি নিজেও এই বিরোধের চিত্র এঁকেছেন তাঁর 'কীর্ত্তিলতা'য়। যথা,

> হিন্দু তুরকে মিলল বাস,
> একক ধম্মে অওকো উপহাস।
> কতহুঁ বাঙ্গ কতহুঁ বেদ,
> কতহুঁ মিলিমিস কতহুঁ ছেদ।
> কতহুঁ ওঝা কতহুঁ খোজা
> কতহুঁ নকত কতহুঁ রোজা।
> কতহুঁ তম্বারু কতহুঁ কুজা,
> কতহুঁ নীমাজ কতহুঁ পূজা। ইত্যাদি (১২)

---

১২ সুকুমার সেনের মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙ্গালী গ্রন্থে উদ্ধৃত। পৃ. ৬

[হিন্দু ও তুরুকের বাস কাছাকাছি। কিন্তু একের ধর্মে অন্যের উপহাস। একের বাঙ্ (আজান), অপরের বেদ। কারো সমাজে মেলামেশা, কারো সমাজে ভেদ। একের পণ্ডিত ওঝা, অপরের পণ্ডিত খোজা। একের নক্ত অপরের রোজা। একের তাম্রকুণ্ড, অপরের কুঁজা। একের নামাজ, অপরের পূজা। ইত্যাদি]

পারস্পরিক ব্যবহারের এই বৈচিত্র্য ও ভেদ কবিকে এবং তাঁরই মত সংবেদশীল ও কল্যাণকামী ব্যক্তিদের ক্ষুণ্ণ করে থাকবে, এবং এই বৈচিত্র্য ও ভেদের মধ্যেও একটা ঐক্যের সন্ধান করার প্রেরণা যুগিয়ে থাকবে। এই সময়েই বাংলায় মুসলমান রাজাদের উৎসাহে, নির্দেশে এবং আনুকূল্যে রামায়ণ, মহাভারত এবং কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গ্রন্থাদি রচনা ও অনুবাদ হতে থাকে ; এবং লৌকিক জীবনেও বিভিন্ন গ্রামীন সম্পর্ক স্থাপন করে সাম্প্রদায়িক ঐক্য এবং পারস্পরিক হৃদ্যতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা হয়। সুতরাং একটা সাংস্কৃতিক সংশ্লেষের চেতনা ও প্রয়োজনীয়তা সে যুগের ভাবধারায় বর্তমান ছিল, একথা অসঙ্গত বা অযৌক্তিক নয়। এই সংশ্লেষকামী ভাবধারায় অবগাহন করে তাদের পক্ষে কোন একটা ধর্ম-সম্প্রদায়ে নিষ্ঠার সংগে আশ্রয় গ্রহণ করা সম্ভবত কঠিন ছিল। অন্তত তাঁদের আচরণ থেকে এটাই প্রতিভাত হয় যে শৈব হয়ে অন্যান্য দেবতার বন্দনা গান ও বৈষ্ণব গীতিকবিতা রচনা বিদ্যাপতির নিকট এবং বাশুলী উপাসক হয়ে রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করা চণ্ডীদাসের নিকট অসঙ্গত অথবা পরস্পরবিরোধী বলে মনে হয়নি। সম্ভবত প্রত্যেক ধর্ম-সম্প্রদায়েরই শক্তি নিদারুণ ভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল ; তাই মানুষের মনের উপর তার অধিকারও অত্যন্ত শিথিল হয়ে গিয়েছিল। এই শিথিল বন্ধন ছিন্ন করেই সম্ভবত সে যুগের মানুষ অজান্তে এক নতুন সংশ্লেষে উপনীত হওয়ার জন্য অজ্ঞাতে যাত্রা করেছিল। বিদ্যাপতির একটি বন্দনা গীতিতে আছে,

ভল হর ভল হরি ভল তুঅ কলা।
খন পিত বসন খনহি বঘছলা॥
খন পঞ্চানন খন ভুজচারি।
খন সঙ্কর খন দেব মুরারি॥

খন গোকুল ভএ চরাইঅ গায়।
খন ভিখি মাঁগিএ ডমর বজায়॥
খন গোবিন্দ ভএ লিঅ মহাদান।
খনহি ভসম ভরু কাঁখ বোকান॥
এক শরীর লেল দুই বাস।
খন বৈকুণ্ঠ খনহি কৈলাস॥
ভনই বিদ্যাপতি বিপরিত বানি।
ও নারায়ন ও সুলপানি॥ (৯১৫ নং পদ)

[হর ভাল, হরি ভাল, ভাল তোমার লীলা। ক্ষণে পীত বসন, ক্ষণে বাঘছাল। ক্ষণে গোকুলে গোরু চরিয়ে বেড়াও, ক্ষণে ডমরু বাজিয়ে ভিক্ষে মাগ। ক্ষণে গোবিন্দ হয়ে (বৃন্দাবনে) মহাদান গ্রহণ কর, ক্ষণে (গায়ে) ভস্ম মেখে কাঁধে ঝোলা ঝোলাও। একই দেহ, দুই আবাস নিয়েছে; ক্ষণে বৈকুণ্ঠ, ক্ষণে কৈলাস। বিদ্যাপতি বিপরীত কথা বলছে, যে নারায়ণ, সে-ই শূলপানি।]

কবি হর-হরির মধ্যে কোন প্রভেদ বা পার্থক্য দেখছেন না; দুই-ই তাঁর কাছে এক। আর এই পদে বিশেষ করে কবি-ব্যবহৃত বিপরিত শব্দটি লক্ষ্য করার মত। হর এবং হরিকে এক করে দেখা সম্ভবত প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী ছিল; তথাপি কবি এই দুই দেবতাকে এক বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর ঘোষণা প্রচলিত ধারণার অনুগামী নয় বলেই তা বিপরীত অদ্ভুত। কিন্তু তাঁর এই ঘোষণার মধ্যে বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের অথবা ধর্মগত দিক থেকে নতুন সংশ্লেষে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা বর্তমান নেই কি? পরস্পর বিরোধী এবং বিবদমান ধর্মমত, সংস্কার-সংস্কৃতি এবং সামাজিক আচরণের মধ্যে একটা ঐক্যসূত্র প্রতিষ্ঠা করা সে যুগের ভাবাকাশের অন্যতম দাবী ছিল। বিদ্যাপতি সে দাবীই পূরণ করেছেন সম্ভবত। আর এই সংশ্লেষে বা সমন্বয়ের কার্যে তিনি ইসলামের একেশ্বরবাদের আদর্শে কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাও বিচার্য। কবি স্বীয় চিন্তাবলেই এই আদর্শে উপনীত হয়ে থাকুন, অথবা অন্যের দ্বারা প্রভাবিতই হয়ে থাকুন, এর ফলে যে কবি নতুন দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে জীবনের দিকে তাকিয়েছিলেন, তা নিঃসন্দেহ। এই দৃষ্টিতে বিরোধ-মীমাংসার, সমন্বয়ের এবং প্রীতিবন্ধনের স্বীকৃতি ছিল। আর প্রীতিবন্ধনের

মূলে আছে হৃদয়ের মধুরতা; হৃদয়ের এই অন্তর্নিহীত মধুরতার আলোকেই কবি পৃথিবীর দিকে, মানব সমাজের দিকে, দৃষ্টিপাত করেছিলেন।

বিদ্যাপতির ভাষাসম্পদের আলোচনা করলেও এই সিদ্ধান্তে পৌছাতে হয়। বিদ্যাপতি নিছক কবিতা রচনা করেন নি, গীত রচনা করেছেন। গানের ভাষার বৈশিষ্ট্যই এই যে, গানের ভাষা হবে সরল, উদার এবং মধুর। কবি তাঁর ভাষা সৃষ্টিতে এই মাধুর্যের সন্ধান করেছিলেন। তিনি 'কীর্ত্তিলতা'য় বলেছেন, "দেসিলবঅনা সবজন মিঠ্ঠা। তেঁ তৈসন জম্পওঁ অবহট্ঠা।" মনীন্দ্রমোহন বসুর অভিমত এই যে, কবির এই উক্তিই কবি-কর্তৃক কৃত্রিম ভাষা ব্যবহারের ইংগিত দেয়। (১৩) তাঁর অভিমত প্রণিধানযোগ্য। বিদ্যাপতি ব্রজবুলির স্রষ্টিকর্তা কি না এ সম্পর্কে মতবিরোধ থাকতে পারে, এবং যথেষ্ট রয়েছেও, কিন্তু তিনি যে তার পথপ্রদর্শক এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ব্রজবুলি ভাষার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হ'লো এর মাধুর্য। বসু মহাশয় লিখেছেন, "মধুরতার জন্য এই কৃত্রিম ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। ব্রজবুলিতে যুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম, এবং বিভক্তিগুলিও প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মধ্য দিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। ব্যঞ্জনবর্ণের লোপে অধিকাংশ স্থলেই স্বরবর্ণ ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়। এইভাবে ভাষার কোমলতা সাধন করা হইয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলী ভাবমুখর রচনা, এবং ইহা গান করা হইত। বিদ্যাপতি অনেক পদের প্রথম পঙক্তিতেই "প্রথম" "প্রথমহি" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, আবার তিনিই যে ইহার পরিবর্তে "পহিলহি" লিখিয়াছেন তাহা মাধুরতা সম্পাদনের জন্য নহে কি?" (১৪) বৈষ্ণব গীতিকবিতা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী, এখানে হৃদয় যেন হৃদয়ের সংগে কথা বলছে। এই কবিতায় এমন একটা আকৃতি আছে, এমন একটা প্রীতিরস আছে, এমন একটা আন্তরিকতা আছে, যা মনে দাগ না কেটে পারে না। বিদ্যাপতির পদাবলীরও এই বৈশিষ্ট্য। পদাবলীর মর্মস্পর্শিতার অন্যতম কারণ এর মাধুর্য। আর সম্ভবত হৃদয়ের প্রীতি দিয়ে মানুষের মনকে জয় করতে হবে, পরকে আপন করতে হবে বলেই এই মধুর ভাষা সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা যুগ-মানসে প্রতিভাত হয়েছিল। এর সুস্পষ্ট তাৎপর্য এই যে, এ হলো জীবনের দিকে তাকানোর এক বিশেষ ভংগী, বিশেষ

১৩ বাঙ্গালা সাহিত্য, প্রথম খণ্ড; পৃঃ ১৫৫
১৪ ঐ; পৃঃ ১৫৬

পরিপ্রেক্ষিত। আর এর মূলে আছে, সমাজকে, জীবনকে এর উপকরণ দিয়ে নতুন করে ঢেলে সাজানোর প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষা। ধর্মের ক্ষেত্রে এ বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করেছে, এবং সমাজ-জীবনের ক্ষেত্রে এ সমস্ত ভেদ বৈষম্যকে হৃদয়ের মাধুর্য দিয়ে ভরে দিতে চেয়েছে। বিশৃঙ্খল সামাজিক পরিবেশে বিভিন্ন বিশৃঙ্খল সমস্যার সমাধান এভাবেই করতে চেয়েছে। বিদ্যাপতির মানস পরিমণ্ডল এই মাধুর্যের রসে কতখানি আপ্লুত ছিল, তা এই পদটি থেকে বোঝা যাবে ;

মধুঋতু মধুকর পাঁতি।
মধুর কুসুম মধুমাতি॥
মধুর বৃন্দাবন মাঝ।
মধুর মধুর রসরাজ॥
মধুর জুবতিজন সঙ্গ।
মধুর মধুর রসরঙ্গ॥
মধুর মৃদঙ্গ রসাল।
মধুর মধুর করতাল॥
মধুর নটন-গতি ভঙ্গ।
মধুর নটিনী নটসঙ্গ॥
মধুর মধুর রসগান।
মধুর বিদ্যাপতি ভান॥ (৬১২ নং পদ)

মধুর রসে কবির দৃষ্টি তন্ময় হয়েছে। এই ভাবকে শুধুমাত্র ক্ষণস্থায়ী ভাবাবেগ বলে গ্রহণ করা যায় না। ওর পশ্চাতে এমন একটা অটল স্থৈর্য ও দৃঢ় প্রত্যয় বর্তমান, যা মনের ও জীবনের গতি বদলিয়ে দিয়েছে। অন্যান্য স্থানেও এই দৃঢ় প্রত্যয়ের সন্ধান পাওয়া যায় ; যথা, "রস সিংগার স‍ঁসারক সারে" (শৃঙ্গার-রস সংসারের সার), "বিঘিনি বিথারল বাট। পেমক আয়ুধে কাট" (বিঘ্ন প্রসারিত পথ, প্রেমের অস্ত্রে কাটল), ইত্যাদি। বিদ্যাপতির রাধাই যে কেবল প্রেমের অস্ত্রে সমস্ত বিঘ্ন উত্তীর্ণ হয়েছে, তা নয় ; সমাজের অন্তর্গত যে কোন মানুষই প্রেমের অস্ত্রে, মাধুর্যের রসে সমস্ত বন্ধন, সমস্ত বিঘ্ন, সমস্ত বৈষম্য অতিক্রম ও বিলুপ্ত করতে পারে। আর এই অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, এই শক্তিতে বলীয়ান হয়ে, জীবনের পথে অগ্রসর হ'তে হ'তে, সমস্ত বিঘ্ন

অতিক্রম করতে করতে পরিশেষে কোথায় গিয়ে উপনীত হওয়া যায়, জগৎ কোন্ আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তার স্বাক্ষরও বিদ্যাপতির কাব্যে রয়েছে। এই পদটি তার পরিচায়ক ;

দুহু মুখ হেরইত দুহু ভেল ধন্দ।
রাহী কহ তমাল মাধব কহ চন্দ॥
চিত পুতলী জনু রহু দুহু দেহ।
ন জানিঅ প্রেম কেহন অছু নেহ॥
এ সখি দেখ দে৲ দুহুক বিচার।
ঠামহি কোই লখই নহি পার॥
ধনি কহ কাননময় দেখিঅ শ্যাম।
সে কিএ গুনব মঝু পরিনাম॥
চউকি চউকি দেখি নাগর কান।
প্রতি তরুতর দেখ রাহী সমান॥ ইত্যাদি (৫৫৭ নং পদ)

[দুজন দুজনের মুখ দেখে সংশয়ে পড়লেন। রাধা বলেন, এ তমাল ; কৃষ্ণ বলেন, এ চাঁদ্। চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দুজনই রইলেন। জানি না কেমন (এঁদের) প্রেম, কেমন (এঁদের) স্নেহ। (এক সখি অপর সখিকে সম্বোধন করে বলছে) সখি, দেখ দেখ দুজনের কি ব্যাপার ; নিকটেই আছে, অথচ কেউ কাউকে দেখছে না। রাধা বলেন, আমি সমস্ত কাননময় শ্যাম দেখছি ; আমার অবস্থা সে কি ভাববে ? (আমি যার অনুরাগে আত্মহারা হয়ে ছুটে এলাম, সে প্রেমাস্পদ কোথায় ? এ যে বহু শ্যাম !) কৃষ্ণ চমকিত হয়ে দেখছেন, প্রতি তরুতলে রাধা দাঁড়িয়ে আছেন (যার জন্যে প্রতীক্ষা করছি, আমার সে প্রিয়তমা কোনটি ?)]

এই যে দৃষ্টি, ইহাই প্রেমের দৃষ্টি, হৃদয়ের প্রীতিরসের দৃষ্টি। এই দৃষ্টিতে বিষয়ে বিষয়ে পার্থক্য, বস্তুতে বস্তুতে বৈষম্য দূর হয়ে যায়, সমগ্র বিশ্বজগৎ আপনার প্রেমাস্পদের মত বলে মনে হয়। রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা এবং বিভিন্ন সংস্কার-সংস্কৃতির সংঘাতের যুগে দিক্‌ভ্রষ্ট মানুষের নিকট এই প্রেমের আদর্শই বিদ্যাপতি তুলে ধরেছিলেন রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার অন্তরালে।

হৃদয়ের মাধুর্য দিয়ে সামাজিক ব্যবধান ও প্রচলিত সামাজিক-সম্পর্কের ফাঁককে ভরে দেবার কথাই সম্ভবত তিনি ঘোষণা করতে চেয়েছেন। সেই যুগে এই প্রেমাদর্শ যে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল তার ইংগিতও বোধ হয় এইখানে যে, এই আদর্শকে আশ্রয় করেই সেকালের মানুষ নতুন সমাজ-সংশ্লেষে উপনীত হ'তে চেয়েছিল, যেখানে বৈষম্যের পরিবর্তে থাকবে প্রীতির বন্ধন, শোষণের পরিবর্তে সাম্য। আর এমনিভাবেই তারা এক বিরাট পুরুষের আবির্ভাবের আগমনী গান গেয়েছিলেন, যিনি যুগোপযোগী সমন্বয়ের পথ প্রদর্শন করেছিলেন।

রূপান্তরের দ্বিতীয় পর্যায় : চৈতন্যদেব ও চৈতন্য মতবাদ—গ

এক

ইতিপূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, হুসেন শাহের রাজত্বকালে মধ্যযুগীয় বাংলার আকাশ মধুর চন্দ্রকিরণের সাক্ষাৎ লাভ করেছিল। হুসেন শাহ তাঁর প্রীতি ও সমন্বয়-ধর্মী মনোভাব ও কর্ম দিয়ে তৎকালীন অশান্ত পরিবেশে সাময়িক শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর আমলেই বাঙ্গালী জীবনে নব সৃষ্টি-প্রেরণার জাগরণ দেখতে পাওয়া যায়। তিনি এবং অন্যান্য মুসলমান রাজাগণ শিল্পসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে, এবং হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী ইত্যাদির অনুবাদ এবং মৌলিক রচনার আনুকূল্য করে সাম্প্রদায়িক মিলন-মাধুর্য ও ঐক্যের প্রচেষ্টা করেছিলেন। হিন্দু কবিদের প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁরা তাঁদের 'গুণরাজখান' 'যশোরাজখান' ইত্যাদি খেতাব দ্বারা সম্মানিত করেন. এবং কবিরাও শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই সম্মান গ্রহণ করেন।

অর্থাৎ, এই সাংস্কৃতিক কর্মের মধ্যে ছিল একটা সজ্ঞাত কি অজ্ঞাত সমন্বয়ের প্রচেষ্টা। অবশ্য, মধ্যযুগের (এখানে প্রাক্-চৈতন্য সময়ের কথাই বুঝতে হবে) মরমীয়া সাধকদের চিন্তায় পূর্ব থেকেই এই মিলনের প্রয়োজনীয়তা ও আদর্শ ধরা পড়েছিল, এবং তাঁরা তাঁদের অনিন্দ্য জীবনের মাধ্যমে সেই সত্যকেই রূপায়িত করার কর্মে উদ্যোগী হয়েছিলেন। প্রত্যক্ষ যোগাযোগের অভাব সত্ত্বেও চৈতন্যদেবের ভাবজীবনের মধ্যে তাঁদের ভাব-জীবনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মরমীয়া সাধনার সুর সম্ভবত ছিল মধ্য-যুগের আকাশে বাতাসে ছড়ানো; তাই, প্রেমধর্মে ব্যাকুল চৈতন্যদেবের পক্ষে সেই রস আস্বাদনে অসুবিধা হয়নি।

ভারতের মধ্যযুগের, বিশেষ করে চৈতন্য-পূর্ব যুগের, ভাবাকাশের আলোচনা থেকে সহজেই তিনটি বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমত, সাম্প্রদায়িক ও ধর্মগত ভেদবুদ্ধির প্রতিবাদ এবং ঐক্য সংস্থাপনের প্রচেষ্টা;

দ্বিতীয়ত, প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এবং তৃতীয়ত, অখণ্ড উদার মানবতা। অবশ্য, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য পরস্পর সংশ্লিষ্ট, এবং একই মূল মনোভঙ্গীর তিনটি বিশেষ দিক মাত্র। আরও স্মরণযোগ্য যে, এই ভাবাকাশ গভীর অধ্যাত্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং এইখানেই তার শক্তি ও দুর্বলতা।

রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলার যুগে দুটো বিরোধী সংস্কৃতির ধারা যে গভীর আবর্ত সৃষ্টি করেছিল, তা সহজেই অনুমেয়। হিন্দু ও মুসলিম সংস্কার-সংস্কৃতির বিধায়কগণ নিজ নিজ সমাজের ও ধর্মের সীমানা সংরক্ষণের জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত ছিলেন। তাঁদের এই সংকীর্ণ সংরক্ষণশীলতা যে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রীয় আবর্তে আরও বেশী তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল তা অবশ্য স্বীকার্য। এই বিক্ষোভের আঘাতে সাধারণ মানুষের জীবন যে অত্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, এবং এই বিপর্যয়ের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য তাদের মন যে প্রতিকারহীন বেদনায় কেঁদে উঠেছিল, তার প্রমাণ পাই নামদেবের একটি গীতিকায়; যথা—

"Of me who am blind, Thy name, O king, is the prop,
I am poor, I am miserable, Thy name is my support.
Bountiful and merciful Allah, Thou art onerous ;
Thou art a river of bounty, Thou art the giver,
Thou art exceeding wealthy.
Thou alone givest and takest, there is none other ;
Thou art wise, Thou art far-sighted, what conception
can I form of thee.
O Nama's lord, Thou art the pardoner, O God." (১)

সাধারণ মানুষের জীবনের এই অপরিসীম শূন্যতা ও হাহাকার, দৈন্য ও বেদনা থেকেই সে যুগের মানুষ এই সংঘাতের ও বিরোধের অবসান কামনা করেছে; বিবদমান শক্তিগুলোর মধ্যে একটা ঐক্য ও শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেছে। আর উভয় আদর্শের মধ্যে একটা সমন্বয়ের

১ ঈশ্বরী প্রসাদের History of Muslim Rule in India গ্রন্থে উদ্ধৃত ; পৃঃ ২৬৭।

সন্ধান করেছে। রামানন্দের (পঞ্চদশ শতক) সম্পর্কে ভক্তমাল গ্রন্থে আছে, "রামানন্দ বুঝিলেন, ভগবানের শরণাগত হইয়া যে ভক্তির পথে আসিল তাহার পক্ষে বর্ণাশ্রম-বন্ধন বৃথা, কাজেই ভগবদ্ভক্ত খাওয়া-দাওয়ার কেন বাছাবাছি করিবে? ঋষিদের নামেই যদি গোত্র-পরিবার হইয়া থাকে তবে ঋষিদেরও পূজিত পরমেশ্বর ভগবানের নামে কেন সবার পরিচয় হইবে না? সেই হিসাবে সবাই তো ভাই, সবাই এক জাতি। ভক্তিদ্বারাই শ্রেষ্ঠতা, জন্ম দ্বারা নহে।" (২)

রামানন্দের শিষ্য কবীর বলেন,

জোর খুদাই মসীত বশত হৈঁ ঔর মুলিক কিসকেরা।
তীরথ মূরতি রাম নিবাসা দুহুঁমৈ কিনহুঁন হেরা॥
পুরিব দিশা হরী কা বাসা পছিম অলহ মুকামা।
দিল হী খোজি দিলৈ দিল ভীতরি ইহা রাম রহিমানা॥

[খোদা যদি মসজিদেই বসবাস করেন তাহ'লে আর সব মুলুক কার? তীর্থে মূর্তিতে রামের আবাস, এই দ্বৈতভাবের মধ্যে সত্য কোথায়? পূর্বদিকে হরির বাস, আর পশ্চিমে আল্লার মোকাম ; খোঁজে দেখো হৃদয়ের মধ্যেই রাম রহিমান বিরাজমান।]

সে যুগের সাম্প্রদায়িক ও সংস্কৃতি-সমন্বয়ের সর্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো 'হুসেনী ব্রাহ্মণ' সম্প্রদায়। "এই হুসেনী ব্রাহ্মণেরা ঠিক হিন্দুও নহেন ঠিক মুসলমানও নহেন। হিন্দুদের বিশ্বাস, আচার, ক্রিয়াকর্ম পদ্ধতির সঙ্গে মুসলমান ভাব ও ক্রিয়াকর্ম মিলাইয়া ইহারা তাহা আচরণ করেন। তাঁহারা বলেন "আমরা ব্রাহ্মণ, আমাদের বেদ হইল অথর্ব বেদ। অথর্ব বেদে হিন্দু ও মুসলমান উভয় মতের সমন্বয় আছে।" (৩) এমনি ধরণের আরও অনেক সম্প্রদায় আছে যারা হিন্দু আচার ও মুসলমান আচারের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিলেন, এবং যারা ব্যক্তিগত জীবনে তা পালন করতেন।

আর তাঁদের এই মিলন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই তাঁরা সমকালীন সামাজিক ও ধর্ম-জীবনের সমস্ত বিধি নিষেধ ও ভাবধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন।

২ উক্তিটি ক্ষিতিমোহন সেনের "ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা" গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। পৃঃ ৫০-৫১।

৩ ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা ; পৃঃ ১০-১১

যে ধর্মমত ও সামাজিক বিধান সমস্ত কল্যাণবোধ ও শ্রেয়বোধ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল তাকে দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেওয়া জীবনের ধর্ম নয়, বরং মেনে নিলেই বাঁচার, সৃষ্টির, সমস্ত সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা হতো। মধ্যযুগের সাধকদের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য এবং কৃতিত্ব এইখানেই যে তাঁরা জীবনের হয়ে কথা বলেছিলেন, সর্ব মানুষের বাঁচার আকুতিকেই ভাষায় রূপায়িত করেছিলেন। রামানন্দ বলেছেন, "কেন আর ভাই মন্দিরে যাইতে আমায় ডাক, তিনি বিশ্বব্যাপী আমার হৃদয়-মন্দিরেই তাঁর দেখা পাইয়াছি।" (৪) কবীর বলেন, "If by worshipping stones one can find God, I shall worship a mountain ; better than these stones (idols) are the stones of the flour mill with which men grind their corn." (৫) প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ শুধু যারা কোরাণ পুরান বা শাস্ত্র বিধান মেনে চলতেন না, তাঁদের বেলায়ই সত্য নয়, যাঁরা শাস্ত্রাদি মেনে চলতেন এমন বহু সাধকও প্রচলিত ধর্মীয় ধ্যানধারণার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন; ক্ষিতিমোহন সেন এমন অনেক সাধকের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি পত্তিনাত্তু পিল্লে নামক এক সাধকের বাণী উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, "হাতে গড়া পাষাণে বা তেঁতুলেমাজা তাম্রমূর্তিতে ঈশ্বর নাই। তাঁহাকে অন্বেষণ কর হৃদয়-গুহায়, সাধকের হৃদয়-স্বর্গে, মানবপ্রেমে।"

পত্তিনাত্তু পিল্লের এই বাণীর মধ্যে মধ্যযুগের সাধনার মূল সুরটি ব্যঞ্জনা লাভ করেছে, সে হলো মানবপ্রীতি। ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলার যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিধায়কগণ নিজ নিজ সীমানা রক্ষার কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁদের কাছে সীমানাটাই ছিল বড় কথা, মানুষের জীবন নয়। তাই সাধারণ মানুষের জীবন সমস্ত মর্যাদা হারিয়ে নিতান্ত উপেক্ষিত হয়ে কেঁদে মরছিল। সাধকরা এই উপেক্ষিত মানবের মানবতাকে সামনে তুলে ধরে বাস্তব সমাজের মধ্যে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা প্রীতির চোখে পৃথিবীর পানে তাকাতে চেয়েছিলেন বলেই তাঁদের বিদ্রোহ প্রাণহীন শাস্ত্রবচনের বিরুদ্ধে হৃদয়রসের বিদ্রোহ; সংকীর্ণ স্বার্থ বুদ্ধির বিরুদ্ধে শ্রেয়বোধের বিদ্রোহ। তাঁদের সাধনার এই অন্তর্নিহিত উদারতার জন্যই তাঁদের কাছে ধর্ম সম্পূর্ণ নতুন

৪ ঐ; পৃ ৫২

৫ History of Muslim Rule in India ; পৃ ২৬৮

আলোকে, নতুন রূপে, প্রতিভাত হয়। নানক বলেন, "He who looketh on all men as equal is religious." (৬) শাস্ত্রীয় অনুশাসন মেনে চলার অথবা ঈশ্বরভক্তির কথাও এখানে অনুপস্থিত। অবশ্য মধ্যযুগের সাধনার পটভূমিতে রয়েছে অধ্যাত্মবাদ, তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তা সত্বেও, সাধকদের বলিষ্ঠ ভক্তি থেকে এই ধারণাই জন্মে যে, মাটির মানুষ যেন এখানে প্রাণের আবেগে নিজেকে ঘোষণা করছে। ক্ষিতিমোহন সেন কবীরের মতবাদের সার সংকলন করেছেন এভাবে: "সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য সব কৃত্রিম বাধা পরিত্যাগ করিয়া সত্য হও, সহজ হও। সত্যই সহজ। সেই সত্যকে বাহিরে খুঁজিয়া বেড়াইবার দরকার নাই। তীর্থে, ব্রতে, আচারে, তিলকে, মালায়, ভেখে সাম্প্রদায়িকতায় সত্য নাই। সত্য আছে অন্তরে, তার পরিচয় মেলে প্রেমে, ভক্তিতে, দয়ায়। কাহারও প্রতি বৈরভাব রাখিবে না, হিংসা করিবে না—কারণ প্রতি জীবে ভগবান্ বিরাজিত। বিভিন্ন ধর্ম্মের নাম-ভেদের মধ্যেও সেই এক ভগবানের জন্য এই ব্যাকুলতা—কাজেই ঝগড়া বৃথা। হিন্দু মুসলমান বৃথাই এই ঝগড়া করিয়া মরিল। অহঙ্কার দূর করিয়া অভিমান ত্যাগ করিয়া, কৃত্রিমতা ও মিথ্যা পরিহার করিয়া সকলকে আত্মবৎ মনে করিয়া ভগবৎ প্রেমে ভক্তিতে চিত্ত পরিপূর্ণ কর—তবেই সাধনা সফল হইবে।" (৭) শুধু কবীরের মতবাদের নয়, মধ্যযুগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের—তারা বাহ্যত হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, অথবা আধা হিন্দু আধা মুসলমান হোক—সাধনার সার কথাই এই। ভক্তিবাদীদের এবং সুফীদের আদর্শের সাক্ষাৎও এখানে পাওয়া যাবে। ভক্তিবাদীদের আধ্যাত্মিক ভাষায় প্রকাশিত আদর্শ (সর্বেন্দ্রিয়গ্রামকে সকল উপাধি বর্জিত করে ভগবানে বিলগ্ন করাই ভক্তি), এবং সুফীদের সমস্ত বস্তু থেকে বিমুখ হয়ে অহংকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে সেই পূর্ণ এককে দেখার আদর্শ এই প্রাকৃত উক্তি থেকে খুব বেশী দূরে নয়। হিন্দু ও মুসলমান সংস্কার সংস্কৃতির সংঘর্ষের যুগে সমাজের অন্তর্গত কল্যাণকর্মী মানুষ এভাবেই সংঘর্ষের কুপ্রভাব থেকে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা করেছে, এবং একটা বিরোধহীন, স্থির সমন্বয়ে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছে। মানবতার নামে তাঁদের এই বিদ্রোহ বিস্ময়কর ও অতুলনীয়।

৬ History of Muslim Rule in India গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ ২৬৯

৭ ভারতীয় মধ্যযুগের সাধারণ ধারা, পৃ ৭৯

আরও উল্লেখযোগ্য যে, মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী (এবং পরবর্তীও) যেসব সাধক সমস্ত বিরোধ ও বিভেদ অতিক্রম করে একটা সৃষ্টিশীল সমন্বয়ে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই সমাজের অত্যন্ত নিম্ন স্তর থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন। চৈতন্যদেবের পূর্বগামীদের মধ্যে নামদেব ছিলেন দরজী, নানক ছিলেন চাষীর সন্তান, সদন কসাই; এবং রামানন্দ স্বয়ং ব্রাহ্মণ হলেও তাঁর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে রবিদাস চামার, কবীর জোলা মুসলমান, ধন্না জাঠ, সেনা নাপিত, পীপা রাজপুত; চৈতন্য পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সাধকদের মধ্যে দাদূ ও রজ্জবের জন্ম তুলা-ধুনকর বংশে, এবং সুরদাস জাতিতে বৈশ্য, তুকারাম চাষীর সন্তান। ভক্তিবাদের আদি প্রচারক দাক্ষিণাত্যের আলওয়ার সম্প্রদায়ের অধিকাংশই নীচকুলজাত; তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মহিলা, তিনি জাতিতে অস্পৃশ্য পারিয়া। এইসব দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় যে, সমাজের নিম্নাংশেই শান্তির, ঐক্যের এবং সংস্কৃতি-সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল সর্বাপেক্ষা বেশী। কেননা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অরাজকতার মধ্যে সমাজের নিম্নশ্রেণীর অধিবাসীরাই পীড়িত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলো সর্বাপেক্ষা বেশী। রাষ্ট্রীয় কলরবের বিষময় আবর্জনা তাঁদের জীবনকেই গ্রাস করতে চাইছিল। তাই জীবনের বলিষ্ঠ প্রেরণায়, বাঁচার সহজাত তাগিদে, তাঁরা এই সর্বগ্রাসী কলরবকে প্রতিরোধ করে দাঁড়িয়েছিলেন। এই প্রতিরোধে তাঁদের অস্ত্র ছিল তাঁদের মানবতা এবং হৃদয়ের প্রীতিরস। পূর্বেই বলেছি, তাঁরা জীবনকেই একটা বাস্তব সত্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন; জীবনের নামে এই যে বিদ্রোহ, তাকে সামাজিক উচ্চবর্ণের ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে, তাদের অকল্যাণধর্মী জীবন দর্শনের বিরুদ্ধে, সামাজিক নিম্নবর্ণের কল্যাণধর্মী ভাবাদর্শের বিদ্রোহ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। আর সমস্ত প্রকৃত সত্য বিদ্রোহের মত এই বিদ্রোহেরও আদর্শ ছিল একটা সার্বিক কল্যাণবোধ, সৃষ্টির আনন্দে পরিপূর্ণ এক মানবতার চেতনা। কারণ, সমস্ত বর্ণগত, শ্রেণীগত, সম্প্রদায়গত এবং ধর্মগত বিরোধ অতিক্রম করে এই বিদ্রোহ মানুষকে শুধু মানুষ হিসেবেই স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তাঁদের বিদ্রোহ ছিল গভীর অধ্যাত্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের আমল পর্যন্ত সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরে ধর্মকে অবলম্বন

করেই বিভিন্ন সমাজবিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছে, ধর্মীয় চিন্তাধারাই মানুষের প্রাত্যহিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছে। সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এই ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে মধ্যযুগের সাধকরাও তাঁদের সমকালীন সামাজিক পরিবেশকে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের আদর্শ সমাজদেহে প্রবল তরঙ্গাভিঘাতের সৃষ্টি করলেও এবং এই আদর্শের সত্যতা গভীরভাবে অনুভূত হয়ে থাকলেও, কেন তাঁরা স্থায়ীভাবে সমাজে তাঁদের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারলেন না, তার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে তাঁদের অধ্যাত্মবাদের মধ্যেই তাঁদের চরম দুর্বলতা। সামাজিক বিশৃঙ্খলা, রাষ্ট্রীয় সংঘাত, সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধি ও কলহের মূল উৎস বাস্তব সমাজ-জীবনের মধ্যে নিহিত; সেই বিশেষ কালে মানুষ জীবনের যে-প্যাটার্ণ সৃষ্টি করেছিল, তার অন্তর্নিহিত ত্রুটি ও দুর্বলতার মধ্যেই সেই বিশৃঙ্খলা বিপর্যয়ের কারণ গোপন ছিল। সুতরাং সর্বপ্রকার ধ্বংস ভেদবিচার ও অকল্যাণের স্পর্শ থেকে বিমুক্ত হতে হলে প্রত্যক্ষ বাস্তবকেই রূপান্তরিত করতে হয়। সেজন্য প্রয়োজন সংঘবদ্ধ সমাজিক ক্রিয়ার। মধ্যযুগের সাধকগণ তাঁদের নিষ্কলুষ চরিত্র, অসামান্য নিষ্ঠা ও সাধুতা, এবং অনমুকরণীয় ব্যক্তিগত আচরণ দ্বারা সমাজে আদর্শ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, এবং শ্রেয়বোধ-হারিয়ে-ফেলা মানুষের হৃদয়ে আঘাত করতে চেয়েছিলেন ; তাঁদের বিশ্বাস ছিল, হৃদয়ের প্রীতি দিয়েই সমস্ত বৈষম্যকে জয় করা যাবে, তাই সংঘবদ্ধ সামাজিক ক্রিয়ার চেতনা তাঁদের মানস-পরিমণ্ডলে স্থান পায়নি। কিন্তু নিছক ভাব-বিপ্লব যে বাস্তব সামাজিক সম্পর্ক রূপান্তরিত করতে পারে না, তা তাঁদের ব্যর্থতা থেকে পুনরায় প্রমাণিত হলো।

কিন্তু তাঁরা ব্যর্থ হয়ে থাকলেও শুদ্ধ তত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁরা যে সত্য ও সমন্বয়ে উপনীত হয়েছিলেন, তাঁদের কালের মানুষের সম্মুখে যে মানবতার আদর্শ তুলে ধরেছিলেন, তার গুরুত্ব কোনমতেই কম নয়। পৃথিবীকে সুন্দরের ও কল্যাণের আবসভূমিতে পরিণত করার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করছে, তাঁরা তাঁদেরই অংশীদার। আর সেদিক থেকে তাঁরা আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ; তাঁদের আদর্শই পরবর্তীকালের মানুষকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

দুই

চৈতন্যদেব এই ভাবাকাশের জীবন্ত প্রতীক। সুতরাং তাঁর কর্ম এবং আদর্শও তাঁর পূর্বগামী সাধকদের আদর্শেরই পরিণতি। চৈতন্য-যুগের মানুষ তাঁকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখত তাঁর স্বাক্ষর রয়েছে কবি কর্ণপূরের "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়" নাটকের একটি শ্লোকে। তা এই,

হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া।
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া চিত্তার্পিতোন্মদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে! তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥

[হে শ্রীচৈতন্য দয়ানিধি, তোমার যে দয়ায় অনায়াসে মানুষের সকল দুঃখ দূর হয়ে চিত্ত নির্মল হয় এবং প্রেমানন্দ বিকশিত হয়; যাঁর প্রভাবে শাস্ত্রাদির বাদবিসম্বাদ দূর হয়, যা চিত্তে রস সঞ্চার করে প্রগাঢ় মত্ততা জন্মায়; যা থেকে সর্বদা ভক্তিসুখ ও সর্বত্র সমদর্শন লাভ হয় এবং যা সকল মাধুর্যের সার; তুমি দয়া করে সেই দয়া আমাতে প্রকাশ কর।]

চৈতন্যদেবের জীবন, কর্ম এবং আদর্শ প্রত্যক্ষভাবে ভাগবতের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভাগবতে ভগবানের স্বরূপকে সর্বদা প্রশান্ত অভয় এবং ভেদশূন্য বলে অভিহিত করা হয়েছে (শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বম্); এবং যিনি সর্বভূতে ভগবানের ঐশ্বর্য অবলোকন করেন, কোন তারতম্য দেখেন না এবং যিনি ভগবানে সর্বভূত অবলোকন করেন, তাকে উত্তম ভাগবত বলা হয়েছে (সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥) দৃষ্টির এই ব্যাপকতার জন্যই ভাগবতের ভাবাকাশ অত্যন্ত উদার। সর্বভূতে ভাগবতগণ ঈশ্বরকে দেখছেন; তাই মানুষকে তাঁরা তার অন্তর্নিহিত মানবতার জন্যই গ্রহণ করছেন, তার বর্ণ-কর্ম বা ধর্মের জন্য দূরে সরিয়ে রাখেন নি; সে দিক থেকে সকলের জন্যই তাঁদের দ্বার উন্মুক্ত। তাঁদের এই মহানুভব আদর্শ যে শুধু মাত্র ভাবজগতেই বিচরণ করেনি, ব্যবহারিক বাস্তব জগতের মধ্যেও স্বীয় স্বাক্ষর স্থাপনের প্রয়াসী ছিল, তার প্রমাণও আছে। ব্রাহ্মণ্য সমাজচিন্তায় অনার্য জাতিদের স্থান ছিল না, অনার্য অস্পৃশ্য বলে তাদের ধর্মজীবন এবং মোক্ষ

লাভের সম্ভাবনাও অস্বীকৃত ছিল। কিন্তু ভাগবতগণ সেইসব অপাংক্তেয় অস্পৃশ্য জাতির মোক্ষলাভের অধিকার স্বীকার করেন। ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে একটি শ্লোকে বলা হয়েছে

কিরাত হূণান্ধ্র পুলিন্দপুক্কশা
আভীরশুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ
যেহন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভাবিষ্ণবে নমঃ ॥

[কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ পুক্কশ, আভীর, শুহ্ম, যবন এবং খস প্রভৃতি পাপ জাতি এবং যারা কর্মদোষে পাপাত্মা, তারাও যে ভাগবতগণের আশ্রয়ে সর্ববিধ পাপ থেকে শুদ্ধিলাভ করে, সেই প্রভাবশালী ভগবানকে প্রণাম।]

এই উদার দৃষ্টি শুধু মানব-সীমায় এসেই থেমে যায়নি। মানুষের সীমা অতিক্রম করে তা সমস্ত জীবজন্তুকেও তার উদার পরিধির মধ্যে আহ্বান করেছে। ভগবদ্গীতায় একটি শ্লোকে আছে,

বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

[যিনি বিদ্যাবিনয়ান্বিত ব্রাহ্মণ, গোরু, হাতী, কুকুর এবং চণ্ডাল সকলের মধ্যেই পরম কারণরূপে সমানভাবে পরমাত্মাকেই অনুভব করে থাকেন, তিনিই পণ্ডিত।]

এই উদার ভাবতরঙ্গে চৈতন্যদেব অবগাহন করেছিলেন, এবং নিজের জীবনে তাকে উপলব্ধি করেছিলেন। ভাবজগতে দেখছি তিনি 'পদ্যাবলী'তে সংগৃহীত এই শ্লোকটি উচ্চারণ করে জগন্নাথ প্রণাম করছেন,

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো,
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে,
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥ (৮)

[আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্য নই, শূদ্র নই, ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থ নই এবং সন্ন্যাসীও নই, কিন্তু আমি নিখিল পরমানন্দ পরিপূর্ণ অমৃত সাগর স্বরূপ গোপীপতি শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলের দাসানুদাসের দাস।]

৮ চৈতন্যচরিতামৃত ; মধ্যলীলা, পৃঃ ৩৭০

এছাড়া তাঁর আর কোন পরিচয় নেই বলেই তাঁর "সমদৃষ্টি ধর্ম", আর "ঘৃণাবুদ্ধি করি যদি, নিজ ধর্ম যায়।" ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে এই আদর্শ প্রচলিত সামাজিক ভেদবিচার জাতিভেদ এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সমকালীন বিশৃঙ্খল এবং শ্রেয়বোধহীন সমাজ-পরিবেশে চৈতন্যদেব তাঁর সামাজিক ভেদবিচারহীন আচরণ দ্বারা একটা স্থায়ী সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সমকালীন ভক্তদের মধ্যে "ব্রাহ্মণ ২৩৯, কায়স্থ ২৯, বৈদ্য ৩৭, সুবর্ণবণিক্ ১, ভূঁইমালি ১, সূত্রধর ১ কর্মকার ১ মোদক ১ হাজরা উপাধি (জাতি অজ্ঞাত) ১ মুসলমান ২ জাতি অজ্ঞাত ৯৫, সন্ন্যাসী ৫৪ পার্শি ১ রাজপুত ১ ব্রাহ্মণেতর উড়িয়া ২৬—৪৯০।" (৯) এখানেও ভাগবতদের মত চৈতন্য পূর্ববর্তী মধ্যযুগীয় সাধক রামানন্দ কবীর প্রভৃতির মত, সকলের জন্যই দ্বার উন্মুক্ত; প্রীতির বন্ধনে সকলকে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাঁধার চেষ্টা, সামাজিক বিধিনিষেধ অতিক্রম করে মানুষের মানব সত্তাকেই প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা। সর্বভেদ বর্জন করে চৈতন্যদেব তাঁর মতামত প্রচার করছেন, এবং "চালু কলা মুদ্গ দধি একত্র করিয়া। জাতি নাশ করি খায় একত্র হইয়া।" (চৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড ২১৫)। এই কার্যের জন্য চৈতন্যদেব এবং তাঁর পার্ষদগণ সমকালীন ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির ধারকদের নিকট থেকে বহু লাঞ্ছনা ও কটূক্তি ভোগ করেছিলেন। কিন্তু অভেদ-দর্শন তাঁদের কাছে এতই পবিত্র এবং এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা তাঁদের কাছে এতই জরুরী যে বৃন্দাবনদাস লিখেছেন

জাতি কুল ক্রিয়া ধনে কিছু নাহি করে।
প্রেম ধন আর্তি বিনে না পাই কৃষ্ণেরে ॥
যে-তে-কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্বোত্তম সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে ॥
... ...
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি করে
জন্ম-জন্ম অধম-যোনিতে ডুবি মরে ॥ (মধ্যখণ্ড পৃঃ ২৩২)

এই ভাবেই তাঁরা একটা আদর্শ সামাজিক আচরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। আর শুধু তাই নয় যারা এই অভেদ দর্শনে উদ্বুদ্ধ হবে না যারা

৯ বিমানবিহারী মজুমদার; চৈতন্যচরিতের উপাদান পৃঃ ৬০৯

ধার্মিক হয়েও ভেদ বিচার মেনে চলে, সমদৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে তাকায় না, তাদের অপরাধ এবং অপরাধের শাস্তি কি বৃন্দাবনদাস তাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। নারদীয় সংহিতার ভাষায়

অভ্যর্চ্চয়িত্বা প্রতিমাসু বিষ্ণুং
দূষ্যন্ জনে সর্ব্বগতং তমেব।
অভ্যর্চ্চ্য পাদৌ দ্বিজনস্য মূর্দ্ধ্নি
দ্রুহ্যন্নিবাজ্ঞো নরকং প্রযাতি ॥ (১০)

[যদি কোন ব্যক্তি প্রতিমাসমূহে যথাবিধি বিষ্ণুর অর্চনা করে কিন্তু সংগে সংগে জনগণের প্রতি অপরাধ আচরণে বিরত না হয় তাহলে সেই অপরাধে সে সেই সর্বব্যাপীর প্রতিই অপরাধী হয়ে থাকে। সুতরাং যদি কেউ যথার্থভাবে ব্রাহ্মণের পদসেবা করে সংগে সংগে তার মাথার বিরুদ্ধে অপরাধ করে তাহলে তার যেমন নরকবাস হয় সেই মূর্খও তেমন নরকবাসী হয়।]

এই উক্তি সম্ভবত অ-সামাজিক আচরণে অপরাধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয়েছিল এবং নিঃসন্দেহে পরাজিত মানুষের উক্তি। অবশ্য এই পরাজয় অকল্যাণবুদ্ধির নিকট কল্যাণবুদ্ধির পরাজয়; কিন্তু পরাজিত হলেও কল্যাণবুদ্ধি তার প্রতিপক্ষকে জানিয়ে দিচ্ছে যে তার রূপটা সত্য নয়, এবং অসত্যকে অবলম্বন করেছে বলেই ভবিষ্যতের নির্মম শাস্তি তার জন্য প্রতীক্ষা করে' বসে আছে। চৈতন্যদেব, এবং তাঁর পার্ষদগণ তাঁদের ব্যক্তিগত আচরণ এবং ভাবাদর্শ দ্বারা তাঁদের আমলের বিভেদকামী মানুষদের এই কথাই শুনিয়েছিলেন।

কবি কর্ণপূরের পূর্বোল্লেখিত শ্লোকে কবি চৈতন্যদেবের দয়ায় শাস্ত্রাদির বাদবিসম্বাদ দূর হয় বলে তাঁর বন্দনা করেছেন। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে চৈতন্যদেব তাঁর পার্ষদদের উদ্দেশ্যে বলছেন, "তৃণ হইতে নীচ হঞা সদা লইবে নাম। আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান॥" (আদিলীলা, ১৭শ পরিচ্ছেদ)। শাস্ত্রাদির চর্চায় নিয়োজিত চৈতন্যদেবের সমসাময়িক পণ্ডিত সমাজের নিকট এ সম্পূর্ণ অভিনব কথা। সে সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্ররা এসে নবদ্বীপে ন্যায়, দর্শন, কাব্য, স্মৃতির আলোচনা করত, এই আলোচনার বিলাসই ছিল তাদের এবং পণ্ডিত সমাজের জীবনের একমাত্র

১০ মধ্যখণ্ড পৃঃ ১৮৮ তে উদ্ধৃত।

আনন্দ। অপরদিকে, সমাজ ছিল জাতিভেদের কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধা, বিধিবদ্ধ ব্রতানুষ্ঠান আচার ইত্যাদির নির্মম অনুশাসনে সমাজ জীবন ছিল নিষ্প্রভ। এই প্রাণহীন তর্ক ও বিদ্যাবিলাস এবং আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে জীবনের স্বীকৃতি ছিল না, আর পাণ্ডিত্যাভিমানীর কাছে সামাজিক কল্যাণের মূল্যও বিশেষ কিছু ছিল না। কেননা, তাঁরা তাঁদের পাণ্ডিত্যের গৌরব এবং ধর্মের সীমা সংরক্ষণের কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন; আর এই মনোভাব থেকেই জন্ম নেয় বিভেদ, পরস্পরকে দূরে সরিয়ে রাখার আগ্রহ, এক কথায় সামাজিক অকল্যাণ ও ব্যভিচারকে জিইয়ে রাখার প্রেরণা। চৈতন্যদেব এই মনোভাবের উপর আঘাত করেন; তিনি সমস্ত মানুষকে একই সমান ভিত্তির উপর মিলাতে চেয়েছিলেন। আর যতক্ষণ অভিমান অথবা অহংকার বর্তমান থাকে ততক্ষণ এই মিলন কোনমতেই সম্ভব হতে পারে না। আর শুধু, মিলনই বা কেন, যেখানে পাণ্ডিত্যের অভিমান বিরাজিত, সেখানে সত্য ও কল্যাণবুদ্ধির স্থান নেই। এ সম্পর্কে কবীরের একটি চমৎকার কথা আছে,

পঢ়ি পঢ়িকে পথর ভয়ে লিখি লিখি ভয়ে জু ইট।
কবীর অংতর প্রেমকী লাগি নেক ন ছীট॥

(পণ্ডিতরা পড়ে পড়ে সব হলেন পাথর, লিখে লিখে সব হলেন ইট, প্রেমের একটি ছিটাও পারে না তাদের মনে প্রবেশ করতে।)

চৈতন্যদেবও তাঁর পূর্বগামীদের, বিশেষ করে ভাগবতের আদর্শকে অবলম্বন করে শাস্ত্রাদির আবেদন ও প্রয়োজনকে গৌণ করে দিলেন। ভাগবতে আছে,

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ।
ন স্বাধ্যায় স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা॥

[হে উদ্ধব, আমাতে দৃঢ় ভক্তি যেরূপ আমাকে বশীভূত করে, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যযোগ, বেদধ্যয়ন, তপস্যা এবং সন্ন্যাসও আমাকে সেরূপ বশীভূত করতে পারে না।] শাস্ত্রের নিষ্প্রাণ বিধান ইত্যাদির পরিবর্তে তাঁরা তুলে ধরলেন তাঁদের সহজ প্রেমের আদর্শ। এই আদর্শ অনুসরণের জন্য এবং জীবনে তাকে রূপান্তরিত করার জন্য শাস্ত্রাদির প্রয়োজন তো নেই-ই, এমন কি দীক্ষা পুরশ্চর্যা ইত্যাদিরও প্রয়োজন নেই। 'পদ্যাবলী'র একটি শ্লোকে আছে,

নো দীক্ষাং ন চ দক্ষিণাং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ। (১১)

[এই শ্রীকৃষ্ণনামরূপ মন্ত্র কোনপ্রকার তান্ত্রিকী বা বৈদিকী দীক্ষা, সদাচার অথবা পুরশ্চর্যা বিধির অপেক্ষা রাখে না, কেবলমাত্র জিহ্বা স্পর্শ মাত্রই ফলিত হয়ে থাকে।]

এই আদর্শই চৈতন্যদেবের আদর্শ। সর্বপ্রকার শাস্ত্রীয় ধ্যানধারণা, চিন্তা, আদর্শ ও বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি এবং তাঁর পরিবারগণ নির্মল প্রেমের আদর্শ প্রচার করেন; ভেদবিচারের গ্লানিহীন প্রেম দ্বারা তাঁরা ভগবানকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ, এই আদর্শের মাধ্যমে তাঁরা জীবনকেই পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টি ও উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। মধ্যযুগের সাধনার প্রকৃত ঐতিহ্যবাহী হিসেবে তাঁরা পথ-হারিয়ে-ফেলা সামাজিক অচলায়তনকে এই প্রেমের পথেই মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। সমস্ত প্রকার সামাজিক গ্লানি, ভেদ-বিচার এবং হিংসাদ্বেষের স্পর্শ থেকে মুক্তির পথ, এবং বিবদমান ধর্মমতগুলির পারস্পরিক সমন্বয় সাধনের পথও ছিল তাঁদের কাছে এই প্রেমেরই পথ। অর্থাৎ এর আলোকেই তাঁরা জীবনের সর্ববিধ সমস্যার সমাধান খুঁজেছিলেন।

এই জীবনের সমস্যার সমাধান চেয়েছিলেন বলেই একথা দৃঢ়তার সংগে বলা যেতে পারে যে, এই পৃথিবী এবং স্থানকাল-বিধৃত জীবন নিয়েই চৈতন্যদেব এবং তাঁর পার্ষদদের কারবার। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলায় ২০শ পরিচ্ছেদে "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, শ্রেষ্ঠ ও মধ্যাদি ভেদে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম, পূর্ণতর এবং পূর্ণ বলে কীর্তিত হন; এই বিচারে গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম, মথুরায় পূর্ণতর এবং দ্বারকায় পূর্ণ। এ সম্পর্কে ভাগবতে আছে, শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে গোপীদের সংগে মিলিত হয়ে তাঁদের তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দেন; তা শুনে গোপীরা ব'ললেন, আমরা তোমার তত্ত্বজ্ঞানের আগুনে দগ্ধ হচ্ছি; আমরা চকোরী, তোমার মুখচন্দ্র জ্যোৎস্নায় জীবন ধারণ করে থাকি; সুতরাং বৃন্দাবনে এসে আমাদের জীবন রক্ষা কর।

আহুশ্চ তে নলিননাভ! পদারবিন্দং,
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।

১১ চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৫শ পরিচ্ছেদ

সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥

এই শ্লোকের টীকায় বলা হয়েছে, হে পদ্মনাভ, যোগেশ্বরগণ তোমার পদারবিন্দ হৃদয়ে চিন্তা করেন, কিন্তু আমরা হৃদয়ের উপরিভাগ ধারণ করে বাঁচি ; যোগেশ্বরগণ গম্ভীরবুদ্ধি, তাঁরা তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করতে পারেন, কিন্তু আমরা তা চিন্তা করতে আরম্ভ করিলেই মূর্চ্ছা যাই। তোমার পাদপদ্ম সংসারকূপ থেকে মানুষকে উদ্ধার করে, কিন্তু তোমার বিরহে পীড়িত জনগণকে উদ্ধার করতে সমর্থ নয়। আমরা গোপিগণ, বাল্যকাল থেকেই সংসারসুখ ত্যাগ করেছি, সংসারকূপে পতিত নই ; কিন্তু তোমার বিরহ সাগরে পতিত হয়েছি, সুতরাং আমাদের পক্ষে তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করা বৃথা। যদি বল, "দ্বারকায় এস, সেখানে তোমাদের সংগে নিত্য বিহার করবো," তার উত্তর আমরা কি দিতে পারি ? আমরা কোন মতেই বৃন্দাবন ছেড়ে যেতে পারি না। সেখানে তোমার যে মাধুর্য প্রকটিত হয়েছে, তাতেই আমাদের রুচি। সুতরাং বৃন্দাবনে উদিত হও, সেখানে দর্শন করলেই আমাদের তাপ জুড়াবে। (১২) অর্থাৎ গোপীরা কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ হৃদয় সম্পর্কের মধ্যে পেতে চায়। সেখানে তাঁর যে মাধুর্য প্রকাশিত হয়েছে, তাতেই তাঁদের তৃপ্তি ও আনন্দ। কৃষ্ণ যেখানে অসাধারণ, অথবা অলৌকিক, সেখানে তাঁর যত ঐশ্বর্য থাক না কেন, গোপীরা তা অনুধাবন অথবা উপলব্ধি করতে পারে না , তাই সে ঐশ্বর্যই তাঁদের কাছে নিষ্প্রয়োজন। তাঁর সাধারণ লৌকিক ঐশ্বর্য এবং মাধুর্যের মধ্যেই কৃষ্ণ পূর্ণতম। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন, "সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ ;" মথুরা-দ্বারকায় কৃষ্ণের ঐশ্বর্য নরলীলার অন্তর্ভুক্ত হলেও সেখানে কৃষ্ণ সাধারণ নয়, অসাধারণ ; লৌকিক নয়, অলৌকিক। লৌকিক মানস বিশুদ্ধ লৌকিক সম্পর্কের মধ্যেই সমস্ত আনন্দ, ঐশ্বর্য ও সুখভোগ করতে চায়। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের বিভাগ অনুযায়ী চৈতন্যদেবের জীবনকে ভাগ করলে তাঁর নবদ্বীপ-জীবনকেই পূর্ণতম বলে অভিহিত করতে হয়। সে সময়ে এবং এমন কি গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর এবং সন্ন্যাস অবলম্বনের পূর্বকাল পর্যন্ত তিনি সমাজ-সম্পর্কযুত, স্থানে কালে বিচরণশীল মানুষ হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেছেন , কাজীর অবিচারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করেছিলেন।

১২ চৈতন্যচরিতামৃত ; মধ্যলীলা, পরিচ্ছেদ।

কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্য-জীবন নিগূঢ় ভাবময় ; সেই ভাবের আস্বাদন লৌকিক মানুষের পক্ষে সহজ নয়। এবং সমাজ-সম্পর্কের ঊর্ধ্বে স্থাপিত একান্ত ভাবজীবন যাপন করে সামাজিক মানুষের কল্যাণ সাধন করা সম্ভব কিনা সে সম্পর্কে একটা গভীর সন্দেহ তাঁর মধ্যে বরাবর বর্তমান ছিল। তাই সন্ন্যাস গ্রহণ করার পরেও একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করে বাস্তব সমাজের সংগে কিভাবে সংযোগ রক্ষা করা যায়, সে সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলছেন,

যদ্যপি সহসা আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমা সবা হৈতে নাহিব উদাস ॥
তোমা সবা না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব ॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া ॥
কেহ যেন এই বোলে না করে নিন্দন।
সেই যুক্তি কর যাতে রহে দুই ধর্ম্ম ॥

(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

আরও একস্থানে তিনি সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে থেকে মার সেবা না করায় আক্ষেপ করে বলছেন

তাঁর সেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
ধর্ম্ম নহে কৈল আমি নিজধর্ম্ম নাশ ॥
তাঁর প্রেমবশ আমি, তাঁর সেবাধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্ম্ম ॥

(ঐ, ১৫শ পরিচ্ছেদ)

এমনি ধরণের বহু উক্তি চৈতন্যচরিতামৃতের নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত রয়েছে। এইসব উক্তির মধ্যে চৈতন্য মতবাদের একটা পরম সত্য নিহিত রয়েছে ; তিনি সংসারকে অবজ্ঞা করেন নি, তাঁর চোখে সংসার অসার বা অনিত্য নয়। সংসার সত্য, এই সংসারের মধ্যেই মানুষকে বিচরণ করতে এবং বেঁচে থাকতে হবে, এবং এই সংসারের মধ্যেই সৃষ্টিশীল উন্নততর জীবনের স্বাদ ভোগ করতে হবে। এই দৃষ্টি সংসার সম্পর্কে গভীরভাবে চিহ্নিত ও

সচেতন মানুষেরই উক্তি।) গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথকে তাই চৈতন্যদেব উপদেশ দিচ্ছেন

মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥
অন্তর নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার॥
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥

(ঐ, ১৬শ পরিচ্ছেদ)

সংসারের মধ্যে থেকে, বাস্তব সমাজের মধ্যে অবস্থান করে প্রেমের আদর্শে জীবনকে সৃষ্টি করতে হবে, সমস্ত মানুষকে প্রীতির বন্ধনে বাঁধতে হবে, এবং সমস্ত ভেদবিচারের স্পর্শ থেকে মুক্তিলাভ করে জীবনের আনন্দ ভোগ করতে হবে। এই যে কার্যক্রম, তা একান্তই পার্থিব এবং বাস্তব। আর এর মধ্যেই গভীর আধ্যাত্মিক আনন্দ নিহিত। কেন না,

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্ণবসঙ্গরসায়নম্॥ (১৩)

[যে নারীর উপপতিতে অতিশয় আসক্তি, সে গৃহকর্মে ব্যস্ত থেকেও পূর্বাস্বাদিত উপপতি-সঙ্গসুখ মনে মনে আস্বাদন করে আনন্দিত হয়; তেমনি ভক্তজনও গৃহকর্মে ব্যাপৃত থেকে হরিলীলা রস মনে মনে আস্বাদন করে আনন্দ লাভ করে থাকেন।]

সুতরাং চৈতন্যদেবের "সর্ব্বোত্তম নরলীলা" বলেই তিনি এবং তাঁর পার্ষদরা সংসার থেকে মক্তি কামনা করেন না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন, "স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি মানে" (মধ্যলীলা, ১৯শ পরিচ্ছেদ)। চৈতন্যদেব এবং তাঁর পার্ষদগণ একটা নতুন দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছিলেন; সে দৃষ্টি প্রেম অথবা মাধুর্যরসপূর্ণ। সেই মাধুর্যের দৃষ্টিতে ভগবানের কল্পনাও তাই এক বিশেষ রং-রসে রূপায়িত হয়ে যায়। তাঁদের ভগবান মধুর, প্রেমময়, কৃষ্ণের কল্পনার সংগে স্বভাবতই যে বীরত্ব ও ঐশ্বর্য গুণ সংশ্লিষ্ট থাকে, বৈষ্ণবের কৃষ্ণ কল্পনায় সাধারণত তা অনুপস্থিত। আর সেই জন্যই তাঁদের অবতার তত্ত্বের মধ্যে একটু নতুন সুর শুনতে পাওয়া যায়। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে,

---

১৩ চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, প্রথম পরিচ্ছেদ

আনুষঙ্গ কর্ম এই অসুর-মারণ।
যে লাগি অবতার কহি সে মূলকারণ॥
প্রেমরস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদগম॥

(আদিলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ)

কারুণ্য এবং মাধুর্য ভাবের প্রতিমূর্তি ভগবানকে উপলব্ধি করতে হলে ভক্তের পক্ষে মাধুর্যভাব দিয়ে জীবন-চর্যা এবং ভগবানের সেবা একমাত্র বিধেয় কর্ম। ভক্ত-ভগবান অভিন্ন দেহে পরিণত হলে মাধুর্যভাবের মাধ্যমে পরস্পরকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। সেজন্যই ভাগবতের শ্লোক

সালোক্যসার্ষ্টি সারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

(আমার ভক্তগণ সেবা ছাড়া সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য এই পাঁচ রকম মুক্তি দান করলেও গ্রহণ করেন না।)

—ইহাই হলো বৈষ্ণবদের আদর্শ। এই ধরণের মুক্তি ভক্তদের কাম্য নয় বলেই স্বর্গলাভ ইত্যাদিও তাঁদের কাম্য হতে পারে না। ভাগবতেও আছে।

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥

(যখন পূর্ণ ভক্তগণ আমার সেবাদ্বারা প্রাপ্ত সালোক্যাদি চতুর্বিধ মুক্তি গ্রহণ করেন না, তখন কালে ধ্বংস হয় যে স্বর্গাদি, তা কি জন্য গ্রহণ করবেন?)

ভাগবতের এই উদার পার্থিব ভাবধারা চৈতন্যদেবের আমলে আরও বেশী মানবিক ভাবধারায় পরিণত হয়েছে; আরও বেশী বাস্তব জীবনধর্মী ও সামাজিক সম্পর্ক-নির্ভর আদর্শে রূপায়িত হয়েছে। জীব গোস্বামী মুক্তি শব্দের বিশ্লেষণে বলছেন, "অবিদ্যাধ্যস্তমজ্ঞত্বাদিকং হিত্বা স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ মুক্তিঃ" (অবিদ্যা আরোপিত অজ্ঞতা বর্জন করে স্ব স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি)। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই আদর্শ একান্তই ব্যবহারিক; প্রচলিত পৃথিবী এবং প্রত্যক্ষ

সমাজ-সম্পর্কের মধ্যে অবস্থান করেই এই মুক্তি ভোগ করা সম্ভব। বৈষ্ণবদের মতে, এই মুক্তি স্বর্গপ্রাপ্তির চেয়েও শ্রেষ্ঠ, স্বর্গ-জীবনের ঐশ্বর্য থেকেও এর ঐশ্বর্য লোভনীয়, এবং তুলনায় মহৎ। তাঁদের মুক্তির মতই অনবদ্য অপরূপ তাঁদের প্রেম। এই প্রেমধর্ম ও আদর্শের তুলনাও স্বর্গে মেলা ভার। ভগবতে আছে,

> তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
> শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥

এই শ্লোকের টীকা এবং ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, হে প্রাণবল্লভ, তোমার বিরহে আমাদের মৃত্যু উপস্থিত হয়েছিল, পুণ্যবান ব্যক্তিগণ তোমার কথামৃত পান করিয়ে তা নিবারণ করেছেন। তোমার কথামৃত স্বর্গীয় অমৃত এবং মোক্ষ হতেও বিলক্ষণ; কারণ, তোমার কথামৃত সংসারতপ্ত এবং তোমার বিরহতপ্ত ব্যক্তিদের জীবিত করে, অন্য অমৃতদ্বয় তা করতে পারে না। আর তত্ত্বজ্ঞগণ তোমার কথামৃতের স্তুতি করেন, কিন্তু অন্য অমৃতদ্বয়ের স্তুতি করেন না। তোমার কথামৃত পাপ, মালিন্য ইত্যাদি দূর করে,—শ্রবণমাত্রই মঙ্গলপ্রদ, এবং সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং সর্বব্যাপক; কিন্তু অন্য অমৃতদ্বয় সেরূপ নয়। সুতরাং তোমার কথামৃত যে ব্যক্তি পৃথিবীতে কীর্তন করেন, তিনি ভূরিদ অর্থাৎ বহুদাতা অর্থাৎ প্রাণদানকারী। (১৪)

চৈতন্যদেব এই প্রেমধর্ম, এই কৃষ্ণকথামৃত পৃথিবীতে প্রচার করে জনসাধারণের জীবনরক্ষা করেছেন, সুতরাং তিনি প্রাণদানকর্তা। এই ভাবসম্পদ এতই অমূল্য, কল্যাণকর এবং বিরোধ বিদ্বেষ ধ্বংসকারী যে কোন কিছু দিয়ে এর পরিমাপ করা যায় না; এমনকি, কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায়, "এই গুপ্ত ভাবসিন্ধু, ব্রহ্মা না পায় একবিন্দু, হেন ধন বিলাইল সংসারে।" (মধ্যলীলা. দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)।

বৈষ্ণবদের এই তত্ত্ব ও উক্তির অন্তরালে আছে জীবনের আনন্দময় স্বীকৃতি। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, তত্ত্ববিচারে তাঁরা সংসারকে মায়া বলে পরিত্যাগ করতে চান না; আর তাই তাঁদের আদর্শ ও চিন্তায় এই বাস্তব পৃথিবী, সত্য সামাজিক জীবনই পরম ও চরম সত্যরূপে প্রতিভাত হয়েছে। আর সেজন্যই এখানকার সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগ্যবস্তু

---

১৪ চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৪শ পরিচ্ছেদ।

সমস্ত স্বর্গীয় পদার্থ থেকে শ্রেষ্ঠ, এবং এখানকার মানুষ যা ভোগ করে যা আস্বাদন করে, তা স্বর্গের দেবতাদেরও স্পর্শের অতীত, কামনার অতীত, ভোগের অতীত।

জীবনের এই বলিষ্ঠ স্বীকৃতির মধ্যেই ফুটে উঠেছে মানুষের মানবিক মহিমা। মানুষের আবাসভূমি এই পৃথিবী যেমন স্বর্গ থেকে কোন অংশেই ক্ষুদ্র নয়, এখানকার রসসম্পদ যেমন স্বর্গীয় ভাব ও রসসম্পদ অপেক্ষা কম মধুর নয়, তেমনি মানুষও স্বর্গের আবাসিক দেবতা অপেক্ষা কোন-ক্রমেই ক্ষুদ্র ও হীন নয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বৈষ্ণবরা বিশেষ এক দৃষ্টিমার্গ থেকে পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছিলেন; সে দৃষ্টিতে সব কিছুই মধুর। এই পৃথিবী, পৃথিবীর অন্তর্গত বস্তুসমূহ, ভগবান, সবাই মধুর; আর ভগবানের প্রিয় ভক্ত ও অন্তরঙ্গ পাত্র হিসেবে মানুষকেও তাঁরা এই মাধুর্য গুণে মণ্ডিত করেছেন। মানুষ সম্পর্কে এই মহিমময় দৃষ্টিই বৈষ্ণবদের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। অবশ্য মানুষের এই মানবতাকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা, এবং মানুষের শক্তি ও ঐশ্বর্যের স্বীকৃতি সুদূর অতীতে ভাগবতের ভাবাকাশের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে দেখতে পাই, সর্ববিধ ঐশ্বর্য ও গুণের আধার মানব কৃষ্ণ বৈদিক দেবতাদের পূজার বিরুদ্ধা-চরণ করছেন। নন্দ প্রভৃতি বৃষ্টির জন্য ইন্দ্রের পূজার আয়োজন করলে কৃষ্ণ তাতে বাধা দিয়ে বলছেন

রজসা চোদিতা মেঘা বর্ষন্ত্যম্বূনি সর্বতঃ।
প্রজাস্তৈরেব সিধ্যন্তি মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি॥

[মেঘসমূহ রজোগুণে পরিচালিত হয়ে সর্বত্র বারি বর্ষণ করে থাকে; সেই মেঘের সাহায্যেই শস্যাদি উৎপাদন করে জীবগণ জীবনধারণ করে থাকে। তাদের জীবনধারণ বিষয়ে ইন্দ্রের কোন কাজ নেই। ইন্দ্র আবার কি করবেন?]

সেই যুগে কৃষ্ণের মুখে এই বিদ্রোহাত্মক উক্তি সত্যই বিস্ময়কর। তাঁর এই উক্তির তাৎপর্য থেকে এটা বোঝা যায় যে, প্রাকৃতিক শক্তি-সমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানুষ তার নিজস্ব অপরিমেয় শক্তির চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছিল; এবং সেই শক্তির গৌরবেই সে স্পর্ধা করে দাঁড়াচ্ছিল সমস্ত পৃথিবীকে, প্রকৃতির অনাত্মীয় শক্তিসমূহকে, এবং বিশ্বপ্রকৃতির উপর

নিজস্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কার্যে অগ্রসর হয়ে চলছিল। তার এই শক্তির আগমণের দিনে মানুষের কাছে ভগবানের ক্ষমতাও ক্ষীণ হয়ে আসছে, এবং ভগবান আছে কি নেই এই প্রশ্নের চূড়ান্ত কোন মীমাংসা সে আমলে করা সম্ভব না হয়ে থাকলেও ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিঞ্চিৎ সন্দেহও মনে আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। ফলে, ভগবান যে পরিমাণে শক্তিহীন হয়েছেন অথবা শক্তি হারিয়েছেন, মানুষ ঠিক সেই পরিমাণে শক্তিশালী হয়েছে এবং শক্তি অর্জন করেছে। ভগবানের পরাজয় সম্ভবত তখন থেকেই আরম্ভ হয়েছে। ভাগবতে আছে,

অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপ্যন্যকর্ম্মণাম্।
কর্ত্তারং ভজতে সোঽপি ন হ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হি সঃ॥ (১০-২৪-১৪)

[কর্মফলদাতা কোন ঈশ্বর যদি থেকে থাকেন, তা হ'লেও তিনি অন্যের কর্মসমূহের ফলদাতা হ'তে পারেন না। আর তিনি কর্মকর্তাকে অনুসরণ করেন, অর্থাৎ, কর্মকর্তার কর্ম অনুসারেই ফলপ্রদান করেন, স্বেচ্ছানুসারে ফলদান করেন না।]

ভাগবতের এই ঈশ্বর-কল্পনা, মানুষের নিকট তার পরাভব বা অধীনতা, চৈতন্য-আমলের অত্যন্ত স্থূল ও লৌকিক ভগবান-কল্পনায় পরিণতি লাভ করে। সনাতন গোস্বামী ভগবানের সংজ্ঞায় বলেন,

আয়তিং নিয়তিঞ্চৈব ভূতানাঞ্চ গতাগতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥ (১৫)

[যিনি সমস্ত প্রাণীসমূহের ভবিষ্যৎ ও অবশ্যম্ভাবী কর্মফল, এবং বিদ্যা ও অবিদ্যার স্বরূপ জানেন, তাঁহাকেই ভগবান বলা হয়।]

এই ভগবান সর্বপ্রকার অলৌকিক গুণবর্জিত, মানুষের কর্মফলদাতাও নন, শুধু একজন জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্র; অর্থাৎ ভগবানকে মানুষের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে। আর শুধু তাহা নয়, এই অর্থে যে কোন তত্ত্ব-জ্ঞানী মানুষও ভগবান নামে অভিহিত হ'তে পারেন। এই উক্তির মধ্যে আছে মানুষের ঐশ্বর্য এবং শক্তির পরোক্ষ স্বীকৃতি।

এই মানুষের নিকটই ভগবান পরাজিত। এই মানুষই ভগবান অপেক্ষা

---

১৫ বিমানবিহারী মজুমদারের "চৈতন্যচরিতের উপাদান" গ্রন্থে উদ্ধৃত।

শক্তিশালী। বৈষ্ণবদের দৃষ্টির বলিষ্ঠতা এখানেই যে, তাঁরা মানুষের মানবত্বাকে সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলছেন,

আমাকে ঈশ্বর মানে—আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে—যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি—এ মোর স্বভাবে॥

আপনাকে বড় মানে আমারে সম, হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥
(আদিলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ)

আর মানুষের মানবতা, তার শক্তি, তার ঐশ্বর্যের বিনাশ নেই; তার আত্মপ্রতিষ্ঠার যাত্রা অপ্রতিহত ভাবে চলেছে, কোন ক্ষমতাই তাকে প্রতিরোধ করতে পারে না। ভাগবতকার বলেন,

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে,
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেহনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ॥
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ,
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্॥

(আমি যাদের পতি, আত্মা, পুত্র, সখা, গুরুজন, সুহৃদ এবং অভীষ্টদেব, আমার সেই নিত্যধামবাসী একান্ত ভক্তদের ভোগ্যবস্তু কখনও বিনষ্ট হয় না, এবং আমার কালচক্র তাদের গ্রাস করতে অসমর্থ।)

ভাগবতের আরও একটি শ্লোকে কৃষ্ণ গোপীদের বলছেন,

ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

[তোমাদের সংযোগ নির্দোষ, অর্থাৎ কামময়রূপে প্রতীয়মান হ'লেও নির্মল প্রেমময়। তোমরা দুর্জয় গৃহ-শৃঙ্খল সম্যকরূপে ছিন্ন করে আমাকে ভজন করেছ, অর্থাৎ পরমানুরাগে আত্মসমর্পণ করেছ; তোমাদের সাধুকৃত্য দেব-পরিমাণে আয়ুলাভ করেও আমি শোধ করতে পারব না। তোমাদের সৌশীল্য দ্বারা তার প্রতিকার হোক।]

ভাগবতের উদার মানবিক পরিবেশে এমনিভাবেই মানুষের মানবতা ও ঐশ্বর্য নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে; আর তার আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগে সংগে ভগবানকেও মানুষের কল্পনার আকাশ থেকে ক্রমে ক্রমে দূরে সরে যেতে হয়েছে। আর ভগবানের পরিত্যক্ত শূন্য আসনে মানুষ নিজেকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে পরিপূর্ণ গৌরবে ও ক্ষমতায়, আর যেখানে মানুষের জয়, সেখানে অবশ্যম্ভাবীরূপে ভগবানের অর্থাৎ প্রাকৃতিক শক্তি সমূহের (কারণ, এদের লীলাবৈচিত্র্যের নিয়ন্ত্রণ কর্তারূপেই ভগবান কল্পিত হয়ে থাকেন) পরাজয়। ভাগবতের এই ঐতিহ্য বহন করে চৈতন্যদেব এবং তাঁর সমকালের বৈষ্ণবগণ মানুষকেই পুনর্বার সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হন। সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিবেশে মানুষের মানবতা ও তার সমস্ত অধিকার যেভাবে অস্বীকৃত ও লাঞ্ছিত হচ্ছিল, মধ্যযুগের সাধকগণ তার অশ্রদ্ধেয় পরিণতি থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। মানুষকে রক্ষা করার আকুতির মধ্যেই চৈতন্যদেব এবং তাঁর সমকালীন সাধকদের পারস্পরিক মিলন ও ঐক্য।

অবশ্য সমাজে স্থায়ী সমন্বয় সাধনকার্যে চৈতন্যদেব এবং চৈতন্যবাদ কতখানি সার্থক হয়েছিলেন অথবা তাঁর ব্যর্থতার কারণ কি, তার বিচারক্ষেত্র স্বতন্ত্র। তত্ত্বের দিক থেকে তাঁর এবং তাঁর পার্ষদগণের উদ্দেশ্য কি ছিল, তাই আমাদের আলোচ্য। তবে মধ্যযুগের সাধনার ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা থেকে চৈতন্যদেবের ব্যর্থতার কারণ কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে।

তিন

চৈতন্যদেব এবং তাঁর মতবাদ স্থায়ীভাবে কোন সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে না পারলেও সাময়িকভাবে বাংলার সমাজ-জীবনকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিলেন।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, তাঁর সমকালীন সমাজ-পরিবেশ ছিল পরস্পর-বিরোধী সংস্কার-সংস্কৃতি ও ধর্মমতের সংঘাতে বিপর্যস্ত, এই বিশৃঙ্খলা বৃহত্তর জনসাধারণের জীবন এবং সাধারণভাবে মানুষের মানবতা ক্রমাগত উপেক্ষিত ও অস্বীকৃত হয়ে চলছিল। আর এই বিশৃঙ্খলার কবল থেকে পরিত্রাণ

লাভ করে একটা কল্যাণধর্মী আদর্শকে অবলম্বন করে জীবনকে সৃষ্টি করার জন্য মানুষের মন ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল; আর সামাজিক উচ্চবর্ণের মনোভাবের বিরুদ্ধে সামাজিক নিম্নবর্ণের মনোভাব কিরূপ প্রবল এবং বিদ্রোহাত্মক ছিল, তাও মধ্যযুগীয় সাধকদের জীবনী ও মতবাদ থেকে আলোচিত হয়েছে।

কিন্তু এ ছাড়াও আরও একটি শক্তি সংগোপনে সমাজের অন্তরে ক্রিয়া করে চলছিল, যা ক্ষীণ হলেও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। সে হলো সমাজ দেহে একটি বর্দ্ধিষ্ণু বণিক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব। ব্রাহ্মণ্য সমাজ ছিল পুরোহিত প্রধান; সুতরাং সেখানে বণিকদের প্রাধান্য স্বীকৃত হতে পারে না। এমন কি মুসলমান সমাজও, তার অন্তর্নিহিত গণতান্ত্রিক আদর্শের স্বীকৃতি সত্ত্বেও ছিল পুরোহিত প্রধান, কারণ মুসলমান রাজা ছিলেন একাধারে সীজার ও পোপের সমন্বয়। সুতরাং সেখানেও সামাজিক বিধিনিষেধ ও তারতম্য আত্মপ্রকাশ করে; সদ্বংশীয়রাই প্রধানত রাষ্ট্রীয় উচ্চপদের অধিকার ভোগ করত; আর নিষ্ঠাবান রাজারা (যেমন বলবান নীচকুলের হঠাৎ বড়লোকদের উপঢৌকন পর্যন্ত প্রত্যাখান করতেন। (১৬)

অথচ তখন যে শুধু বাইরের মুসলিম দেশগুলির সংগেই ভারতের সংযোগ স্থাপিত হয়েছে তা নয়, ফিরিঙ্গি বণিকরাও এদেশে আসতে আরম্ভ করেছে, এবং পারস্পরিক আদান-প্রদান ও বিনিময় আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। চৈতন্যদেবের পার্ষদ নরহরি সরকার ফিরিঙ্গিদের সংগে কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন বলে অনুমিত হয়েছে। এই সংযোগের মাধ্যমে একটা নয়া মানবতার প্রতিষ্ঠার ভিত্তি রচিত হয়ে চলছিল; অর্থাৎ সমাজতাত্ত্বিকরা সংস্কৃতির বিকাশ ও ঐশ্বর্যময় বিবর্তনের জন্য মাঝে মাঝে পরিবেশের রূপান্তর এবং বিভিন্ন দেশ ও জাতির সংযোগের প্রয়োজনীয়তার উপর যে আলোকপাত করেন, চৈতন্য আমলে সেই পরিবেশ রূপান্তরিত হয়ে চলছিল। সংস্কৃতির পক্ষে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ না থেকে বিশ্বজনীন হওয়ার সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত হয়ে চলছিল। ইতিহাসের এই কার্যে বণিক সম্প্রদায়ই তার সহায়করূপে দেখা দেয়। অথচ এই সম্প্রদায়ের কোন সামাজিক মর্যাদা নেই, কোন প্রতিপত্তি নেই;

---

১৬ Balban....never encouraged upstarts and on one occasion refused a large gift from a man of low origin who had amassed fortune by means of usury and monopolies." ঈশ্বরী প্রসাদের History of Mushim Rule in India. পৃঃ ২৪৪

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধানদাতাদের নিকট তারা লাঞ্ছিত। সুতরাং সমাজের নিকট ন্যায়বিচার লাভের চেষ্টা এবং মানুষ হিসেবে তাদের আত্মমর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তা, এবং সমাজের প্রচলিত বিধি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করা অসম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সুরের সংগে তাদের অথবা তাদের সুরের সংগে সাধারণ মানুষের সুরের মিলন হয়ে থাকা বিচিত্র নয়।

(এমনি আবহাওয়ায় সমাজের সর্বশ্রেণীর লোকের জন্য চৈতন্যদেব তাঁর বাণী প্রচার করেন। স্বভাবতই অধস্তন সামাজিক বর্ণগুলির মধ্যে তা নতুন আশা উদ্দীপনা, ন্যায় বিচারের প্রত্যাশা এবং জীবনকে উপলব্ধি করার প্রেরণা আনে, আর সমাজের সমস্ত কল্যাণধর্মী মানুষের মধ্যে স্থাপন করে সুস্থ সজীব সৃষ্টিশীল জীবনাচরণের আদর্শ।) জাতিভেদ ও বর্ণপ্রথার শাসনে যারা ছিল মুহ্যমান আর সাম্প্রদায়িক ভেদবিচারের কলরবে যারা ছিল অবজ্ঞাত, চৈতন্য-মতবাদ তাদের সকলকে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক শাসন অত্যাচার থেকে দিল মুক্তি ; যারা প্রচলিত সংস্কার সংস্কৃতির সংঘাতের মারাত্মক কুফল ও যুক্তিহীনতা উপলব্ধি করেও যথাযথ সমন্বয়ের ভিত্তি খুঁজে পাচ্ছিল না, তিনি তাদের যোগালেন বলিষ্ঠ আদর্শগত ও তত্ত্বগত ভিত্তি। আর সমস্ত ধর্ম ও মতবাদের উর্ধ্বে মানুষকে সংস্থাপন করে তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের মিলনভূমি সৃষ্টি করলেন। সংকীর্ণ ভারতীয় সমাজের উপর বহিরাগত বিভিন্ন ভাবধারার আঘাতে, এবং বিভিন্ন দেশের বিচিত্র মানুষের সংযোগে, যে পুরানো ভারতীয় সমাজের মৃত্যু হয়ে নতুন সমাজের, পুরানো ব্যক্তি-সত্তার মৃত্যু হয়ে যে নতুন ব্যক্তি-সত্তার, জন্মের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, চৈতন্যদেব তারই সার্থক সৃষ্টির পথ দেখালেন। পুরানো ভাবাকাশের পরিবর্তে নতুন ভাবাকাশের আবির্ভাব হলো ; অর্থাৎ, মানুষ নতুন চোখে জীবনের ও পৃথিবীর দিকে তাকালো। এই কথার নিগূঢ় তাৎপর্য এই যে, এর ভেতর দিয়ে মানুষ ফিরে পেল নিজেকে। যে সাংস্কৃতিক নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতন মানুষকে গ্রাস করে ফেলেছিল, তার কলুষ থেকে সে মুক্তি পেল ; অর্থাৎ মানুষ তার আত্মপ্রত্যয় ফিরে পেল। চৈতন্যদেব-সৃষ্ট এই ভাবাকাশের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা যাই থাক না কেন, তার লক্ষ্য ছিল আশা-আনন্দ-প্রচেষ্টার সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করা ; তাই, অল্পকালের মধ্যেই এর বিস্তৃতি হয়েছিল বিস্ময়কর।

বাঙালী সমাজের বড় এক অংশ বিশেষভাবেই চৈতন্যদেবের প্রভাব অনুভব করেছে, এবং অল্পকালের জন্য হলেও সেই প্রভাবের তরঙ্গে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল। ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে, ভাবের পরিমণ্ডলে, সমাজ-জীবনের পরিধিতে, সাহিত্যের মুক্ত আবহাওয়ায় মানুষ অনুভব করেছে এক নতুন সৃষ্টিশীল ভাবের অনুপ্রাণনা। তাঁরই জীবনের মাধ্যমে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের সংকীর্ণ সীমা চিরকালের জন্য ভেঙে যায়, এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাংস্কৃতিক জীবনের সংগে বাংলার জীবন সম্পৃক্ত হয়। সে যুগের মানুষ চৈতন্যদেবকে দেখেছে সমস্ত দিক থেকে অর্থাৎ সমস্ত দৈহিক ও মানসিক বৃত্তির দিক থেকে পরিপূর্ণ এক মানব হিসেবে ; সমস্ত বিরোধের ঊর্ধ্বে তাঁর অধিষ্ঠান, সমস্ত ঘাতপ্রতিঘাত সেখানে অপহৃত ; প্রচলিত সমস্ত পরস্পর বিরোধী সংস্কার-সংস্কৃতি ও ধর্মমত তাঁর মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয়ে পরিণতি লাভ করেছে। তাঁর মতবাদ ও চরিত্রের এই দিকটা তাঁর যুগের মানুষকে এতই মুগ্ধ ও প্রভাবিত করেছিল যে, উড়িষ্যায় বহু সরল বিশ্বাসী বৌদ্ধ তাঁকে বুদ্ধের অবতাররূপে গ্রহণ করে তাঁর মতবাদে আশ্রয় গ্রহণ করে। (১৭) সেকালের মানুষ তাঁকে দেখেছে সমস্ত কল্যাণ ও শ্রেয়োধর্মের প্রতীক হিসাবে, যিনি সামাজিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে সৃষ্টির পথ দেখাতে পারেন, জীবনের অন্ধকারকে আলোর পথ দেখাতে পারেন। অন্যকথায়, তাঁকে তারা গ্রহণ করেছে আদর্শ চরিত্র হিসেবে। আর স্বভাবতই, ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে মানুষ এই আদর্শ চরিত্রকে নিজের জীবনে রূপায়িত করার স্বপ্ন দেখেছে। কারণ, তাদের মনে হয়েছে, চৈতন্যদেবকে অনুকরণ করার অর্থ জীবনে কল্যাণবুদ্ধিকে প্রতিষ্ঠিত করা। আর এই অনুরাগ স্পৃহাই, তাঁর ভাবে ভাবিত হওয়ার, অনুপ্রাণিত হওয়ার, আগ্রহ-ই অনুরাগ-রসে সিঞ্চিত হয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায়, অন্তরঙ্গ ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়। স্বভাবতই বিশ্বাসপ্রবণ মনে তিনি স্থানলাভ করলেন ভগবান রূপে, আর তারাও তাদের বাস্তব জীবনে এই সজীব ভগবানকে সৃষ্টি করার জন্য সক্রিয় সাধনা আরম্ভ করে।

কিন্তু, দুঃখের সংগে স্বীকার করতেই হবে, নবতর আদর্শে প্রেম-দর্শনের ভিত্তিতে মানুষের জীবনকে সংগঠিত করার প্রচেষ্টা চিরকাল শুধু প্রচেষ্টাই থেকে যায়, কোন সময়েই তা সফলতায় পরিপূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

১৭ বিমান বিহারী মজুমদার, চৈতন্য চরিতের উপাদান, পৃ ৫২২, ৫২৮

চৈতন্যদেব জাতিধর্মবর্ণের ঊর্ধ্বে সংস্থাপিত এক নব মানবতা সৃষ্টির কথা চিন্তা করেছিলেন সত্য, কিন্তু, তিনি তাঁর এই আদর্শকে প্রয়োগ করেন ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে, সমাজগতভাবে নয় (তিনি ব্যক্তিগত ভাবে দু'একজন মুসলমানকে শিষ্যত্বে বরণ করে এক পংক্তিতে বসিয়ে অন্যান্যদের সংগে আহারাদি করিয়েছিলেন, কিন্তু সমাজগতভাবে মুসলমানদের হিন্দুদের পংক্তিতে বসাতে পারেন নি)। আদর্শ তাই গোড়া থেকেই ছিল খণ্ডিত। তাছাড়া, তিনি স্বয়ং এক অপ্রতিরোধ্য স্ববিরোধে জর্জরিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। তিনি অনেক শিষ্য-ভক্তকে বিষয়-কর্মে নিমগ্ন থেকে কৃষ্ণ-সেবা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, অথচ স্বয়ং করলেন সন্ন্যাস। আর সন্ন্যাসী হওয়ার পরেও সন্ন্যাস গ্রহণ সঙ্গত হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে তাঁর মনে সংশয় উদিত হতো। ফলে, তাঁর জীবনাচরণের মধ্যেই তাঁর উক্তি "নিজে আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও" নিশ্চিতরূপে খণ্ডিত, সীমিত ও বিভ্রান্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ, আদর্শ ও কর্ম, ভাব ও বিষয়, অধ্যাত্ম ও জীবন একই অখণ্ড সত্তায় মিলিত হতে পারেনি। দু'টি অসম্পৃক্ত সত্তারূপে এরা পরস্পরকে খণ্ডিত করেছে। তথাপি তাঁর লক্ষ্য ছিল এক নব মানবতা।

কিন্তু চৈতন্যদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বৈষ্ণব আদর্শের দুর্বলতা মারাত্মকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। চৈতন্য-শিষ্যরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়লেন; বৃন্দাবনের গোস্বামীদের মাধ্যমে বৈষ্ণব-সমাজে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলো, এবং ব্রাহ্মণ্য সমাজের সমস্ত ভেদবিচার বৈষ্ণবদের মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করলো; গোস্বামীরা হিন্দু শাস্ত্রসম্মত আচার আচরণ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলেন, এমন কি লোকায়ত ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা না করে শুধুমাত্র সংস্কৃতে বৈষ্ণব শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করতে থাকেন। চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণবদের মধ্যে চৈতন্যদেবের অনন্থকরণীয় উদারতা এবং সমন্বয়-ধর্মী আদর্শ ও জীবিত ছিল না; তাঁরা ক্রমে ক্রমে ভীষণ রকমের মুসলমান বিদ্বেষী হয়ে উঠেন। অর্থাৎ, যে আদর্শের লক্ষ্য ছিল সর্বধর্মের সমন্বয় এবং নব মানবতার সৃষ্টি, তা অল্পকালের মধ্যেই এক সাম্প্রদায়িক মতবাদ ও আদর্শে পরিণত হয়। আর ব্যক্তিগত আচরণের ক্ষেত্রে ইহা শুধমাত্র একটা নিষ্প্রাণ ভংগী বা পোজ-এ পরিণত হয়। বৈষ্ণবরা সংকীর্ণ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে গেলেন।

কিন্তু, তা সত্ত্বেও, চৈতন্য-মতবাদের সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও গভীর তরঙ্গ

অন্তর্ভূত হয় বাংলা কাব্য-সাহিত্যে। চৈতন্য-পরবর্তী যুগে চৈতন্য-মতবাদে বিশ্বাসী অসংখ্য হিন্দু কবি ছাড়াও আমরা যে কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলমান কবিকে পেয়েছি তা নয়, সাহিত্যে চৈতন্য প্রভাব হয়েছে জাতীয় জাগরণের মত বিস্ময়কর। প্রাক-চৈতন্য যুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল পৌরাণিক ও আধা পৌরাণিক কাহিনী, এবং অসংখ্য লৌকিক দেবদেবীর মামুলী উপাখ্যান; সাহিত্যের উপজীব্য ছিল অ-বাস্তব, অ-সত্য কাহিনী; আর এই অসম্ভব কাহিনীকে অবলম্বন করেই যা কিছু বাস্তব ভাব ও অনুভূতি প্রকাশের চেষ্টা হতো। চৈতন্যের প্রভাবে এই অবাস্তব কাহিনীর প্রাচীর ভেঙে যেতে আরম্ভ করে, এবং সাহিত্য বাস্তব পরিবেশের মধ্যে বিচরণ করতে আরম্ভ করে; অতি-প্রাকৃত শক্তির বন্ধন থেকে সাহিত্য ধীরে ধীরে মক্তিলাভ করতে থাকে। সদা বিকাশমান সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে ধৃত মানুষকে (চৈতন্য-জীবন কাহিনী, পদকর্তাদের ব্যক্তিগত ভাবানুরাগ, ইত্যাদি) এবং তার অনুভূতি-অনুরাগকে সে রূপায়িত করতে আরম্ভ করে, এবং বাস্তব মানুষের সত্য ইতিহাস সমস্ত অ-সত্য কাহিনীকে দূর করে পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সাহিত্য নতুন সৃষ্টির পথে বাঁক নেয়।

ভারতের মধ্যযুগের সাধকদের সমন্বয়ধর্মী ও সৃষ্টিধর্মী সাধনার ধারা, বড়ু চণ্ডী-দাস ও বিদ্যাপতি সৃষ্ট মধুর রসাশ্রিত কাব্য-ঐতিহ্য, এবং মাধুর্যভাবের আলোকে জীবনের দিকে তাকানোর দৃষ্টিকোণ চৈতন্যদেবে পরিণতি লাভ করেছিল। আর চৈতন্যদেব তাঁর কর্ম ও ভাবজীবনের মাধ্যমে আবার প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবনকে রূপান্তরিত করে জীবনের ও সৃষ্টির নতুন পথের ইংগিত দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর জীবন, কর্ম ও মতবাদকে আশ্রয় করে তাঁর সমকালীন ও পরবর্তী সাহিত্যের ভাবাকাশ সৃষ্টি হয়। চৈতন্য-ভক্তরা স্বল্পকালের মধ্যেই দুটো প্রধান ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়, এক বৃন্দাবনের গোস্বামী প্রবর্তিত মতবাদ, যার লক্ষ্য চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা; আর নবদ্বীপে উদ্ভাবিত মতবাদ, যার লক্ষ্য চৈতন্যদেবকেই চরম ও পরম আরাধ্যরূপে উপাসনা। এই মতবাদের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা আমাদের লক্ষ্য নয়, সাধারণভাবে চৈতন্যদেবের মধ্যে সে কালের বিরাট এক জনসমষ্টি কোন সত্যকে দেখতে পেয়েছে, সে সত্যকে জীবনে কি ভাবে তারা গ্রহণ করেছে, আর প্রেমরসের অন্তর্নিহিত সুরটিই বা কি তার আলোচনাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

এই দুটো বিশেষ সাধন পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য যাই থাক না কেন চৈতন্য মতবাদে যারা আশ্রয় গ্রহণ করে তারা তার মধ্যে একটা নতুন সংশ্লেষের সন্ধান পায়। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, প্রচলিত সংস্কার-সংস্কৃতির কলুষ ও মলিনতা দূর করতে গিয়ে বৈষ্ণব-ধর্ম স্বয়ং নতুন মলিনতা সৃষ্টি করে থাকলেও তার প্রধান সুরটি ছিল আশার, উদ্দীপনার; মানুষের হৃত বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করে নতুন বিশ্বাসে নতুন আদর্শে জীবনকে সমাজকে সৃষ্টি করার অনুপ্রেরণায়ই ইহা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিল। সেযুগের মানুষ এই অনুপ্রেরণার তাৎপর্য অতি সহজেই উপলব্ধি করেছিল। বলরাম দাস তাঁর একটি চৈতন্যবন্দনায় বলছেন

কলিযুগ-মত্ত-মতঙ্গজ-মরদনে
কুমতি-করিণি দূর গেল।
পামর দুরগত নাম-মোতি শত-
দাম কণ্ঠ ভরি দেল॥
অপরূপ গৌর বিরাজ।
শ্রীনবদ্বীপ-নগর-গিরি-কন্দরে
উয়ল কেশরি-রাজ॥
সংকীর্ত্তন-রণ হুঙ্কৃতি শুনইতে
দুরিত দীপি-গণ ভাগি।
ভয়ে আকুল অণিমাদি মৃগীকুল
পুণবন্ত গরব তেয়াগি॥
ত্যাগ যাগ যম তিরিথি বরত সম
শশ জম্বুকি জরি যাতি।
বলরাম দাস কহ অতয়ে সে জগ মাহ
হরি-ধনি শবদ খেয়াতি॥

(শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ৬১৭ নং পদ)

[কলিযুগরূপ মত্ত হস্তির বিনাশ হওয়ায় কুবুদ্ধিরূপ হস্তিনী পালিয়েছে; (শ্রীগৌরাঙ্গ) নামরূপ মুক্তামালা অধম ও গরীব জনসাধারণকে কণ্ঠ ভরে দিয়েছেন। অপূর্ব গৌরাঙ্গ বিরাজ করছেন; (যেন) নবদ্বীপ নগরের পর্বত গুহায় সিংহশ্রেষ্ঠ উদিত হয়েছেন। কীর্তন-রূপ যুদ্ধের হুঙ্কার শুনে' পাপরূপ নেকড়ে বাঘ সকল পলায়ন করেছে; অনিমা প্রভৃতি মৃগীসমূহ ভয়ে আকুল। পুণ্যবান গর্ব ত্যাগ করেছেন। দান, যজ্ঞ, সংযম, তীর্থ ও ব্রতস্বরূপ (ক্ষুদ্র প্রাণী) শশক ও শৃগাল বিরক্ত হয়েছে; বলরাম দাস বলেন, এই জন্যই তো জগতে হরি-ধ্বনি শব্দ প্রচারিত হয়েছে।] অকল্যাণ বুদ্ধি সংস্কার-সংস্কৃতি ও জীবনাচরণের আদর্শ যা সমাজে ভেদবিচার বাঁচিয়ে রাখে, মানুষে মানুষে বিভেদ-বৈষম্যকে সজোরে ঘোষণা করে, আত্মসর্বস্ব সংস্কৃতি ও পাণ্ডিত্যাভিমান যা মিলনের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে সর্বদা বিরাজ করে; প্রাণহীন অনুষ্ঠান যা জীবনকে সৃষ্টি করার পরিবর্তে নানাভাবে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে চৈতন্য-দেবের আবির্ভাবে তা সমস্ত অন্তর্হিত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি কল্যাণের

আদর্শে নতুন সংজ্ঞাবে পৌঁছানোর সন্ধান দিয়েছেন ; সৃষ্টির নতুন আলোকের ইংগিত দিয়েছিলেন ; তাই সমন্বয়-দৃষ্টির নিকট বিভেদ-দৃষ্টির পরাভব (অন্তত ভক্তের কাছে) অবশ্যম্ভাবী। শেখরও একটী কবিতায় বলেছেন,

প্রেম-জল মহাবন্যা পৃথিবী করিল ধন্যা
ত্রিভুবন চলিলা বাহিয়া।
তার্কিক পাষণ্ডী যত পলাইল হৈয়া ভীত
অভিমান নৌকায় চড়িয়া॥

(শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, ২১৮৮নং পদ)

এই প্রেম-বন্যা দ্বারাই তিনি সমস্ত সামাজিক, আত্মিক, মানবিক ব্যবধান ঘুচিয়ে দেন। এই দৃষ্টি থেকেই মন বাইরে প্রসারিত হয়, বাহির মনে আশ্রয়লাভ করে, ঘরে-বাইরের পার্থক্য অবলুপ্ত হয়, আত্মপর চেতনার হয় মৃত্যু ; আর সমস্ত বিধি-নিষেধ, বাধা-বিপত্তি, ভেদবিচার ও খণ্ডিত জীবনবোধ অতিক্রম করে একটা অখণ্ড সত্তা আত্মপ্রকাশ করে, যা শুধুই প্রেমময়। এই দৃষ্টি নিয়েই চণ্ডীদাস বলেন

ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে পারিনু বঁধু তোমার পিরীতি॥

এই অভেদ-দৃষ্টি আধ্যাত্মিক সাধন পথে আরও গভীর ও সূক্ষ্ম পর্যায়ে উন্নীত হয়, যেখানে নারী-পুরুষ বৈষম্যও অবলুপ্ত ; বি-সম ও খণ্ডিত অভিব্যক্তির ঊর্ধ্বে স্থাপিত অখণ্ডতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। নয়নানন্দের একটী পদে আছে

পুরুষ নাচে প্রকৃতি ভাবে
পুরুষ ভাবে যুবতী।
যার যেই ভাব পাইয়া স্বভাব
নাচে কত শত জাতি।

(শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, ২০৬৮নং পদ)

এই আধ্যাত্মিক ভাবকে বাস্তব সমাজ সম্পর্কের মধ্যে স্থাপন করলে তার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, প্রচলিত সমাজ প্রথা, শাস্ত্র শাসন এবং ভেদবৈষম্যের বিধান থেকে

মুক্তিলাভ করা, এবং বন্ধনহীন, সীমাহীন স্বাধীনতার আস্বাদ ভোগ করা। বৈষ্ণবদের মধ্যে যে এই আদর্শ সর্বদা জাগ্রত ছিল তা চৈতন্যদেবের জীবন ও কর্মের মধ্যে অভিব্যক্ত রয়েছে। তাঁর জীবন আলেখ্যকে যাঁরা বাস্তব ও ভাব জীবনের অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও সেই একই লক্ষ্য, একই আকৃতি বিরাজমান ছিল।

প্রেম-রস দিয়ে সমস্ত ব্যবধানকে, সমস্ত ফাঁককে ভরে দিয়ে যে অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, তা নিরন্তর আনন্দময়। চৈতন্যদেবের দেহ কারুণ্য দিয়ে গঠিত, তিনি কারুণ্যের অবতার, ইত্যাদি ভাবে বৈষ্ণব পদকর্তাগণ তাঁর স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। অন্য কথায় প্রকাশ করতে হলে বলা যেতে পারে, চৈতন্য-দেবের মধ্যে তাঁর অনুরাগী ভক্তবৃন্দ সমস্ত পূর্ণতা, সমস্ত আনন্দ, সমস্ত রূপের একটা অখণ্ড প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন। রাধামোহন ঠাকুর তাঁর একটি চৈতন্য-বন্দনায় বলেছেন

নবদ্বিপ-চাঁদ চাঁদ জিনি সুন্দর
নাগর বিদগধ-রাজ।
আনন্দ-রূপ অনুপম গুণগণ
আনন্দ-বিতরণ কাজ॥

(শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, ১৯৩২নং পদ)

নানাবিধ ভেদ-বৈষম্যে উৎপীড়িত ও বিভ্রান্ত সমাজে এই আনন্দ-রস পরিপ্লুত জীবনবাদের ঘোষণাই ছিল সমাজ-বিধায়কদের বিরুদ্ধে কল্যাণকামী মানুষের প্রত্যুত্তর। সাধারণ পরিচিত সমাজের মধ্যে এই পূর্ণতার স্বাক্ষর নেই, আনন্দ, মাধুর্য, প্রীতির স্পর্শ নেই ; পরিচিত সমাজ ও পৃথিবীকে রূপান্তরিত করেই তবে আনন্দ ও পূর্ণতাকে সৃষ্টি করা সম্ভব। স্বভাবতই এর অভিব্যক্তি ও আকৃতি বাস্তব সমাজ পৃথিবী পার হয়ে স্বপ্নময় ভাবময় আদর্শ সমাজের দিকে, আদর্শ জীবনের দিকে অগ্রসর হয়। অর্থাৎ বাস্তবকে অধ্যাস (illusion) দ্বারা সৃষ্টি করতে চায়। প্রত্যক্ষ জীবনের সমস্ত অপূর্ণতা, কলুষ, বেদনা, বঞ্চনা ও হতাশাকে অধ্যাসের পূর্ণতা, আনন্দ, রূপ-রস-মাধুর্য দিয়ে ভরিয়ে দিতে চায়, বাস্তবের ক্ষয় ও খণ্ডতার পরিবর্তে অধ্যাসের সৃষ্টি ও অখণ্ডতাকে জীবনের সম্মুখে তুলে ধরে। তাদের অধ্যাসের একটা সামগ্রিক সজীব প্রতিফলন চৈতন্য-জীবনের মধ্যে দেখতে পেয়েছে তাঁর অনুরাগী ভক্তবৃন্দ। তৎকালীন

শৃঙ্খলাহীন শ্রেয়বোধহীন সমাজের বিরুদ্ধে অখণ্ড চৈতন্য-জীবনই তাদের তুল্য প্রত্যুত্তর। অস্বীকৃত, বঞ্চিত বর্তমানকে কি ভাবে অধ্যাসের পূর্ণতা দ্বারা মানুষ ভরে দিতে চেয়েছে, তার পরিচয় আছে শেখরের একটি পদে। তিনি বলেছেন,

হাটের হাটুয়া ভকত নাটুয়া
পসার-মহিমা জানি।
দৈন্য-দান দিয়া সে প্রেম আনিয়া
সদা করে বিকিকিনি॥

দিবা রাত্রি নাই বাজার সদাই
যে যায় সে প্রেম পায়।
প্রেমের পসার করিল বিথার
শচীর দুলাল রায়॥
ভাঙ্গিল আকাল মাতিল কাঙ্গাল
খাইয়া ভরিল পেট।
দেখিয়া শমন করয়ে ভাবন
বদন করিয়া হেট॥
জরা মৃত্যু নাই আনন্দ সদাই
শোক ভয় নাহি হয়।
আশা ঝুলি করি শেখর ভিখারী
বাজারে মাগিয়া খায়॥

(শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, ২১৯৯ নং পদ)

এই পূর্ণতা একমাত্র কলুষিত সামাজিক বিধিব্যবস্থা বিলুপ্ত করে আদর্শ সমাজেই সার্থক হতে পারে; প্রত্যক্ষ জীবনের ভেদ-বৈষম্যের অনুশাসন থেকে মানুষ যখন মুক্ত হবে, তখনই তার পক্ষে এই ভাব-জগতের মধুর আবহাওয়ায় অবগাহন করা সম্ভব; আর সমাজ সংগঠনের বিধিব্যবস্থা যখন মানুষের ভাব-জীবনের স্বাভাবিক অভিপ্রকাশকে রোধ করে দাঁড়াবে না, তখনই তার পক্ষে সীমাহীন চাওয়া, সীমাহীন পাওয়া এবং সীমার বন্ধনহীন আনন্দের রসে জীবনকে সমাজকে সিঞ্চিত করা সম্ভব। এই অখণ্ড অসীম ভাব ও আনন্দের সন্ধান

সে যুগের মানুষ পেয়েছে চৈতন্য চরিত্রের মধ্যে ; আর তাই তাঁকে জীবনে উপলব্ধি অথবা প্রতিষ্ঠিত করার আকূতি। কেননা, তাঁকে উপলব্ধি করার অর্থ জীবনে অখণ্ড আনন্দকে, অসীম মুক্তিকে উপলব্ধি করা। মানুষ সর্বগুণের আধার এবং সমস্ত কল্যাণের প্রতিমূর্তি স্বরূপ ভগবানের কল্পনা করে তাঁকে জীবনে সৃষ্টি করার সাধনা করে ; তেমনি চৈতন্যদেবের মধ্যে এক সীমাহীন সম্ভাবনার আলোকের সন্ধান পেয়ে মানুষ তাঁকেই জীবনে উপলব্ধি করার সাধনায় ব্যাপৃত হয়। মানুষের লুপ্ত আত্মপ্রত্যয় এবং জীবন সম্পর্কে বলিষ্ঠ বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা ছাড়াও তিনিই সেকালে মানুষের (বিশেষত বাংলার) পথ-খোঁজে-না-পাওয়া সঞ্চিত শক্তি ও হৃদয়াবেগকে নব মানবতার পথে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। আর বৈষ্ণব সাধনায় জীবনে ভগবানকে উপলব্ধি করার পথ হলো প্রেমের পথ , তেমনি, চৈতন্যভাবধারা এবং চৈতন্যদেবকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার পথও প্রেমেরই পথ। সুতরাং তাঁর সম্পর্কে তাঁর ভক্ত ও পার্ষদদের আচরণ মুখ্যত প্রেমের আচরণ। গৌর নাগরীভাবের সাধক বৈষ্ণবদের সম্পর্কেই যে একথা সত্য তা নয়, সমগ্রভাবে বৈষ্ণব গীতিকারদের সম্পর্কেও সমভাবে সত্য। প্রচলিত সামাজিক ও ব্যক্তিক আচরণ যেখানে ছিল নানা ভেদবিচার ও বিধিনিষেধের সীমায় সীমিত, সেখানে সীমা-অতিক্রম-করা প্রেমপূর্ণ সামগ্রিক আচরণই ছিল কল্যাণকামী মানুষের প্রত্যুত্তর। এই সাধনা এবং আচরণ দ্বারা যে শুধু ভগবান বা আদর্শ পুরুষকেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তা নয়, জাতি-ধর্ম -গুণ নির্বিচারে সমস্ত মানুষকে উপলব্ধি করারও এই পথ। এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হওয়ার আবেগ খুব তীব্রভাবেই অনুভূত হয়েছিল মনে হয় , চৈতন্য -বিরহ সম্পর্কিত গীতিগুলো তার নিদর্শন। তাই বলা চলে, চৈতন্যদেবের ভাবাকাশের মধ্যে তাঁর ধর্ম ও আচরণ সংশ্লেষের মধ্যে তাঁর কালের মানুষ একটা ভাবগত মুক্তির আস্বাদ লাভ করেছিল। আর বড়ু চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি চৈতন্যদেব-সৃষ্ট সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেই তারা বহন ও প্রসারিত করেছেন।

চৈতন্য-পূর্ববর্তী,-সমকালীন এবং-পরবর্তী গীতিকবিতা প্রধানত প্রেমের কবিতা। তাঁর পূর্বযুগের এবং সমকালের কবিতার ন্যায় তাঁর পরবর্তী কালের কবিতার মধ্যেও একটা সুতীব্র বেদনার সুর, না-পাওয়ার দুঃখ অনুরণিত হয়ে ওঠেছে। ইন্দ্রিয়ের সহজ প্রকৃতিই হলো ভোগের, সৃষ্টির প্রবৃত্তি, তাই

গীতিকারগণও জীবনের যা কিছু দেওয়ার আছে তা পরিপূর্ণভাবে ভোগ করার জন্য ব্যাকুল। কিন্তু, জীবন যে ভাবে সংগঠিত, সমাজ যে ভাবে সংগঠিত, তাতে হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয় না, ভোগের ও সৃষ্টির কামনা নিবৃত্ত হয় না। সুতরাং বৈষ্ণব গীতিকারদের ভাবাকাশ একটা অপরিসীম বেদনার রসে সিঞ্চিত। এই বেদনার চেতনা এতই গভীর ও ব্যাপক যে কবির দৃষ্টিতে মনে হয় সমগ্র প্রকৃতি তাঁর ব্যথায় ব্যাকুল হয়ে পড়েছে, এবং মানুষের দুঃখবেদনা হাহাকারের নীরব সাক্ষী-রূপে বিরাজ করছে। শেখর একটি গীতে বলছেন,

কহিয় কানুরে সই কহিয় কানুরে।
এক বার পিয়া যেন আইসে ব্রজ-পুরে॥
নিকুঞ্জে রাখিল মোর এই গলার হার।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে এক বার॥
এই তরু-শাখায় রহিল শারী শুকে।
এই দশা পিয়া যেন শুনে ইহার মুখে॥
এই বনে রহিল মোর রঙ্গিনী হরিনী।
পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বানী॥

(শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, ১৬৮১ নং পদ)

এই দুঃখ বিভিন্ন ঋতুর আগমন-নির্গমনের মধ্যে, বিভিন্ন ঋতুর বিভিন্ন রূপের মধ্যে মিশে রয়েছে, আর জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তা এমনভাবে ভরে রয়েছে যে জীবন দুঃসহ হয়ে ওঠেছে; আর কবি-মন মৃত্যুর মধ্যে সমস্ত সমস্যার সমাধান করার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ছে মাঝে মাঝে। কিন্তু পরক্ষণে বাঁচার আকুতি, তার জীবন নিজেকে সগৌরবে ঘোষণা করছে। গীতিকারগণ না-পাওয়ার দুঃখকে পাওয়ার আনন্দ দ্বারা পরিপ্লুত করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেছেন। বাস্তবকে অধ্যাস দ্বারা রূপান্তরিত করার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন। সমাজ বিধায়কদের শাসন এতই কঠোর এবং দৃষ্টি এতই প্রখর যে হৃদয়ের দুঃখের কথাও সরবে ঘোষণা করা যায় না, "চোরের রমনী"র মত নীরবে নিভৃতে নিজের দুঃখকে পালন করতে হয়। সমাজের এই দয়াহীন ব্যবস্থাই মানুষকে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রেরণা দেয়।

যে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে জীবনের স্বীকৃতি নেই, কোন দিকেই নিজেকে বিস্তৃত প্রসারিত করার অবকাশ নেই, সে সমাজে মানবিক এবং হৃদয়-সম্পর্কেরও অবনতি হতে বাধ্য। মানুষে মানুষে সহজ স্বাভাবিক সম্পর্কের মধ্যে সমাজের বিধান হোক, অর্থ হোক, একটা কিছু বাধা প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে থাকে। তখন হৃদয় হৃদয়ের সংগে কথা বলে না, প্রাচীরের মধ্যস্থতায় কথা বলে। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়'-এ একটি লাইন আছে "নিদ্ধন পুরুষে জেন কামিনি না ভাএ।" এই উক্তির তাৎপর্য থেকে মনে হয়, নারী পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে ইতিমধ্যেই টাকা এসে আপনার স্থান করে নিয়েছে, এবং এর মানদণ্ডেই ভালবাসার, হৃদয়ের সম্পর্ক নির্ধারিত হতে আরম্ভ করেছে। অর্থাৎ হৃদয় সম্পর্কের নিঃসন্দেহে অধঃপতন হয়ে গিয়েছে। চৈতন্যদেবের এবং তাঁর পরবর্তী আমলে এই অবস্থার অবনতি ছাড়া উন্নতি হয়নি, তা সহজেই অনুমান করা চলে। গোবিন্দদাসের একটি গীতে বলা হয়েছে

পতি অতি দুরমতি কুলবতি নারী।
স্বামি-বরত পুন ছোড়ি না পারি॥
তেঁ রূপ যৌবন একু নহ উন।
বিদগধ নাহ না হোয় বিনি পূণ॥

না মিলল কোই বনহিঁ বন আন।
অনুসরি মুরলি আয়ালুঁ এহি ঠাম॥
আয়লুঁ দূর পুরব নিজ সাধে।
একলি বোলি করহ জনি বাধে॥

(শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, ৬৩০নং পদ)

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু সম্পাদক এর ব্যঞ্জনা-গম্য অর্থ করেছেন, আমার পতি (প্রিয়তম নহে) নিতান্ত অসদ্বুদ্ধি; আমি কুলাঙ্গনা; (সুতরাং) পতিকুলের ও পিতৃকুলের ভয়ে আমাকে পাতিব্রত্য দেখাতে হচ্ছে। আমার মত সুন্দরী ও যুবতী নায়িকা অরসিকস্বামী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না; সুতরাং রূপ যৌবন সম্পন্ন সুরসিক নায়ক পেলে যে তার প্রতি অনুরক্ত হবে তাতে সন্দেহ কি? এ বনভূমিতে লোকের যাতায়াত নেই; তোমার বাঁশীর শব্দ শুনে যদি

কারও আসার আকাঙ্ক্ষা থাকত, তাও এখানে আর নেই ; আমি তোমার বাঁশীর শব্দে মোহিত ও আকৃষ্ট হয়ে এখানে এসেছি ; সুতরাং আমার সম্পর্কে তুমি যা খুসী করতে পার। মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য যে নায়িকা ছুটে এসেছে, তাকে নির্জনে পেয়েও যে অরসিক ও জড়বুদ্ধি পুরুষ তার বাসনা পূর্ণ করে না, সে নায়িকার প্রণয়ভাজন হতে পারে না।

এই চিত্রটিকে একদিকে সুস্থ সামাজিক সম্পর্কের এবং অন্যদিকে সুস্থ হৃদয় সম্পর্কের চিত্র বলে গ্রহণ করা যেতে পারে না। স্পষ্টতই এই সম্পর্কের মধ্যে অনেক কৃত্রিমতা অনেক আবিলতা প্রবেশ করেছে। অর্থাৎ মানবিক সম্পর্ক তার সত্যতা হারিয়ে অ-সত্য সম্পর্কে পরিণত হয়েছে। সুতরাং যারা জীবনকে সৃষ্টি করতে চায়, অখণ্ড আনন্দের মধ্যে সীমাহীন মুক্তির মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করতে চায়, তাদের পক্ষে এই অ-সত্য মানবিক ও সামাজিক সম্পর্কের অবসান কামনা করাও অপরিহার্য। আর বস্তুত বৈষ্ণব গীতিকারগণ তা করেছেনও। তাঁরা সার্থক প্রেম-লীলার যে চিত্র এঁকেছেন, তা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাই হোক অথবা একান্ত মানবিক নাগর-নাগরীর প্রেম-লীলাই হোক, তা এক আদর্শ আবহাওয়ায়, সর্বকলুষতামুক্ত সমাজ-সম্পর্কের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "ইহার আগাগোড়াই রাখালী কাণ্ড।" এখানে প্রচলিত সমাজের বিধিনিষেধ অচল, সমাজ-বিধায়কদের রক্তচক্ষু দৃষ্টিহীন, সর্বদিক থেকেই তা মুক্ত, বন্ধনহীন ; ধর্মগত ও সংস্কার-সংস্কৃতিগত ভেদবিচার এখানে অনুপস্থিত, বর্ণগত ব্যবধান অজানা, এবং দূরে সরিয়ে রাখে যে মনোভাব তাও দূরীভূত ; সবই এখানে নির্মল, প্রেমময়, আনন্দময়। এই আদর্শ ভাব-জীবনের অস্তিত্ব একমাত্র তখনই সম্ভব হতে পারে যখন ভাব-জীবনের ভিত্তি বাস্তব সামাজিক জীবন পরিপূর্ণ পাওয়ার আনন্দে ভরে উঠবে অর্থাৎ হিংসা, দ্বেষ এবং স্বার্থ ও অকল্যাণবুদ্ধি বিদূরিত হয়ে সমাজ-জীবনে মানুষের মানবতা স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হবে।[৮] এইরূপ আদর্শ সমাজ সৃষ্টি করা যে সম্ভব তা বৈষ্ণবরা একান্তভাবেই বিশ্বাস করতেন। জীব গোস্বামী সর্ববন্ধন বিমুক্ত প্রেমকে ভক্তি অপেক্ষাও পরম পুরুষার্থ বলে অভিহিত করেছেন। সুতরাং এ নিজ নিজ জীবনে অনুসরনীয় এক আদর্শ। বৈষ্ণব গীতিকারগণও এই আদর্শ আবহাওয়ায় অনুষ্ঠিত আদর্শ প্রেমের মোহময় চিত্র এঁকেছেন। শেখরের একটি গীতে আছে

মত্ত কোকিল গাওয়ে মধুর
অলিকুল তহিঁ অতি সুস্বর
মুরলী-ধনি ঘন গরজনি
নাচত মউর মাতিয়া।
বৃন্দাবন সুখদ ধাম
তহিঁ বিহরই রাই শ্যাম
তরুণীগণ বিমল-বদন
গাওত কত ভাতিয়া॥
ফুলি অনিল বহই ধীর
ফুলি চলই যমুনা তীর
ফুলি কানন ফুলি মদন
ফুলি রয়ণি মোহিনী।
ললিতা কহত মধুর বাত
কানু নাচহ রাই সাথ
অঙ্গ-ভঙ্গ সরস রঙ্গ
কহত শেখর মোহিনী॥

(শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, ২৭১৫নং পদ)

এই প্রেম আদর্শ ভাবপরিমণ্ডলে সংগঠিত রাধাকৃষ্ণের প্রেম হ'লেও তা একান্তভাবেই মানবিক। বৈষ্ণব ভাবধারা ভগবানকে মানবিক পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে ; রাধাকৃষ্ণের চলনবলন ইত্যাদি সাধারণ মানুষের মতই। তাই দেখা যায় "জল-পান করি কান মুখে দিয়া গুয়া পান" প্রেম-লীলায় নির্গমন করছেন আর এই প্রেম মানবিক বলেই সমস্ত গীতিকারই এই লীলার অংশীদার ; তাঁদের ছাড়া এ কখনও সার্থক হ'তে পারে না। তাঁরা রাধার বিরহে কখনও তাঁকে প্রবোধ দিচ্ছেন, কখনও বা তাঁর দুঃখে দুঃখিত হচ্ছেন, কখনও কৃষ্ণের বিরহে কৃষ্ণকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, কখনও কৃষ্ণলীলা-সুখভোগ না করতে পারায় দুঃখবোধ করছেন, কখনও রাধাকৃষ্ণের মিলন দেখে আনন্দে অভিভূত হচ্ছেন, কখনও নিজেদের রাধাকৃষ্ণ মিলনের সাক্ষীরূপে ঘোষনা করছেন। অর্থাৎ এই প্রেম লীলায় তাঁরা হচ্ছেন অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তাঁদের ছাড়া এ কখনও পরিপূর্ণ হতে পারে

না। তাঁদের উপস্থিতি এই পরিবেশকে আরও বেশী মানবিক গুণে পরিমণ্ডিত করেছে।

এই পরিবেশে প্রেমের স্বরূপ কি, হৃদয় সম্পর্কের স্বরূপ কি, তা বৈষ্ণব গীতিকারদের কথা দিয়েই প্রকাশ করা যাক। বলরামদাস বলেন, "ও বুক চিরিয়া হিয়ার মাঝারে আমারে রাখিতে চায়" (শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, ৬৭৭নং পদ); জ্ঞানদাস লিখেছেন,

হিয়ায় হিয়ায় লাগিব লাগিয়া
চন্দন না মাখে অঙ্গে।
গায়ের ছায়া বায়ের দোসর
সদাই ফিরয়ে সঙ্গে ॥
(শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, ৬৭৮নং পদ)

এবং

আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ
যখন যে দিগে পায়।
বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া
তখন সে দিগে ধায় ॥ (ঐ, ৬৮৭নং পদ)

গোবিন্দদাস লিখেছেন

হৃদয়-মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল
প্রেম-প্রহরি রহু জাগি। (ঐ, ৭১০নং পদ)

এই সম্পর্ক মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক। কোন কৃত্রিম সমাজবন্ধন, শাস্ত্রীয় অনুশাসন অথবা বস্তুচেতনা এই সম্পর্ককে মলিন করেনি, অথবা হৃদয়বৃত্তির সুস্থ অভিপ্রকাশের পথে প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায় নি। অর্থাৎ, এই সম্পর্ক বাস্তব, সত্য এবং পবিত্র। তাঁদের আমলে অর্থাৎ সাংস্কৃতিক অধঃপতনের যুগে যখন কতকগুলো প্রাণহীন শাস্ত্রীয় বিধিব্যবস্থা দ্বারা মানুষে মানুষে সম্পর্ক নির্ধারিত হচ্ছিল, বস্তু-সম্পর্ক এসে হৃদয়-সম্পর্কের স্থান গ্রহণ করছিল, এবং যখন কার্যত মানবিক সম্পর্কের কোন স্বীকৃতি ছিল না, তখন বৈষ্ণব গীতিকারগণ সত্য মানবিক সম্পর্ক দিয়ে জীবনকে, সমাজকে পুনঃ সংগঠিত করার বাণী ঘোষণা করেছিলেন। এই ঘোষণা ছিল নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমাদের দেশে যেখানে কর্ম্মবিভাগ, শাস্ত্র

শাসন এবং সামাজিক উচ্চনীচতার ভাব সাধারণের মনে এমন দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল সেখানে কৃষ্ণরাধার প্রেমকাহিনীতে এই প্রকার আচার-বিরুদ্ধ বন্ধনহীনতা ও স্বাধীনতা যে কত বিস্ময়কর তাহা চিরাভ্যাসক্রমে আমরা অনুভব করি না।" প্রচলিত সমাজ জীবনের না-পাওয়ার বেদনাকে পাওয়ার আনন্দে, খণ্ডিত জীবনবোধকে অখণ্ড জীবনবোধ ও অসীম মুক্তির আস্বাদে ভরে দিতে চেয়েছিলেন বলে, এবং কৃত্রিম সমাজ-সম্পর্কের পরিবর্তে সত্য মানবিক সম্পর্ককে সংস্থাপিত করে সমাজকে পুনঃ সংগঠিত করার বাণী ঘোষণা করেছিলেন বলেই বৈষ্ণব গীতিকারগণ জীবনের সর্বক্ষেত্রে—সাহিত্যে সংগীতে সমাজে—নতুন শক্তির উদ্বোধনের সহায়তা করতে পেরেছিলেন। এই শক্তির প্রধান কথা আত্মশক্তিতে, মানবিক শক্তিতে সুদৃঢ় বিশ্বাস।

কিন্তু, কালপ্রবাহের সংগে সংগে এই বিশ্বাস শিথিল এবং বিস্মৃত হতে থাকে। কেন না, বৈষ্ণব মতবাদ অপরিহার্যভাবে নিজস্ব মলিনতা সৃষ্টি করে কতকগুলো। ফলে, তার সুস্থতা অপসৃত হয়ে বিকৃতি আত্মপ্রকাশ করে। ভাব কর্মের স্পর্শ বিমুক্ত হয়ে শুধুমাত্র একটা অনুপ্রেরণাহীন বিলাসে পরিণত হয়; মাধুর্য বাস্তব পৃথিবীর বলিষ্ঠতার মধ্যে নিজকে প্রসারিত না করে একটা অপৌরুষের মায়াজগৎ সৃষ্টি করে তাতেই আত্মনিমজ্জন করে; অর্থাৎ, বৈষ্ণব-পনা নেহাৎ একটা ভংগিতে পরিণত হয়। বিভিন্ন বৈষ্ণব পদকর্তার তরল ভাবাবেগের মধ্যে এবং কোন কোন কবির (যেমন গোবিন্দদাসের) ধ্বনি সর্বস্বতার মধ্যে এই নতুন পোজ (pose) লক্ষ্য করা যায় কিন্তু এই অনিয়ন্ত্রিত বিলাস, ভাবাবেগ অথবা পোজ যে ক্রমেই নিম্নগামী হবে, তা নিঃসন্দেহ। তাই দেখা যায়, যে চৈতন্য-মতবাদের মধ্যে মানুষ একটা বিশেষ ভাব-মুক্তির আস্বাদন লাভ করেছিল, সেই মতবাদেরই বিকৃত অভিপ্রকাশ দেখে পরবর্তী কালের মানুষ অশ্রদ্ধায় সঙ্কুচিত হয়েছে, ঘৃণা করেছে তথাকথিত বৈষ্ণবভাবকে।

অর্থাৎ, ধীরে ধীরে চৈতন্য-আমলের সজীবতা ও সৃষ্টিশীল প্রেরণা হারিয়ে বৈষ্ণব মতবাদ নিজস্ব মলিনতার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। বৈষ্ণব সহজিয়াদের প্রত্যক্ষ সামাজিক আচরণের মধ্যে এই বিকৃতি আরও বেশী ধরা পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, চৈতন্য মতবাদের বলিষ্ঠ মানবতা-বোধ ও এই মধুময় পৃথিবীর আশ্চর্য স্বীকৃতি অস্বীকার করা যায় না।

রূপান্তরের দ্বিতীয় পর্যায় : সহজিয়া বৈষ্ণব সাহিত্য—ঙ

সহজিয়া বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব জীবনদর্শনের মূল উৎস থেকেই তাঁদের মতবাদের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন ; কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাঁদের মতবাদ মূল বৈষ্ণব ভাবধারা থেকে শুধুমাত্র স্বতন্ত্র নয়, তাঁদের বিষয়-চেতনা আরও বেশী গভীর, তাদের ভাবাকাশ আরও বেশী বাস্তব, সত্য এবং আরও বেশী প্রত্যক্ষ। আর সম্ভবত, তাঁদের বলিষ্ঠতর বিষয়-চেতনার জন্যই তাঁদের মতবাদ ও মূল বৈষ্ণব মতবাদ থেকে স্বতন্ত্র।

মূল বৈষ্ণবধারা আশ্রিত বৈষ্ণবদের মত সহজিয়াদের দৃষ্টিও প্রেমের দৃষ্টি, যে দৃষ্টি সমস্ত বৈষম্য সমস্ত ব্যবধান দূর করে দেয়। সহজিয়া শাস্ত্রকার বলেন, "সহজ ভজন এই শব্দের অর্থ এই যে জীব অণু চৈতন্যস্বরূপ আত্মা। প্রেম আত্মার সহজ ধর্ম।" (১) প্রেম পরমাত্মার সহজ স্বরূপ, মানুষেরও সহজ স্বরূপ, এবং বিশ্বপৃথিবীর আর সব বস্তুরও সহজ স্বরূপ। কিন্তু মায়ার বশে মানুষ এই সহজ স্বরূপ বিস্মৃত হয়েছে ; এই ভুলে-যাওয়া সহজ স্বরূপকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করাই সহজিয়া বৈষ্ণবদের সাধনার লক্ষ্য। কারণ, তাঁরা মনে করেন, এই চরম লক্ষ্যে উপনীত হতে পারলেই সমস্ত ভেদবিচার দূর ও সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে, এবং মানব প্রেমের আদর্শে নতুন সমাজ স্থাপন করা সম্ভব হবে। তাঁদের আদর্শ শুধু তত্ত্ব মাত্র নয়, এর ব্যবহারিক দিকও রয়েছে ; এই আদর্শকে জীবনে অনুসরণ করে, প্রত্যক্ষ জীবন চর্যার মাধ্যমেই এই লক্ষ্যে উপনীত হতে হয়। সাধন মার্গের নিম্নতম সোপান অবলম্বন করে যখন মানুষ সোপানের শেষ সীমায় পৌছায়, তখন তাকে সহজ মানুষ অথবা শুদ্ধসত্ত্ব মানুষ বলা হয়। এই সহজ মানুষের স্বরূপ কি, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের কাছে আত্মপর ভেদ নেই, এবং কাউকে তারা হিংসা করে না, মন তাদের চির প্রশান্ত, ইত্যাদি। রসরত্নসারে আছে

---

১ মণীন্দ্রমোহন বসু ; Post Caitanya Sahajiya cult of Bengal. পৃঃ ২০৯

শুদ্ধসত্ব জীব যেই সদা নিষ্ঠাশীল।
সুহৃজে অভেদভাবে দেখে যে অখিল॥
বিষয়ের দাস্তে যেই না কাটায় কাল।
নয়নের দৃষ্টি যার চিত্তে চিরকাল॥
ভালমন্দ নাহি জানে, নাহি করে দ্বেষ।
অন্তরে নিয়ত হেরে আপন মহেশ॥ (২)

শুধু তাই নয়, তারা নিজের সুখের জন্য স্বর্গাদি পর্যন্ত কামনা করে না। যথা,

নিজ সুখ লাগি সালক্যাদি না করে গ্রহণে।
নিজ ভাল মন্দ তারা কিছুই না জানে॥
সর্বজনে উত্তম দেখে আপনাকে হীন।
কৃষ্ণের দাসের দাস আমি, এই অভিমান॥
তৃণের সমান সেই আপনাকে মানে।
কাটিলে না বলে কিছু যেন তরুগণে॥ (৩)

ব্যক্তিগত আচরণের এই যে আদর্শ, সমদৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে তাকানোর এই যে বাণী, তার মধ্যে মধ্যযুগীয় সাধনার মূল সুরটি নিহিত রয়েছে। পূর্বোক্ত আলোচনায় আমরা দেখেছি, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, সাংস্কৃতিক অধঃপতন এবং ব্যক্তিগত আচরণের নৈরাজ্যের যুগে সর্বদিক থেকে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা কতখানি জরুরী ছিল, এবং সেকালের মানুষ একটা সমন্বয়ের জন্য কেঁদে ওঠেছিল। সহজিয়া বৈষ্ণবদের এই আদর্শের মধ্যে সেই আকৃতি-ই নবভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

এই আদর্শ একান্তভাবেই ব্যক্তিগত আচরণের আদর্শ, এবং সহৃদয় সমাজ-পরিবেশের মধ্যে এই আদর্শকে প্রত্যেকেই নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। সহজিয়া বৈষ্ণবদের দৃষ্টি এ দিক থেকে বস্তুনিষ্ঠ বলেই তাঁরা পৌরাণিক ব্রাহ্মণদের মত স্বর্গলাভের স্বপ্ন দেখেন নি, এবং সেজন্য যাগযজ্ঞ, পূজাপার্বন, ব্রতানুষ্ঠান প্রভৃতিতে লিপ্ত হয় নি। তাঁরা তান্ত্রিকদের মত একটা

২ রসরত্নসার, রত্নসার, বিবর্তবিলাস, রসতত্ত্বসার, বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পুঁথির উদ্ধৃতি সবগুলোই মণীন্দ্রনাথ বসুর উপরোক্ত গ্রন্থ থেকে নেওয়া।

৩ ঐ ; পৃ, ২১৫

সত্য বস্তুকে আশ্রয় করতে চেয়েছেন; সেই সত্য বস্তু হ'লো মানবদেহ। তাঁদের মতে "নরবপু না হইলে তারে পাবে কতি"; তা ছাড়া আত্মা তো দেহের মধ্যেই অধিষ্ঠিত;

ভূতাত্মার দ্বারে হয় জীবের পোষণ।
জীবাত্মার দ্বারে পরমাত্মার সেবন॥

(নিগূঢ়ার্থ প্রকাশাবলী)

সুতরাং তাঁদের কাছে মানবদেহের অস্তিত্ব অমূল্য; এবং এই দেহই সমস্ত ধ্যানধারণা কল্পনা, ভাব ও সাধনার মূলগত ভিত্তি। সুতরাং একে অবলম্বন করেই চরম লক্ষ্যে পৌছাতে হবে। আর দেহ-সাধনার মধ্যে যেমন ইন্দ্রিয়-সংস্কার রয়েছে, তেমনি নির্দিষ্ট সমাজের অন্তর্গত মানুষ হিসেবে সামাজিক আচরণের সংস্কারও রয়েছে। এই সংস্কারের পথেই সিদ্ধি।

সহজিয়া মতে, এবং সাধারণ বৈষ্ণব মতেও, সাধনার দুটো দিক আছে; এক "বাহ্য", আর "অন্তর"। উভয় সাধনার উচ্চতর মার্গ হলো পরকীয়া এবং নিম্নতর মার্গ স্বকীয়া উপলব্ধি। এখানে বুদ্ধিগ্রাহ্য চিন্তা বা মননের স্থান নেই, সবই মাধুর্যময়, প্রেমময়। শাস্ত্রীয় বিধি, আচার, অনুষ্ঠান ইত্যাদির স্থানও এখানে নেই। আছে, সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম-চেতনা থেকে বিমুক্ত হয়ে শুদ্ধ মধুর রসে স্বরূপের সাধনা; সুন্দর নায়ককে যে গভীরভাবে সুন্দরী নায়িকা ভজন করে, এ সাধনাও তেমনি। গোবিন্দদাসের কড়চায় আছে,

সুন্দর নায়ক দেখি সামান্ত নায়িকা।
যেইভাবে দেখে তারে হয়ে রাগাত্মিকা॥
সেই ভাবে কৃষ্ণকে ডাকহ বার বার।
আপনি ঘুচিয়া যাবে মনের অন্ধকার॥

কৃষ্ণ এখানে নিত্যকালের সত্য প্রেম-স্বরূপ। চৈতন্তদেবের ভাব-জীবনের মধ্যে সহজিয়াগণ তাঁদের সাধনার বাস্তব নিদর্শন দেখতে পান। এই বিশুদ্ধ ভাবে যখন উদ্বুদ্ধ হওয়া যায়, তখন "উত্তম স্বভাব হয়, জগতে সমজ্ঞান"; মানুষ নিজ সুখ এবং পরের সুখের মধ্যে কোন তারতম্য দেখতে পায় না, জগতের মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে জগৎকে দেখতে পায়। অর্থাৎ, মানুষ প্রকৃত সহজ মানুষে পরিণত হয়।

এই অন্তর সাধনার নিম্নতর অর্থাৎ স্বকীয়া স্তরে সবই কেবল স্বার্থের খেলা ; সমস্ত কর্মই এখানে স্বার্থ-চেতনা থেকে উদ্ভূত। কিন্তু স্বার্থ প্রণোদিত কর্মের মাধ্যমে সহজ-মানুষ হওয়া যায় না, প্রেমস্বরূপের উপলব্ধি হয় না। মানুষ এখানে স্বার্থকে বড় করে দেখে বলেই, অহংকে বর্জন করতে পারে না বলেই, সত্যের সন্ধান পায় না ; অকল্যাণকে, ভেদবুদ্ধিকে আশ্রয় করে নানা অসাধু, অসত্য কর্মে লিপ্ত হয়। ফলে, তারা নিজের জীবনকে যেমন সৃষ্টি বা উপলব্ধি করতে পারে না, তেমনি বৃহত্তর সমাজ-জীবনকেও সৃষ্টি করতে পারে না। সহজিয়াগণ সেজন্যই বলেন,

জ্ঞান কাণ্ড কর্ম্ম কাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা কদর্য্য ভক্ষণ করে
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥ (৪)

তাই তাঁরা তাঁদের সহজ প্রেম-ধর্মকে সম্মুখে তুলে ধরে বলেন

ছাড় অন্য জ্ঞান কর্ম্ম বিধি আচরণ।
নাহি দেখ বেদ ধর্ম্ম স্বকীয়া সাধন ॥
জ্ঞান কাণ্ড কর্ম্ম কাণ্ড বিধি আচরণ।
পিতৃমাতৃ ক্রিয়া কাণ্ড কুটুম্ব ভোজন ॥

প্রাণহীন ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে, অর্থহীন শাস্ত্রীয় বিধানের মধ্যে সত্য নেই, তা অনুসরণ করে সহজ প্রেম স্বরূপকে উপলব্ধিও করা যায় না। তাই এসব পরিত্যাগ করে অর্থাৎ স্বকীয়া সাধন ত্যাগ করে শুদ্ধ প্রেম রসে অর্থাৎ পরকীয়া তত্ত্বে উদ্বুদ্ধ হ'তে হ'বে। জপতপ ছেড়ে "একতা করিয়া মনে" সাধনার পথে অগ্রসর হতে হবে।

এই অন্তর সাধনার নিম্নতর স্তর হলো বাহ্য সাধনা। ইহাই তাঁদের সাধনার নিম্নতম পর্যায়। এই পর্যায়ের মুখ্য লক্ষ্য হলো দৈহিক কাম-চর্চা ; কারণ, তাঁদের মতে কাম-পরিতৃপ্তির পথেই নিষ্কাম প্রেমে পৌছাতে হবে। এই কাম চর্চার পক্ষে, এবং এর প্রণালী সম্পর্কে সহজিয়ারা যে যুক্তির অবতারণা করেছেন, তার মধ্যেই তাঁদের ইন্দ্রিয়ভোগ-লিপ্সু মন ও মননের, স্থূল বস্তু-নিষ্ঠ কল্পনার নিশ্চিত স্বাক্ষর রয়েছে। কাম-চর্চার প্রয়োজনীয়তা কি সে

৪ ঐ ; পৃঃ ৮১

সম্পর্কে সহজিয়াগণ নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করেন। রসসারে বলা হয়েছে, কলিযুগে পুরুষ প্রকৃতি অত্যন্ত কামাসক্ত হবে; কাম এবং লোভ সমস্ত ধর্ম বিনষ্ট করে দেবে। গ্রন্থকার সম্ভবত তাঁর স্বীয় পরিবেশের মধ্যেই এর অস্বাভাবিক বিস্তার দেখে থাকবেন। কিন্তু এই দুই ইন্দ্রিয়ের প্রেরণাকে যদি স্বাভাবিক ভোগের মাত্রায় কেন্দ্রীভূত করি, তাহলে বলতে হয়, বাঁচার সহজ তাগিদে ইন্দ্রিয়গুলো নিরন্তর বাইরে প্রসারিত হতে চাইছে, ভোগ ঐশ্বর্যে পরিতৃপ্ত হতে চাইছে। সহজিয়াগণ তা স্বীকার করেন, আর তা স্বীকার না করলে যে একটা পরম সত্যকেই অস্বীকার করা হয়। ভোগের দিকে ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বলেই, তাঁরা মনে করেন, যদি একে পরিশুদ্ধ করতে হয় তো ভোগের পথেই করতে হবে, নিপীড়নের পথে নয়। ইন্দ্রিয়কে অস্বীকার নয়, স্বীকার করেই পরিশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। এর বাইরে প্রসারিত হওয়ার আবেদনের মধ্যে যেটুকু অবাঞ্ছিত, বিষাক্ত, নিপীড়নের পথে তার বিলোপ কোনভাবেই সম্ভব নয়; মনের কোন এক গোপন অঞ্চলে এ কোন না কোন ভাবে সুপ্ত থাকেই। তাই তৃপ্তির পথে এর নিবৃত্তি চাই। সহজিয়া দার্শনিকগণ বলেন,

ছয় রিপু হিংসা করি কর উপকার।
সুখ দিয়া মারিলে সে প্রেমের সঞ্চার॥ (বিবর্ত-বিলাস)
প্রথম সাধন রতি সম্ভোগ শৃঙ্গার।
সাধিবে সম্ভোগ রতি পালাবে বিকার॥
জীবরতি পূরে যাবে করিলে সাধন।
তারপর প্রেম রতি করি নিবেদন॥ (অমৃতরত্নাবলী)

নিছক কামাসক্তের কামপরিতৃপ্তির জন্য, প্রেম চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য, এবং সার্থক আত্মজ্ঞানের জন্যও কাম-চর্চার প্রয়োজনীয়তা সহজিয়াগণ স্বীকার করেন। এসব উক্তি থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা একটা প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্যকে আশ্রয় করতে চেয়েছেন; তাই ব্যবহারিক প্রয়োগের পথে তার যথার্থ বিচার করতে হবে। আর ব্যবহারের পথে না গেলে আদর্শে পৌঁছানোও যায় না। শুধু তত্ত্বালোচনায় অনেকের পক্ষেই এ সত্য বুদ্ধিগত করা সহজ, কিন্তু সহজিয়াদের মতে, এরা ভাবশূন্য; "রসিক সঙ্গ" করে এই তত্ত্বকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে।

এইভাবে কাম-চর্চার আত্যন্তিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে সহজিয়াগণ পরবর্তী পর্যায়ে যাত্রা করেন। কাম-চর্চা কিভাবে, বা কার সংগে? এর আদর্শ কি স্বামীস্ত্রীর বিবাহিত সম্পর্ক না আর কিছু? স্বকীয়া না পরকীয়া? সহজিয়ারা একবাক্যে উত্তর দেবেন, পরকীয়া। স্বকীয়া থেকে পরকীয়া কাম্য কেন, সে সম্পর্কে সহজিয়াগণ কয়েকটি চমকপ্রদ যুক্তি দর্শান; এর সারবত্তা স্বীকার অস্বীকারের প্রশ্ন বাদ দিলেও এ থেকে তাঁদের মনোভাবের খানিকটা পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। প্রথমত, তাঁরা মনে করেন, যা চাইলেও পাওয়া যায় তা পাওয়ার মধ্যে আনন্দ বা তৃপ্তি নেই; বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে যে পাওয়া তাই প্রকৃত পাওয়া। যথা

লোক শাস্ত্রে করে যাহা অনেক বারণ।
প্রচ্ছন্ন কামুক যাতে, দুর্ল্লভ মিলন॥
তাহাতে পরমা রতি মন্মথের হয়।
মহামুনি নিজ শাস্ত্রে এই মত কয়॥ (উজ্জ্বল চন্দ্রিকা)

স্বকীয়া তো ঘরের জিনিস, সীমাবদ্ধ, অল্প; আর অল্পে সুখ কোথায়! তাই সীমার বাইরের জিনিস পরকীয়ায় যেখানে বৃহতের সন্ধান, তাতে সহজিয়াদের আনন্দ।

পরকীয়া রাগ অতি রসের উল্লাস।
স্বকীয়াতে রাগ নাই, কহিল আভাস॥

দ্বিতীয়ত, স্বকীয়া প্রেম গভীর নয়, বিধিবদ্ধ নিয়মে যেন তা গতানুগতিক, হৃদয়ের আকর্ষণ ব্যয়িত হয়ে গিয়ে থাকলেও সমাজ ধর্মের নামে যে ভার বহন করতে হয়। সে জন্য এখানে সৃষ্টির সজীব আনন্দ নেই। প্রেমের জন্য নয়, যেন নিছক প্রজননের জন্যই স্বকীয়ার প্রয়োজনীয়তা। রসসার গ্রন্থে বলা হয়েছে,

স্বকীয়ার ধর্ম্ম যেই শুন তাহা কহি।
লোক বেদ ধর্ম্ম ভয় পতিগতি এহি॥

তাই পরকীয়ার মধ্যে তাঁরা মুক্তির আস্বাদ ভোগ করেন। প্রতিদিনের ব্যবহারে যা কলুষিত হয়, অনুরাগহীন হয়ে পড়ে, পরকীয়া সেই কলুষমুক্ত; আর সে জন্যই তাতে তাঁদের আকর্ষণ। এর মধ্যে যেন একটা অভিনব রোমান্সের, সজীব অনুপ্রাণনার ইংগিত তাঁরা খুঁজে পান। বিবর্ত-বিলাস বলেন

প্রণয় করহ তাথে সঙ্গে না রাখিবে।
এই মোর মিনতি প্রণতি যে শুনিবে॥
সঙ্গেতে রাখিলে হবে অনুরাগহীন।
পরকীয়া বহু দূরে, স্বকীয়া অধীন॥

তৃতীয়ত, পরকীয়া থেকে মহাভাবাবেগের উন্মেষ হয়। মধুর রসের দুটো স্তর আছে ; একটি রূঢ়, অপরটি অধিরূঢ়, অধিরূঢ় উচ্চতর, এবং একেই বৈষ্ণবরা বলেন মহাভাব। এই ভাবের আলোচনা প্রসঙ্গে বৈষ্ণবগণ বলেন, কৃষ্ণ তাঁর বিবাহিত স্ত্রীদের মাধ্যমে মহাভাবের সন্ধান পাননি, রূঢ় ভাবের সন্ধান পেয়েছেন ; গোপীলীলার ভেতর দিয়ে তাঁকে মহাভাবের আস্বাদ গ্রহণ করতে হয়েছে। সেইরূপ, সহজিয়া বৈষ্ণবগণও মনে করেন, স্বকীয়াতে মহাভাব নেই, আছে পরকীয়ায়।

চতুর্থত, সহজিয়ারা মনে করেন, স্বকীয়া অনিয়ন্ত্রিত কাম-বিহারের কেন্দ্র ; যথা

স্বকীয়া রমণী করি সংসারিয়া জনে।
কামে উন্মত্তা করে ইন্দ্রিয় পোসনে॥
নিজ দেহ প্রীত করি শৃঙ্গার করয়।
স্বকীয়া বেদের উক্তি নাহি তাহে ভয়॥

সেইজন্যই তা পরিত্যজ্য। পরকীয়া এত সহজ নয় বলেই সেখানে অনিয়ন্ত্রিত যৌনবিহারের সম্ভবনা নেই ; সুতরাং মানুষের সাধন-পথে পরকীয়াই অধিকতর কাম্য।

এই পরকীয়া সাধন-সঙ্গিনীর রূপ বর্ণনা ও চিত্রণও অত্যন্ত বস্তু-নিষ্ঠ এবং ইন্দ্রিয়-সুখকর। সহজিয়া সাধকগণ যে পরিপূর্ণ ভোগের দৃষ্টিতে জীবনের দিকে তাকিয়েছেন, তার পরিচয়ও এখানে রয়েছে। নিগূঢ়ার্থ-প্রকাশাবলীতে সাধন-সঙ্গিণীর এই চিত্র আঁকা হয়েছে

সহজের পাত্র হয় নবীন কিশোরী।
নয়ান কটাক্ষবাণে করিল জর্জ্জরী॥
সুলক্ষণ সকল থাকিব যাহার।
চিত্র বিচিত্র অঙ্গ বেশভূষা আর॥

অমৃত অধরে যার, সেই সুধামুখী।
কনক লতিকা দেহের তুলনা না দেখি॥
হেমলতা, স্নিগ্ধাঙ্গী, কাঞ্চণ বরণী।
অলকা তিলকা হবে দেহের সাজনী॥
এমত নায়িকা হৈলে সহজ নায়িকা।
তাহার সেবন শ্রেষ্ঠ জানিহ অধিকা॥

এইরূপ ক্ষেত্রেই "নয়নে লাগিয়া রূপ হৃদয়ে পশিবে"; আর হৃদয়ে প্রবেশ করে মন আকর্ষণ করবে। এই বর্ণনা একান্ত সজীব পার্থিব কামনার রঙে রঞ্জিত; নারীদেহের যেসব বৈশিষ্ট্য পুরুষের চোখে রং ধরায়, তা দিয়েই এই সৌষ্ঠব গড়া হয়েছে। এই দেহসৌষ্ঠবকে অকৃপণভাবে ভোগ করে, এবং ভোগে পরিতৃপ্ত হয়ে সহজিয়াগণ সাধনার উচ্চ থেকে উচ্চতর মার্গে যাত্রার পরিকল্পনা করেন। সাধনার সুউচ্চ মার্গে এই ভোগ-লিপ্সা সর্বতোভাবে পরিশুদ্ধ হবে, এই তাঁদের আশা। কামনার পরিশোধন সম্ভব কি অসম্ভব তার বিচার না করে শুধু একথা মনে রাখা যথেষ্ট যে, তাঁদের সাধনার মূলগত ভিত্তি নিতান্ত জৈব, দৈহিক ব্যাপার।

সাধনার এই নিম্ন মার্গে তাঁরা যে আদর্শ অনুসরণ করার কথা ঘোষণা করেছেন এবং সংগে সংগে স্বকীয়ার অর্থাৎ প্রচলিত সমাজ-সম্মত হৃদয়-সম্পর্ক ও মানবিক সম্পর্কের যে সমালোচনা করেছেন, তা নানাদিক থেকে গভীর অর্থবহ। স্বকীয়া অর্থাৎ বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের যে চিত্র তাঁরা এঁকেছেন, তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এ সম্পর্কে তাঁরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। সমাজ-ধর্ম-সম্মত নরনারীর সম্পর্ক স্বাভাবিক সজীবতা হারিয়ে ফেলেছিল। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে, পারস্পরিক হৃদয়-সম্পর্কের মধ্যে সমাজ-ধর্ম অথবা অর্থ-চেতনা অনুপ্রবেশ করেছিল; অর্থাৎ সজীব হৃদয়-সম্পর্কের পরিবর্তে প্রাণহীন বস্তু-সম্পর্ক স্থাপিত হতে চলছিল। শাস্ত্রসম্মত স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের, হৃদয়-সম্পর্কের, এই অবনতি সহজিয়াদের নিরতিশয় ক্ষুণ্ন করেছিল সম্ভবত; পারস্পরিক সম্পর্কের এই অসত্যতা তাঁদের মনে সত্য-সম্পর্ক স্থাপনের প্রেরণা জাগিয়ে দিয়েছিল হয়তো। তাই তাঁরা স্বকীয়া সম্পর্কের এই প্রাণহীন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শ্লেষাত্মক চিত্র এঁকেছেন। তাঁদের বিদ্রোহ অথবা সঠিকভাবে বলতে গেলে, তাঁদের পরকীয়া আদর্শের অপরোক্ষ ভাবগত বিদ্রোহ এই

অসত্য, প্রাণহীন, মানবিক সম্পর্কের বিরুদ্ধে; যে সমাজ-ধর্ম এই সব প্রাণহীন সম্পর্ককে ধারণ ও বিধিবদ্ধ করে তার বিরুদ্ধে। এই সব সম্পর্ক রদ করে তাঁরা জীবন্ত মানবিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্ম উদ্‌গ্রীব ছিলেন। কিন্তু আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার জন্মই হোক, অথবা বিদ্রোহের উন্মাদনার জন্মই হোক, তাঁদের দৃষ্টিভংগী প্রচলিত সম্পর্কের মত প্রাণহীন না হলেও চরম বা অতি-সজীবতার লক্ষণে কলুষিত; তার প্রতিক্রিয়া মারাত্মক না হয়ে পারে না। সমাজ-ধর্মের নিয়মে পরকীয়া রতির স্বীকৃতি নেই। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে' দেখতে পাই কবি এ সম্পর্কে দারুণ অভিশাপ উচ্চারণ করেছেন; তিনি বলেন

সংসারিকা লোক না করিহ পরদার।
পরদার অধিক পাপ না জানিহ আর ॥
চৌরাসি নরক কুণ্ড জত জমলোকে।
পরদার করিলে তা ভূঞ্জয়ে একে একে ॥

(শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, পৃ ১৬৭)

'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' রচনার প্রায় একশত বৎসর পর অর্থাৎ সহজিয়া বৈষ্ণব মতবাদের ব্যাপক অভিব্যক্তির সময়েও অনুরূপ মনোভাব বর্তমান ছিল তা অনুমান করা যেতে পারে; চৈতন্যদেব সন্ন্যাস জীবনে নারী মুখ দর্শনেও কুণ্ঠিত ছিলেন, এবং নারী সংযোগে মানুষ ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত হয়, এটাই প্রচলিত মত। সেই পরিবেশে সহজিয়াদের পরকীয়া আদর্শ কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। বিশেষ করে সাধারণভাবে পরকীয়া অর্থে যেখানে শুভ পারিবারিক জীবন যাপনের জন্য নর-নারীর মিলন বোঝায় না, যে মিলনের মধ্যে বিবাহিত জীবনের কোন কর্তব্য বা দায়িত্ব কোনটাই নেই, যা মিলিত জীবনযাপনের একটা সাময়িক ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। অনেক সহজিয়া সাধক এক বা একাধিক প্রকৃতি বা মঞ্জরি গ্রহণ করতেন। চণ্ডীদাস সম্পর্কে এমনি একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। এই কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্যতা আজ পর্যন্তও নির্ধারিত হয়নি অবশ্য, কিন্তু জনশ্রুতি এক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করছে, তাও জোর করে বলা যায় না। সামাজিক বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে, সমস্ত বন্ধনকে অস্বীকার করে এই যে পরকীয়া গ্রহণ, অন্যদিক থেকে তার বিচ্যুতি এবং ভ্রান্তি যাই থাকুক না কেন, তা যে প্রচলিত সামাজিক

নিয়মের বিরুদ্ধে একটা মারাত্মক বিদ্রোহ তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই পরকীয়া-রতিকে আশ্রয় করে তাঁরা প্রেমের সুউচ্চ মার্গে আরোহণ করার স্বপ্ন দেখেছিলেন, এবং সেই মার্গে বসে জীবনে অহংকে হত্যা করে সহজ মানুষ হওয়ার এবং সহজ সমাজ সংগঠনের কল্পনা করেছিলেন। অবশ্য এই কল্পনা কখনও সার্থক হতে পারে না। কেননা, সমাজ-বিপ্লবের কোন চেতনা তাদের ছিল না, আগ্রহ ছিল ব্যক্তিগত আচরণ রূপান্তরের; কিন্তু সেখানেও কোনও সামগ্রিক জীবনবোধ না থাকায়, তাঁদের সাধনা বিশেষ একটা ভংগীতে পরিণত হয়। সাধন-পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে সমাজকে উপেক্ষা করে এবং প্রকারান্তরে সমাজ কর্তৃক নিন্দিত হয়ে একটা অস্বাভাবিক জীবন যাপনের মধ্যে এই আদর্শ নিঃশেষিত হয়। এই ভংগী শুধু মাত্রই একটা ভংগী, আর কাম-তৃষা পরিতৃপ্ত করে ধীরে ধীরে সাধন পথে অগ্রসর হওয়ার যে বিধান দেওয়া আছে, তা যথাযথ অনুসরণ করা ক'জনার পক্ষে সম্ভব।

ব্যর্থ বিদ্রোহ হলেও তা বিদ্রোহ। আর বৈষ্ণব সাধনার ভাবাকাশ যেমন মানবিকগুণে মণ্ডিত, সহজিয়াদের ভাবাকাশও তেমনি মানবিক গুণে মণ্ডিত। বৈষ্ণবের ভগবান ভক্তের তুলনায় নিজের ক্ষুদ্রতা স্বীকার করেন; সহজিয়াগণও ঈশ্বরের তুলনায় মানুষের শ্রেষ্ঠতা নিঃসংশয়ে ঘোষণা করেন। রত্নসারে আছে

ঈশ্বর মানুষ ভাব কভু নাহি পায়।
পুনঃ পুনঃ ফুকারিয়া গ্রন্থকার কয়॥

ঈশ্বর না হয় কভু জীবের সমান।

এমনকি সহজিয়া বৈষ্ণবদের যে প্রেম তা ঈশ্বর কখনও আস্বাদন করতে পারেন না; আর ঈশ্বরে মানুষে প্রেম কখনও হতে পারে না, প্রেম মানুষে মানুষেই সম্ভব। তাই তাঁদের যে মাধুর্য-রস তা একান্ত পার্থিব, এর ভোক্তা মানুষ, ভগবান নয়। রত্নসারের ভাষায়, "অনীশ্বর লীলা হয় রহস্য মাধুর্য্য।" তাঁদের চিন্তাধারায় রাধা কৃষ্ণের স্থান অবশ্যই আছে; কিন্তু রাধা কৃষ্ণের দেবত্বে তাঁরা বিশ্বাস করেন কিনা তা বলা কঠিন। চণ্ডীদাসের একটি পদে আছে, ক্ষীরোদ সাগরে যে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান, তিনি তো মানুষেরই মত জন্ম-জন্মান্তরে ঘোরাফেরা করেন:

সংস্কার যেই ব্রহ্মাণ্ডেতে সেই
সামান্ত তাহার নাম।
মরণে জীবনে করে গতাগতি
ক্ষীরোদ সায়রে ধাম ॥

তাঁদের কল্পনায় রাধা নিত্য 'রতি', আর কৃষ্ণ নিত্য 'রস'; প্রত্যেক নারী এবং পুরুষ এই রতিরসের অভিব্যক্তরূপ। "আমাদের এই দেহ-ভাণ্ডের ভিতরেই এই যে 'সহজ-স্বরূপ' রসবস্তু রহিয়াছে নিত্য লীলাই ইহার স্বভাব। এই নিত্য-লীলার জন্য অদ্বয়-স্বরূপ 'সহজ' নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছে, 'আস্বাদ্য' এবং 'আস্বাদক' রূপে। এই 'আস্বাদ্য' ও 'আস্বাদক'ই সহজিয়াদের 'রতি' ও 'রস'। এই অদ্বয় সহজই অদ্বয় সত্য,—সহজের লীলামূর্তি রাধা ও কৃষ্ণ। রাধাই 'রতি' —সেই সহজের নিত্য আস্বাদ্য রূপ,—কৃষ্ণই 'রস', সহজের নিত্য-আস্বাদকরূপ। সহজিয়া মতে কৃষ্ণই 'পুরুষ' রাধা 'প্রকৃতি'।" পুরুষ ও প্রকৃতির যে সহজ প্রেমময় স্বরূপ তাকে উপলব্ধি করা বা জীবনে প্রতিষ্ঠা করাই সহজিয়াদের সাধনা। এই যে আদর্শ তা অলৌকিক কিছু নয়, কেননা মানুষ সাধনার বলে এই সহজ মানুষে পরিণত হতে পারে। তথাপি সেই অবস্থা এবং মানুষের সাধারণ অবস্থার মধ্যে ব্যবধান অনেক; সাধারণ দৃষ্টিতে সেই অবস্থার পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই দুই অবস্থা যে একান্তই স্বতন্ত্র, তা নয়; সহজিয়া সাধকগণ বলেন, এই দুই অবস্থা পরস্পর মিশে আছে। কাম আর প্রেমের মধ্যে তাঁরা যে পার্থক্য টানেন এবং এদের মধ্যে যেরূপ অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কও দেখেন, সেখানেও তাই। সুতরাং মানুষের সাধারণ অবস্থাকে যদি বলি বাস্তব তাহ'লে তার 'সহজ' অবস্থাকে বলতে হয় অধ্যাস। এই অধ্যাস দিয়ে তাঁরা বাস্তবের কামনা করেন। বাস্তবের খণ্ডিত রূপকে তাঁরা অধ্যাসের অখণ্ডতা দ্বারা বাস্তবের মোহগ্রস্ত স্বার্থান্ধ মানুষকে অধ্যাসের সহজ মানুষ দ্বারা, বাস্তবের কামকে অধ্যাসের প্রেম দ্বারা রূপান্তরিত করতে চান। তাঁদের অধ্যাস বাস্তবের মত ভঙ্গুর, ক্ষয়-পেয়ে-যাওয়া সত্তা নয়, অনিত্য নয়; তা নিত্যধাম মৃত্যুর স্পর্শের উর্ধ্বে। আর সেই নিত্য 'ব্রজধামে' সহজ মানুষদের বিহার। সেই অধ্যাসের ভিতর দিয়েই তাঁরা ক্ষয়কে, মৃত্যুকে জয় করতে চান। অমৃতরসাবলীতে সেই নিত্যধামের চিত্র আঁকা হয়েছে; তাতে

নয়নকামা কহে শুন আমার বচন।
সহজ কথা কহি আমি, ইথে দেহ মন॥
গুপ্তচন্দ্রপুর সেহ অনেক দূর
চৌদ্দ ভুবনের কাছে।
নাহিক জরা কেহ নহে মরা
কি জাতি মানুষ আছে॥
কি জাতি মন্দির নহে সে গোচর
রস কোন্ হয় তার।
তাহার ভিতর কিশোরী কিশোর
না হয় গোচর কার॥
সেই রস কোন বৈসে রসিক জন
নিজের আলয় হয়।
যাহার গুণে আপনা চিনে
সেই জন তথাহ রয়॥
প্রকৃতি আচার পুরুষ বেভার
যে জন জানিতে পারে।
তাহার দক্ষিণ অঙ্গে উৎপতি রঙ্গে
মানুষ বলিয়ে তারে॥

দিব্য সেই স্থল সংসারের মূল
তত ক্রোশ হয় স্থান।
সেই স্থান অক্ষয় যুগে যুগে রয়
প্রলয়ে নাহিক জান॥ (৫)

এই যে জরামৃত্যুর উর্ধ্বে নিত্যধাম এবং নিত্যধামের নিত্য আনন্দ, তাও মানুষের ভোগের জন্যই, ঈশ্বরের জন্য নহে। কারণ, "ঈশ্বরের গণে নহে প্রাপ্ত বৃন্দাবন।" সহজিয়া বৈষ্ণবদের আচার আচরণ নানাভাবে কলুষিত হয়ে থাকলেও, দৈনন্দিন আচরণের মধ্যে তাঁদের তত্ত্বের বিশুদ্ধতা রক্ষিত না হলেও,

৫ মনীন্দ্র মোহন বসু ; Post-Caitanya Sahajiya Cult of Bengal পৃ. ২৪৩-৪৪

তাঁরা এই নিত্যধামের আকাঙ্ক্ষায়ই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এইরূপ এক নিত্যধামের পরিকল্পনা করেই তাঁরা আদর্শহীন অন্যায় সমাজধর্মের অনুশাসন থেকে নিজেদের বাঁচাতে চেয়েছিলেন।

এমনিভাবে প্রেমাদর্শের নামে একদল লোক বিষয়-কর্মে নিমগ্ন ও বাস্তব কর্ম-সম্পর্কে আবদ্ধ সমাজ থেকে দূরে বিচ্যুত হয়। সমাজকে তারা উপেক্ষা করেছিলেন সমাজও তাদের প্রতি নিক্ষেপ করেছিল অবহেলার দৃষ্টি। এই পারস্পরিক কর্ম-সম্পর্কের অভাবে পরিণামে উপকৃত হয়নি কেউ। প্রেমাদর্শবাদী বৈষ্ণবরা প্রত্যক্ষ সাংসারিক পরিবেশের কাঠিন্য থেকে পলায়ন করে আশ্রয় গ্রহণ করেন রসসিঞ্চিত ভাবের রাজ্যে। সেই ভাব তাদের মুক্তি দেয়নি, সংসারকে তো নয়ই; বরং কালক্রমে-সঞ্জাত কলুষ কর্মের উদ্যোগ হরণ করে।

পরিশিষ্ট : বাংলার বাউল

বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভক্ত বাংলার বাউলদের কণ্ঠেও একই সুর। তাদের সুরের ধারায় এসে মিলেছে মধ্যযুগের মরমীয়া সাধকদের সহজিয়া বৈষ্ণবদের, এবং আরও ভেদবিচারের উর্ধ্বে স্থাপিত মানবতত্ত্বজ্ঞানী সাধকদের সুর। মধ্যযুগের অন্যান্য সাধক-সম্প্রদায়ের মত এইসব বাউল সম্প্রদায়ও প্রত্যক্ষ সমাজ-সম্পর্কের বাইরে ; অনেক ক্ষেত্রে তাদের নির্দিষ্ট কোন পেশাও নেই, অর্থাৎ সামাজিক ধনোৎপাদনে তাদের কোন অংশ নেই ; নেই কোনরূপ সামাজিক দায়-দায়িত্ব বা বন্ধন। সমাজকে তারা অস্বীকার করেন ; আর শুধু অস্বীকারই বা কেন, ভাবরসে সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত তাদের জীবন এমন সুরে বাঁধা, যেখানে সামাজিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত অন্যান্য মানুষের সংগে তাদের স্বাভাবিক লেন দেন, কর্ম-সহযোগিতা ও ভাব বিনিময় অচল। সমাজের দাবী তারা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

অবশ্য, এই প্রত্যাখ্যানের পশ্চাতে গভীর দুঃখবোধ, সামাজিক ভেদ বিচারের নির্মম উৎপীড়ন বর্তমান, তা বলাই বাহুল্য। কোন কোন বাউল গেয়ে থাকেন

তাই তো বাউল হৈনু ভাই।
এখন বেদের ভেদ-বিভেদের
আর তো দাবি-দাওয়া নাই।

অর্থাৎ, শাস্ত্রবিধি নিয়ন্ত্রিত সমাজের হৃদয়হীন ভেদবিচারের কলুষ থেকে তাঁরা পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করেছেন বাউল হয়ে—সেই সমাজকে পরিপূর্ণ অস্বীকার করে। তাদের কাছে এই সমাজ শুধু মাত্রই শাস্ত্রের লিখন, মানবিক প্রীতিরসের মিলনভূমি নয়। তাই, নিষ্প্রাণ বিধানের চেয়ে সজীব হৃদয় যাদের নিকট বড় ও মূল্যবান, তারা প্রচলিত সমাজ-সম্পর্ককে স্বীকার করে নিয়ে হৃদয়কে খর্ব করতে পারেন না। ঐ সম্পর্কের পরিবর্তে তাদের আছে এক নির্মোহ ভাবের জগৎ ও সম্পর্ক। সেখানে শাস্ত্রের লিখনের প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং অসহ্য।

শুধু ভেদবিচারই নয়। তাদের কথায় ও গানে, সুরে ও ব্যঞ্জনায় এই পরিমিতিহীন দুঃখ-বিষাদ, হাহাকার, শূন্যতা ও না পাওয়ার বেদনা ধ্বনিত হয়ে ওঠে। সেই দুঃখবেদনা বাউলকে অস্থির করে তুলেছে। হৃদয়ে দুঃখের আগুন জ্বলে জ্বলে তাদের প্রায় নিঃসাড় করে দিয়েছে, তাই ব্যাকুল হয়ে তারা খুঁজে বেড়াচ্ছেন কোথায় এই আর্তির নিবৃত্তি, কোথায় বেদনার অবসান, কোথায় সুখের ও শান্তির সর্বতাপহারী স্পর্শ। হৃদয়ের সমস্ত আকুতি ঢেলে দিয়ে তারা গাইছেন

উহুর ঝুহুর বাজে নাও আমার
নিহাল্যা বাতাসে রে মুরশীদ,
রইলাম তোর আশে।
পশ্চিমে সাজিল ম্যাঘ রে হাওয়ায় দিল রে ডাক।
আমার ছিড়িগ হালের পানস নৌকায় খাইল পাক॥
মুরশীদ, রইলাম তোর আশে॥
আসা বাইয়া ওঠে ঢেউ রে পাছা বাইয়া রে যায়
আমার হীরালাল মানিকর বারা সোতে লইয়া যায়
মুরশীদ, রইলাম তোর আশে॥

গুরুর নির্দেশে সার্থক পথ চলে তারা এই ঝড়-তাড়িত সমুদ্র পার হয়ে সুখ ও আনন্দের তীরে পৌঁছাবেন, সেই তাদের আশা। সেই আশাই তাদের অপূর্ব করুণ রসে ও মাধুর্যে স্নান করে ক্রন্দন তুলেছে হাওয়ায়। তরঙ্গে তরঙ্গে সেই সুর ভেসে চলেছে কোথায় কে জানে। বাংলার কীর্তন, মালসী, বাউল প্রভৃতি গানের সুর তাই এত অপরূপ, এমন চিত্তহারী। কী যেন নেই, কী যেন হারিয়ে গেছে, কী যেন পেয়েও পাওয়া যায় না, ব্যক্তি সত্তার চেয়ে বড় কী যেন এক সত্তা আছে যার সংগে আত্মবিলীন করার মধ্যেই সুখ ও শান্তি এমনি এক চেতনায় মন উদাস হয়ে যায়। সমাজ সম্পর্কের অনিত্যতা সম্পর্কে চিত্ত জাগ্রত হয়, একটি দীর্ঘশ্বাসের ভেতর দিয়ে জীবনের সকল দুঃখের অবসানের কামনা জাগে। বলা বাহুল্য, এই সুর মনকে যতটা উদাস করে, ততটা কর্মে জাগ্রত করে না। তাই, সমাজ-সম্পর্ক ও সামাজিক বিধিবিধান রূপান্তরের অস্ত্র হিসেবে এ ব্যর্থ। বাউলরাও তাই স্থান নিয়েছেন সমাজ পরিধির বাইরে।

নিজস্ব পৃথিবীর মধ্যে থেকে বাউলরা জীবনের আর্তি থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেছেন। তাদের আকাঙ্ক্ষার পথ হলো প্রেমের পথ। সহজিয়াদের মত তাদের লক্ষ্যও হলো সহজ হওয়া। শাস্ত্রীয় আচার বিধিবিধান সহজ মানুষের সৃষ্টি নয় ভেদবিদ্বেষে জর্জরিত বিষয়কর্মে নিয়োজিত স্বার্থান্ধ মানুষের সৃষ্টি। সেই স্বার্থান্ধ মানুষের পথ বর্জন করে তারা প্রেমের পথে অগ্রসর হলেন। কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই প্রেমের অয়ুধ সামগ্রিক ক্রিয়ার, সমবেতভাবে প্রয়োগ করার, আয়ুধ নয়। আদর্শটা এখানে ব্যক্তিগত। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে অন্য এক মানুষ লুক্কায়িত রয়েছেন যিনি "মনের মানুষ" যিনি প্রেমময় কল্যাণস্বরূপ আনন্দস্বরূপ। সেই মনের মানুষের সঙ্গে মিলনের জন্যই বাউলদের আকূতি।

মানুষ হাওয়ায় চলে হাওয়ায় ফিরে
মানুষ হাওয়ার সনে রয়,
দেহের মাঝে আছেরে সোনার মানুষ ডাকলে
কথা কয়।
তোমার মনের মধ্যে আর এক মন আছে গো—
তুমি মন মিশাও সেই মনের সাথে।
দেহের মাঝে আছেরে মানুষ ডাকলে কথা কয়॥

(হারামনি)

সহজিয়া বৈষ্ণবরা জরামৃত্যুহীন এক নিত্যবৃন্দাবনের কল্পনা করেছিলেন এই অ-সহজ সমাজের কঠোর শাসন থেকে মুক্তি লাভের আশায়। বাউলরাও এই অ-সহজ সংসারের অপ্রীতি থেকে মুক্তির জন্য মনের মানুষের সংগে মিলনের কল্পনা করেন। প্রত্যেকটি মানুষ যদি প্রেমের পথে তার মনের মানুষের সংগে মিলিত হতে পারে তাহলে শাস্ত্রীয় ভেদবিচার ও প্রাণহীন বিধিনিষেধের উর্ধ্বে ওঠে মানুষ পুনরায় সহজ হতে পারে। তখন সহজ মানুষের সমবায়ে গঠিত সমাজে সুখ শান্তি ও আনন্দের প্রতিষ্ঠাও সম্ভব। এইটেই তাদের নিকট ব্যক্তিগতভাবে মোক্ষলাভের পথ।

এই আদর্শ গানের সুরে প্রকাশ করতে গিয়ে বাউলরা নির্মমভাবে প্রচলিত সমাজের হৃদয়হীনতা তার বিকৃতি, জীবন ও ধর্মীয় আচরণের কদাচার এবং সর্বপ্রকার অশুভবুদ্ধির বিরুদ্ধে কশাঘাত করেছেন। সামাজিক এবং

সাম্প্রদায়িক ভেদবিচারের বিরুদ্ধেও তারা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিবাদ জ্ঞাপন এবং বিদ্রোহ করেছেন। তাদের আদর্শ ছিল মিলনের। সেই মিলন যেমন মনের মানুষের সংগে সাধকের তেমনি মানুষের সংগে মানুষেরও। তাই হিন্দুমুসলমান ভেদাভেদ তাদের মধ্যে নেই। হিন্দুর শিষ্য মুসলমান, মুসলমান বাউলের শিষ্য হিন্দু—এমনি ধরণের গুরু-শিষ্য পরম্পরা বাউলদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে প্রচলিত দেখতে পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে সহজিয়া বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবদের মধ্যে তন্ত্রমন্ত্র ইত্যাদির প্রতি যেরূপ অশ্রদ্ধা দেখা গিয়েছে, বাউলদের মধ্যেও তা অনায়াস লক্ষ্য। পূর্বগামী সহজিয়াদের মত তারাও ঘোষণা করেছেন, "নিয়ম রীত ছাড়াইয়া গেলে মরম রসের দরশ মেলে।" সহজিয়াদের মত তারাও যেন শাস্ত্রতত্ত্ব জানা বিষয়কর্মে নিমগ্ন ও স্বার্থান্ধ সমাজ বিধায়কদের সম্বোধন করে বলছেন, "তন্ত্রমন্ত্রে যে ফাঁদ তোমরা পেতেছ তাতে মনের মানুষ কস্মিনকালেও ধরা দেবে না, বরং নিজেরাই নিজের ফাঁদে মরবে।" সত্যের পথ ও পথ নয়, ভ্রান্ত মানুষ তাই ধাঁধায় ঘুরছে।

অবশ্যই স্বীকার্য যে, এ কথা বঞ্চিত মানুষের কথা কিন্তু, বঞ্চিত হলেও অথবা বঞ্চিত বলেই এই মানুষ জীবনের একটা সৃষ্টিশীল আদর্শকে অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়েছে, সর্ব মানুষের মিলনের একটা বলিষ্ঠ ভিত্তিভূমি রচনার আকৃতি জানিয়েছে। হৃদয়ের ক্রন্দন তাদের গানের সুরের সংগে অঙ্গাঙ্গী মিশে রয়েছে। শাস্ত্রবিধি-মানা সামাজিক মানুষ তাদের গানের সুরে মোহিত হয়েছে, কিন্তু তাদের আদর্শকে আমল দেয়নি। তাই, সহজিয়াদের মত বাউলদের সঙ্গীতকেও অসাম্যের আদর্শে গড়া সমাজে অরণ্যরোদনের মত শোনায়। কিন্তু অরণ্যরোদন হলেও তা রোদন, কল্যাণপ্রতিষ্ঠার আকৃতি, প্রচলিত সমাজ-সম্পর্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

শেষ কথা

এক

প্রাচীনতম বাংলাকাব্য চর্যাগীতি থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্রের কাল অবধি বাংলা সাহিত্যের বিশেষ দুই-তিনটি ধারা সম্পর্কে আমি বর্তমান গ্রন্থে আলোচনা করেছি। সর্বথা স্বীকার্য যে, একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মনোভঙ্গীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখায় আমার পক্ষে পূর্বোক্ত সময়কার বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের সর্বাঙ্গীণ আলোচনা করা সম্ভব হয়নি; অনেক উল্লেখযোগ্য পুঁথি এবং গ্রন্থকার এ আলোচনায় স্থানলাভ করেননি; বিশেষ করে, গৌড় দরবারে মুসলমান নৃপতিদের আনুকূল্যে যে অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টি হয়ে চলেছিল সাহিত্যের ইতিবৃত্তে তার স্থান সামান্য নয়। কিন্তু আমার উপস্থিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিচারে অপ্রাসঙ্গিক। তা ছাড়া, নব পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিবৃত করাও আমার উদ্দেশ্য নয়।

বর্তমান গ্রন্থে যেভাবে বিষয় বিভাগ ও আলোচনা করা হয়েছে, তাতে তত্ত্ব-সন্ধানী পাঠকের চোখে অনায়াসেই একটা বিবর্তন ধরা পড়বে। অবশ্য, সাহিত্য-বিবর্তন একটা স্থির লক্ষ্য সম্মুখে রেখে অগ্রসর হয়েছে, অথবা একটিমাত্র নির্দিষ্ট একক ধারায় প্রবাহিত হয়েছে, একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। সমাজ-বিবর্তনের প্রবাহও সরল রেখায় অগ্রসর হয়না—সর্পিল রেখায় চলে। তাছাড়া, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বালোচনার প্রধান অন্তরায়, নির্ভুল ঐতিহাসিক ক্রম অনুযায়ী প্রাপ্ত পুথির নির্দিষ্ট কাল নির্দেশের অভাব। ঐ অভাব সম্ভবত বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনকে আরও বেশী সর্পিল করে দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বিবর্তনের ইংগিত সুস্পষ্ট।

বৌদ্ধ সহজিয়া ও তান্ত্রিক সাধকদের সাধন-মার্গ বিশ্লেষণ, ভাব-সম্পদ প্রচার এবং সাংসারিক দুঃখতাপের দাহন থেকে মোক্ষ লাভের উপায় নির্দেশের গরজ থেকে বৌদ্ধ সাধকগণ চর্যাগীতিমালা রচনা করেছিলেন। তাঁদের অনেকগুলো গানের অর্থ আজ আমাদের নিকট অস্পষ্ট। যদিও বর্তমান আলোচনায় বিভিন্ন গীতিকার কর্তৃক ব্যবহৃত উপমা-রূপক-চিত্র থেকে আমরা তাঁদের বস্তু-ধর্মী মন ও মননের এবং একটি প্রত্যক্ষ অর্থের সাক্ষাৎলাভ করেছি, তথাপি একথাও প্রসঙ্গত স্বীকার্য যে, এই প্রত্যক্ষ অর্থের অন্তরালে তাঁরা অপ্রত্যক্ষ কোন গূঢ় তত্ত্ব বা অর্থ প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। সম্ভবত দ্বিতীয় উদ্দেশ্যই তাঁদের মুখ্য ছিল। সেজন্যই চর্যাগীতির বাহ্যলক্ষণটা মিষ্টিক ধাঁচের। বাস্তব জীবনের অতি প্রত্যক্ষ সজীব চিত্রাদি ব্যবহার করে অতি নিগূঢ় উপলব্ধি ও তত্ত্বের ইংগিত জ্ঞাপন এবং সেই ইংগিতের আভায় জীবনাচরণকে উপলব্ধি করার আকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়েই সিদ্ধাচার্যদের মনোজগৎ অভিব্যক্তি লাভ করেছে। তাঁদের জীবনের, ভোগের, সুখাস্বাদনের কামনা বহিঃ প্রকৃতির মধ্যে আপন সত্তার অভিক্ষেপের মাধ্যমে প্রকাশ পায়নি; দেহ আশ্রিত অথচ দেহ সম্পর্কের উর্ধ্বে স্থাপিত কোন এক সত্তার উপলব্ধির মধ্যে রূপ পেয়েছে। তাই, স্বর্গ-নরক পাপপুণ্য ইত্যাদি মূল্যবোধের চেতনায় আচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ্য সংস্কার-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ যতই মুখর হোক না কেন, সমাজ সম্পর্ক বিধৃত ও প্রকৃতি-মানুষ দ্বন্দ্বে আন্দোলিত জীব হিসেবে তাঁদের চেতনা ও কর্ম অসম্পূর্ণ, অভাব-দুষ্ট।

অন্যদিকে, মঙ্গলকাব্যের বাইরের ছাঁচটা পৌরাণিক, কিন্তু অন্তরের সম্পদ একান্তই লৌকিক, মানবিক। যদিও এই আকাশের কর্মের নিয়ন্তা, বিধায়ক এবং কর্তা কল্পিত দেবদেবী অথবা অপ্রাকৃত দৈবশক্তি, তথাপি এই কর্ম লীলার বাহ্য কলরবের আড়ালে আছে মানুষেরই কর্ম ও ভাব জীবনের অর্থাৎ তারই জাগরণের সংকোচ-ভরা কাকলি। পৌরাণিক দেবদেবীর কর্ম-লীলাকে আশ্রয় করে ব্রাহ্মণ্য সমাজ কর্তৃক নিন্দিত এবং ব্রাহ্মণ্য সমাজের নিম্ন স্তরে আশ্রয় পাওয়া বাংলার আদি অধিবাসীদের ভাব, ভাষা ও জীবন-দর্শন অভিব্যক্ত হয়েছে। তাই, এখানে আমরা কর্মের শক্তি ও আকর্ষণ অনুভব করি, অনুভব করি মানুষের আত্ম চেতনার অভ্যুদয় ও বিকাশ। যতই অনভ্যস্ত এবং দুর্বল হোক না কেন, মানুষ তার সত্তাকে বহিঃ প্রকৃতির কোলে অভিক্ষেপ করতে

আরম্ভ করেছে। তাই, বিভিন্ন দেবদেবীর উত্থান পতন সংগ্রামের ভিতর দিয়ে আমরা সমাজ-মানুষেরই ঘরকন্না হাসিকান্নার কাহিনী শুনতে পাই। বুঝি, আত্মচেতনার অভিব্যক্তির পথে মানুষ অগ্রসর হয়েছে এক ধাপ।

আর, মধুময় বৈষ্ণব পৃথিবী সেই অগ্রগমনের পথে আরও এক ধাপ। বৈষ্ণব গীতি-কবিতার ভাবসম্পদ ও বস্তু-সম্পদ একান্তভাবে মানবিক। সাংসারিক এবং রূঢ় সমাজ-বন্ধনে পীড়িত মানুষের আকুতি, কল্যাণস্বরূপের সহিত মিলনের জন্য, আনন্দস্বরূপের সহিত মিলনের জন্য, নিত্য বৃন্দাবনের চির-সজীব সুখ-স্পর্শের চিরন্তন আস্বাদনের জন্য। অবশ্য, এই আকুতি বহু ক্ষেত্রেই আধ্যাত্মিক রসে অভিসিঞ্চিত। কিন্তু, আধ্যাত্মিকতা এখানে তরল। এর অন্তরালে মানবিক ঐশ্বর্যই অত্যুজ্জ্বল হয়ে পরিস্ফুট হয়েছে; কেননা, বৈষ্ণব গীতিকারগণ প্রেমের আয়ুধে দুঃখ অন্ধকারময় বিঘ্নসঙ্কুল পথ কাটতে বলেছেন, এবং সমাজ-সম্পর্ক বিধৃত থেকে বিশ্ব-মানবকে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করা সম্ভব। আরও উল্লেখযোগ্য যে, কৃষ্ণভক্তি এখানে অধিকাংশ স্থলেই গৌরাঙ্গ-ভক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। গৌরাঙ্গ-কেন্দ্রিক যে কাব্য, রস, অনুভূতি এবং ভাবের অভিব্যক্তি তা নিঃসংশয়ে মানবিক অর্থাৎ, মানবিক পৃথিবী এখানে আধ্যাত্মিক-জগতের স্থলাভিষিক্ত, অথবা স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পথে মানুষ এখানে নিজেকে মানব পরিবেশের মধ্যে অভিক্ষিপ্ত দেখতে পায়।

এই বিবর্তন ধারার প্রবাহ পথে যদি আরও কিছুদূর অগ্রসর হই তাহ'লে দেখতে পাই, ক্রমে ঐ আধ্যাত্মিকতার আবেশ থেকেও সাহিত্য মুক্তিলাভ করছে; কোনরূপ আধ্যাত্মিক ভাব, অনুভূতি বা আদর্শের সহিত সম্পৃক্ত নয় অথবা কোন দেবদেবীর কর্ম-লীলার অভিব্যক্তিও নয়, এমন বিশুদ্ধ লৌকিক কাহিনী সপ্তদশ শতকে আরাকানের রাজসভায় এবং পূর্ববাংলার অন্যান্য জেলায় আত্মপ্রকাশ করছে। মিষ্টিক, পৌরাণিক অথবা আধ্যাত্মিক প্রভাব বিমুক্ত এই লৌকিক সাহিত্যের মধ্যেই মানুষের আত্মচেতনার পূর্ণ অভিব্যক্তি। এ পর্যায়ে এসে শিল্পকর্মের পরিধি থেকে মানুষ বিদায় দিয়েছে দৈব-শক্তিকে, আবিষ্কার করেছে নিজেকে, নিজস্ব পার্থিব জগৎকে, এবং তার অন্তর্নিহিত ভাব-সত্তাকে। এর পর থেকে দৈবশক্তি পূর্ব থেকে মানুষের শিল্পকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করেনি, কোন কোন ব্যক্তি-শিল্পী হয়তো বা স্বেচ্ছায় আপনার আত্মিক আকুতিকে আধ্যাত্মিক পোষাকে সজ্জিত করে থাকবেন। পূর্বেকার

মতো আধ্যাত্মিক অথবা পৌরাণিক অস্তিত্বই মানুষের একমাত্র অস্তিত্ব নয়, পূর্বতন অস্তিত্ব এখন একান্তই গৌণ, অনেকাংশে অনভিব্যক্ত, অস্বীকৃত। অবশ্য, মানুষের আত্ম-চেতনা উদ্বোধনের এই ক্রম এখানে যতটা সহজ ও সরল রেখায় টানা হয়েছে, বাস্তব ইতিহাস ততটা সরল তো নয়ই, বরং ততোধিক জটিল। কোন একটা স্তর বিভাগ করে বলা যায় না যে এটা মিথিক ভাবানুভূতির অধ্যায়, এটা পৌরাণিক শিল্পকর্মের অধ্যায়, এটা আধ্যাত্মিক পর্যায়, অথবা এটা বিশুদ্ধ লৌকিক শিল্পকর্মের যুগ। ষোড়শ, সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক কালে আমরা পৌরাণিক, তরল আধ্যাত্মিক এবং নিখুঁত লৌকিক শিল্পকর্মের সাক্ষাৎ লাভ করি। অর্থাৎ, মানুষের সমাজ ইতিহাসের বিবর্তনের মতো সাহিত্য বিবর্তনের ইতিহাসও আঁকাবাঁকা, এক অধ্যায়ে পূর্ব অধ্যায়ের জের টানাটানি; অথবা একই অধ্যায়ে বিভিন্ন মনোভঙ্গীর অভিপ্রকাশ। কিন্তু, একটা সীমায় এসে এই জের টানাটানিরও সমাপ্তি ঘটে। মানুষের আত্মচেতনা উদ্বোধনের সংগে সংগে তার মানসপটে তার বাস্তব অস্তিত্ব পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সাহিত্যের মূল-প্রবাহ স্থির নির্দিষ্ট ধারায় মানব-সম্পর্কের সমুদ্রের পথে অগ্রসর হ'তে থাকে। বর্তমান গ্রন্থের আলোচনায় তার ইংগিত দেওয়া হয়েছে।

দুই

পূর্বোক্ত আলোচনায় বাংলাসাহিত্য বিবর্তনের যেমন একটা ক্রমের ইংগিত দেওয়া হয়েছে, তেমনি বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত চর্যাগীতি, মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণব গীতিকবিতার ভাবসম্পদেরও একটি অনস্বীকার্য বৈশিষ্ট্য আছে। তা হলো ব্রাহ্মণ্য সংস্কার সংস্কৃতি, সমাজ-দর্শন এবং জীবনাচরণের ভঙ্গির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য আদর্শ মানুষকে পৃথিবীর পথ থেকে টেনে পশ্চাতে ফিরাতে চেয়েছিল; কিন্তু, এখানে দেখতে পাই, এই পঙ্কিল অসম্পূর্ণতায় ভরা পৃথিবীরই বলিষ্ঠ স্বীকৃতি। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ যেখানে ইন্দ্রিয়াদি ছেদন করে ভব মোহ থেকে মুক্তিলাভের জন্য অপরিসীম বেদনা ও করুণায় কেঁদে উঠেছেন, সেখানেও আমরা দেখেছি এই পার্থিব জীবনের

আকৃতিই অভিব্যক্তি লাভ করেছে। মঙ্গলকাব্য রচয়িতা কবিদের বিষয়-চেতনা আশ্চর্য রকমের প্রবল, সজীব। এই পৃথিবীর সীমায় থেকে নির্দিষ্ট সমাজ-সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ থেকে সুখে শান্তিতে ধনধান্যে গরিমায় পরিতৃপ্ত জীবন যাপনের আকাঙ্ক্ষাই মঙ্গল কাব্যের প্রাণসম্পদ। আর বৈষ্ণব গীতিকারদের যে নিত্য বৃন্দাবন ধামের পরিকল্পনা, তাও এই পৃথিবীর ধূলিকণা দিয়েই গড়া, মাটির আশীর্বাদ পাওয়া। ব্রাহ্মণ্য-সাধনা পৃথিবীকে পরিত্যাগ করতে চেয়েছিল, এরা বুকে গ্রহণ করে তার উত্তর দিয়েছে।

একনায়কত্ববাদী ব্রাহ্মণ্য সমাজ অসাম্যের আদর্শে সংগঠিত। মানুষ এখানে মুখ্য নয়; সে সেই পরিমাণেই সত্য যে পরিমাণে সে যথানির্দিষ্ট আচার আচরণ বাধানিষেধ শাস্ত্রবচন ও অনুশাসন প্রতিপালন করে। ব্রাহ্মণ্য সমাজ-দর্শনের এই মনোভঙ্গির বিরুদ্ধে বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত কাব্যাদির ভাবসম্পদ মূর্ত বিদ্রোহের প্রতীক। চর্যাগীতিকারদের দর্শন অভেদ-দর্শন, তাঁরা হিংসা করেন না, কেননা সকলেই নিরন্তর বুদ্ধ। তাঁদের পথ সহজের, অর্থাৎ প্রেম ও মৈত্রীর। আর মঙ্গলকাব্যে দেখতে পাই, ব্রাহ্মণ্য-সমাজের নিকট যারা নিন্দিত, উৎপীড়িত, অস্পৃশ্য অন্ত্যজ, তারাই পূর্ণ গরিমায় সমাজ-স্বীকৃতি লাভ করছে; ব্রাহ্মণ্য সমাজ-চিন্তাকে খণ্ডিত করে সুরু হয়েছে তাদের যাত্রা, অভিযান। তাছাড়া, চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব আদর্শের মানবিকতা তো সর্বজন স্বীকৃত। ব্রাহ্মণ্য সমাজ চিন্তানায়কদের চিন্তা মনন ও প্রকাশের মাধ্যম দেবভাষা সংস্কৃত; আলোচ্য কাব্যাদির দেশজ, লৌকিক বাংলা। এমনিভাবে, মনে ও ভঙ্গিতে, বচনে ও চিন্তায়, ধ্যান ও জিজ্ঞাসায়, সাধনা ও পদ্ধতিতে এঁরা অন্য প্রান্তের লোক। এঁদের সৃষ্টিকর্ম ও অভিব্যক্তির পশ্চাতে আছে বাংলার আর্যেতর জনসমষ্টির জাগরণের ইতিহাস।

কিন্তু, এই ইতিহাস এবং তার অভিব্যক্তি সত্ত্বেও, স্বীকার করতে হয়, মধ্যযুগের কাব্য জীবনের পরিবেশে সময় যেন স্তব্ধ গম্ভীর হয়ে চুপ করে বসে আছে; যেন তার চলার স্পন্দন বা তরঙ্গ ধ্বনি অনুভব করা যায় না। সে কালে জীবন প্রবাহ চলছিল বিলম্বিত লয়ে; পরিধি ছিল সংকীর্ণ, তাই বিস্তৃতিও ছিল সামান্য। নিসর্গ শক্তির নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাভূত জীবন শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে একই ধারায় বয়ে চলেছিল,—পুরাতন মানুষের স্থলে

নতুন মানুষের আবির্ভাব হয়েছে, আবার সময়ে তারাও চলে গিয়েছে, কিন্তু জীবনের সেই সীমাবদ্ধ ছাঁচ ও বিস্তৃতির কোন রকমফের নেই, কোন রূপান্তর নেই। তাই, মঙ্গলকাব্যগুলিতে তৎকালীন সমাজ জীবনের একটা বিচিত্র চিত্র এবং পরিচয় পাওয়া গেলেও কখনও আমাদের মনে হয় না যে, এই সমাজ বিশেষ ঐতিহাসিক কালে বিশেষ এক সমাজ সমস্যায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেছে; মনে হয় না, কোন অস্থির এষণা এই কালের মানুষকে চঞ্চল করে তুলেছে; মনে হয় না, নবসৃষ্টির উন্মত্ত বেদনায় এর অন্তর থেকে নতুন সুর ধ্বনিত হয়েছে; মনে হয় না, এই কালের বাংলা সমাজ উপলব্ধি করতে চাইছে তার সমগ্র রূপটি; অর্থাৎ, কাল এই সমাজকে কোন সৃষ্টির সংঘর্ষে আন্দোলিত করে তোলেনি। জীবনের, তাই কাব্যেরও, রূপ অচঞ্চল, বৈচিত্র্যহীন, স্বাদহীন। তখন পর্যন্তও বাংলা সমাজ জীবনে কাল প্রবেশ করেনি।

অবশ্য, এই কাব্যের মধ্যেও একটা আশা আকাঙ্ক্ষা অথবা এক কথায় একটা জীবন তৃষ্ণা ব্যক্ত হয়েছে, কিন্তু যে কর্ম ও সমাজ-সম্পর্ক রচনার উপর ঐ তৃষ্ণার নিবৃত্তি নির্ভরশীল, তার কোন চেতনা এই সাহিত্যে বর্তমান নেই। বৈষ্ণব গীতিকার মধ্যেও একটা সুতীব্র বেদনা, আর্তি ও আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হয়ে ওঠেছে, কিন্তু তা একান্তই কবির আত্মগত। সেই আর্তিকে কবি সমাজ মানুষের মধ্যে অনুভব করেননি, অথবা তাঁর নিজের আকাঙ্ক্ষাকে সেখানে প্রতিবিম্বিতও দেখতে পাননি, তাই তা মানবিক হয়েও যেন বাস্তবিক সাংসারিক হয়ে ওঠতে পারল না। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন যে সমাজের বৃহত্তর জীবনের মধ্যে বিধৃত, সমাজের জীবন যে আবার দেশের বৃহত্তর জীবনের সংগে সম্পৃক্ত, দেশের সমগ্র জীবন যে বিশেষ একটি ঐতিহাসিক লগ্নের সহিত পরিণয়-সূত্রে বাঁধা, মধ্যযুগের সাহিত্যে অথবা কবি মনে তার কোন চিহ্ন নেই। জীবন যেমন, এ কালের সাহিত্যে জীবনের পরিচয়ও তেমনি still photograph এর মতো। গতি শুধু নেই নয়, গতি যেন অবরুদ্ধ।

আধুনিক বিদগ্ধ মন নিয়ে যখন আমরা সেই অবরুদ্ধ কালের, অবরুদ্ধ সমাজের, অবরুদ্ধ সাহিত্যের পাতা ওলটাই, তখন তার বেশীর ভাগ অংশে-পাওয়া স্থূলতা এবং গ্রাম্যতা-দোষ আমাদের আহত করে, আমাদের রুচিবোধ, বুদ্ধি প্রতিহত হয়। এই সাহিত্যের প্রতি বীতরাগ হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। এ সবই সত্য, কিন্তু, এর পরেও একটু কথা থেকে যায়। কোন সমাজকে যেমন

তার বিবর্তন ধারার সংগে সম্পর্কিত না করে বিচার করা যায় না, তেমনি বিশেষ কালের সাহিত্যকেও তার কাল পরিবেশ এবং সমাজ পরিবেশের পটভূমিতে সংস্থাপন না করে বিচার করা যায় না। কালের পরিমাপে বাংলা সাহিত্য নবীন; বিশেষ করে এই গ্রন্থে যে বিশেষ কালের কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তা বাংলা সাহিত্যের হাঁটন প্রচেষ্টার কাল। সুতরাং প্রয়াস কালের অনভ্যস্ত লক্ষণ এতে পরিস্ফুট থাকবে তা অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া, সমাজ অবরুদ্ধ, জীবনও অবরুদ্ধ, সুবিন্যস্ত সুসংহত বাংলা সমাজ জীবন তখনও গড়ে ওঠেনি, মানুষের আত্মচেতনা অথবা বিশ্ব-চেতনা হয় অনুপস্থিত নয় খণ্ড খণ্ড, সুচারু ভাষা অথবা মনোভঙ্গির বিকাশও তখন হয়নি। সেই স্বল্প পরিসরে মানুষ সহজাত ইন্দ্রিয়ের টান অনুভব করেছে বাইরের দিকে, পৃথিবীর পথে ভোগের পথে। প্রকৃতির কোন্ দৃশ্যটি নয়ন সুখকর, দেহের কোন ভঙ্গিটি মনোরম, ঋতুর আগমন নির্গমন কি রোমাঞ্চ জাগায় দেহে, মানুষের কোন্ আচরণ হাস্যকর ও বিদ্রূপের অপেক্ষা রাখে, কোন্ কর্ম সৃষ্টির, কোন্‌টা অনাসৃষ্টির, ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের সহজ ধর্মে স্বভাবতই সে ধরতে পারে। এই প্রত্যক্ষ জীবন অভিজ্ঞতাই কবির কাব্যে অথবা কাহিনীতে অত্যন্ত সাদাসিধে ও অকৃত্রিম ভাষায় ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। যেমনি করে গাছে পত্র পুষ্পের আবির্ভাব হয়, মানুষের মুখে কথা ফোটে, এর যেমন কোন কৈফিয়ৎ নেই, তেমনি সাহিত্যও ফুটে ওঠেছে, কোন কৈফিয়ৎ নেই। বরং, ঐ অমার্জিতকালে বৈষ্ণব গীতিকারদের সঙ্গীতে হৃদয়ের কী সুতীব্র আর্তি, কী মনোরম ভঙ্গিতে, কী সুচারু ভাষায়, কী বাহুল্যহীন মাধুর্যে সুব্যক্ত হয়েছে, তা-ই আমাদের বিস্ময়ের বস্তু। তার প্রকৃত রস আস্বাদন করতে হলে আধুনিক মনকে সেই কাল-পরিবেশের মধ্যে সংস্থাপিত করতে হবে। কথা ভাষা অথবা ভাবের স্থূলতা, সেই জীবনেরই অঙ্গ।

শেষ কথা। প্রত্যেক ঐতিহাসিক কালেরই স্বরূপটি দ্বৈত; একদিকে সে একটি বিশেষ লগ্নের, অন্য দিকে সে নির্বিশেষ কাল প্রবাহের অন্তর্গত। মানুষের সমাজের, তার কর্মের (সুতরাং সাহিত্য কর্মেরও), স্বরূপও তাই। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য যেমন একদিকে মধ্যযুগের, তেমনি তা বাংলা সাহিত্য বিবর্তনের নির্বিশেষ ধারার অন্তর্গত। কিন্তু মানুষের কর্মের আরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। তা, বিশেষ হয়েও নির্বিশেষের অঙ্গ বলেই, যেমন বর্তমানকে

সৃষ্টি করে তেমনি ভবিষ্যতেরও সে-ই রচয়িতা। মধ্যযুগের বাংলার সমাজ-মানুষ তাঁর কর্মদ্বারা (সাহিত্য কর্মও এর অন্তর্গত) তৎকালীন জীবনকে রূপায়িত ও সৃষ্টি করেছে সত্য, কিন্তু ভবিষ্যৎ বাংলার ভাগ্যবিধায়ক সে কতখানি হতে পেরেছে তা নির্ণয় করা কঠিন। পূর্বেই বলেছি, সে সমাজ-জীবনে গতি ছিল অবরুদ্ধ, গতির বেগ সঞ্চারের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল বাইরের আঘাত। সেই আঘাতই বাংলার নব রূপান্তরের মূলে। মধ্যযুগের বাঙালীর সাহিত্য-কর্ম, এমনকি বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন, এই রূপান্তরকে প্রভাবিত করেছে কিনা বলা কঠিন। উহার মানস-পরিবেশ সৃষ্টি দ্বারা যদি বা সে রূপান্তরের সহায়ক হয়ে থাকে, তবে তা প্রত্যক্ষ নয় পরোক্ষ।